আকাশ

আদান প্রদান

আকাশ

ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া

অনুবাদ
তাপস গুহবিশ্বাস



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া

পরিচয়

এই শতকের ছয়ের দশকের শুরুতে লেখা শুরু করে ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া আজ একজন শ্রেষ্ঠ অসমীয়া লেখক। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যখন প্রথম তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেন তখনই অনুভবী পাঠককুল তাঁর অনন্যসাধারণ সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ধরতে পেরেছিলেন। প্রকৃত কবি যেমন নিজের ভাবনা ও ভাষারূপের বৈশিষ্ট্যে রসিক সমাজে প্রতিষ্ঠা পান, শইকীয়াও নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রচুর সম্ভাবনার অঙ্গীকার নিয়ে, নতুন কোন কারিগরী না দেখিয়েই প্রায় চিরাচরিত গল্প-রচনা পদ্ধতি অনুসরণ করে নিজস্ব ভাষাশৈলীর মাধ্যমে তাঁর জীবন বীক্ষণ পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের সীমিত পরিসরের ভেতরে আমাদের পরিচিত ছবিগুলি তিনি তাঁর গল্পে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর ভাষাও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে ভাষা। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জীবনপ্রবাহের বৈচিত্র্য আর নিবিড় পরিচয় ফুটে ওঠে অভিনব স্বাদ নিয়ে।

এই ভাবেই কথাশিল্প অনুশীলনের মাত্র দুই দশক পূর্ণ হতে না হতেই ডক্টর শইকীয়া একজন সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পব্যক্তিত্বের আসন অধিকার করেন। এই সময়ে তাঁর ছ'টি গল্প-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে: প্রহরী (1963), বৃন্দাবন (1965), গহ্বর (1969), তরঙ্গ (1969), সিঁদুর (1970) এবং শৃঙ্খল (1975)। এ ছাড়াও তাঁর নির্বাচিত গল্পের একটি বইও ("ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার শ্রেষ্ঠ গল্প: প্রথম খণ্ড: পঞ্চাশের দশক" (1973) বেরিয়েছে। এই সব প্রকাশ এবং তার পুনঃপ্রকাশই তাঁর কাহিনী কথনের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে।

বর্তমান সঙ্কলনটি উল্লিখিত সবকটি সঙ্কলন থেকে আবার নতুন করে প্রকৃষ্ট গল্পগুলিকে নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস এইটি শইকীয়ার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করবে এবং সমস্ত গল্প পাঠকের সমাদর লাভ করবে।

ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া ইতিমধ্যে শিল্প-জগতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও দৃঢ় পদক্ষেপে

বিচরণ করেছেন। এই বিচরণ কোন প্রকার অপসরণ বলে ভাবার অবকাশ আমাদের নেই। বেতার নাটিকা এবং ধারাবাহিক বেতার নাট্যকার হিসেবেও তিনি জনপ্রিয়। "দোমাকী", "দেউতা" (পিতা) ইত্যাদি ধারাবাহিক নাটক শ্রোতাদের কি পরিমাণ আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল একথা নিশ্চয় অনেকের মনে আছে। অবশ্য এখনও শইকীয়া মহাশয়ের বেতার নাটকগুলো বই হিসেবে প্রকাশিত হয়নি; শ্রীঅরুণ শর্মা সম্পাদিত বেতার নাটক সংগ্রহতেই মাত্র দুটি নাটক ("জঙ্গল" "দুর্ভিক্ষ"— অনাতার নাট্যাবলী 1984) আমরা ছাপার অক্ষরে পেয়েছি। 1981-82 সালে 'প্রান্তিক'-এ ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়ে পরে বই হিসেবে বেরোয় তাঁর উপন্যাস 'অন্তরীপ'। 'অন্তরীপ'-এর প্রথম ভাগ 'অগ্নিস্নান' (1968) এবং প্রথম জীবনের গল্প 'প্রহরী'কে ('প্রহরী' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট, 1983) 'অনির্বায়' নাম দিয়ে এবং 'বানপ্রস্থ'কে ('শৃঙ্খল' গ্রন্থের অন্তর্গত, 1978) 'সন্ধ্যারাগ' নামে ডঃ শইকীয়া নিজের পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন; তিনটি ছবিই স্বমহিমায় রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেছে। এসবই যে শিল্পী হিসেবে ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার ভিত্তির সামর্থ্য প্রকাশ করে, এ কথা নিশ্চিত।

আগেই বলেছি, শইকীয়ার গল্পের আড়ালে ঘটনার চমৎকারিত্ব নেই। এরা জীবনের সহজ গতিতে এগিয়ে যাওয়া কাহিনী, কিন্তু এইসব গল্প লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে সমৃদ্ধ। এখানেই তাঁর কাহিনীর বৈচিত্র্য। তাঁর প্রায় অধিকাংশ চরিত্রই সমাজের ক্লেদ না হলেও ব্রাত্য। কিন্তু এরা সবাই প্রকৃত অর্থে জীবন থেকে তুলে আনা মানুষ। আর যথার্থ মানুষ হিসেবেই এদের দাম। এরা নিঃস্ব, কিন্তু কোন শ্রেণী-সংগ্রামের ইস্তাহারের প্রতীক নয়। মিছিল করে এরা কোন শ্লোগান দেয় না, অথচ তাদের ছোট ছোট জীবনের কাহিনী বড়ই অর্থপূর্ণ।

অনাড়ম্বর, সরল, বস্তু-নিরপেক্ষ ভাষায় এই সব কাহিনী বলা হয়েছে। কোন স্পর্শকাতরতার ছোঁয়া তাতে নেই। এমন কি প্রেমের গল্পের ভাষাও ভাবপ্রবণ নয়। 'গহ্বর' গল্পে মিস্টার পিযেমারের কাহিনী বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে পোস্টার-গল্প নয়। আলেখ্যটি নিজেই নিজের বক্তব্যকে তুলে ধরেছে মাত্র। "এন্দুর" (ইঁদুর) গল্পের মতির মায়ের কাহিনী অশ্রুসজল। কিন্তু শইকীয়ার বর্ণনায় তা নির্মোহ সাধারণ ভাষাতেই এগিয়েছে আর শব্দের প্রতিটি নির্মাণে জীবন যে সেই নারীর প্রতি কতটা নিষ্ঠুর সে কথা ভাঙা কাঁচের মতই ঝনঝন করে বেজে উঠেছে। ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার সব গল্পের বর্ণনাকে জুড়ে দিলে হয়তো ভবিষ্যতে একটি বিশেষ ভূমিখণ্ডের, একটি যুগের সমাজতাত্ত্বিক একটা নিরীক্ষা হিসেবে বিবেচিত হবে। সাধারণ ভাষা থেকে গভীর অর্থের দ্যোতনা টেনে বার করার এক স্বাভাবিক গতি-শক্তি শইকীয়ার ভাষাবিন্যাসে বর্তমান। কিন্তু তাঁর কোন পৃথক অভিধান নেই। হঠাৎই একেকটা সাধারণ শব্দ এসে আমাদের সামনে পিঠের থেকে "হু-উ-স" করে

বড় ভারী একটা বোঝা ধুপ করে নামিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জীবনে শুধুমাত্র দুর্ভাগ্যকে পাথেয় করা রজনী মাস্টার যখন নিজের বাড়ির সামনের ঘরে ছাত্রদের অভিভাবকদের কাছে কাঁচা গালমন্দ শোনে, তখন নাকি "কথাগুলো শুনে বড় দুঃখ পায় বেড়ার ওপাশে থাকা ভাগ্যবতী," সত্যিই ভাগ্যবতী !! পাঠক চমকে উঠবেন, জীবনের মৃত্যুসম যাতনা ভোগ করা এমন একটা পরিস্থিতিতে ভাগ্যবতী আর কে-ই বা! রজনী মাস্টারের স্ত্রীর নাম শইকীয়া অন্য কিছুও দিতে পারতেন। দুর্ভাগা এক মহিলার জন্য গেন্ধেলী, মেছেলী যে কোন একটা নাম হতে পারতো। কিন্তু নামটি হল ভাগ্যবতী। ভাগ্য যেন এভাবেই কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখার মত এক কঠিন পরিহাসের হাসি হেসেছে। এভাবেই শইকীয়ার ভাষা বিন্যাসে এক স্বাভাবিক মায়া ছড়িয়ে আছে। এই মায়া এমন কি গল্পের নামকরণেও ছড়িয়ে আছে। পাঠক ক্ষণেক থেমে উপলব্ধি করার চেষ্টা না করলে এই নামকরণের মূল্য বোঝা যায় না। গল্পের কথনেও এই একই ব্যাপার, চমক লাগানো শব্দপ্রয়োগে কোন রকম অভিনবত্ব সৃষ্টির চেষ্টা না করে তিনি সাধারণ ভাষাতেই জীবনের সূক্ষ্ম পরিচয় এঁকেছেন। তিনি জীবনকে যেভাবে পেয়েছেন এবং অনুভব করেছেন, দেখেছেন এবং বুঝেছেন এক বৈজ্ঞানিক বস্তুনিরপেক্ষ নির্মমতায় ঠিক সেভাবেই তার লেখচিত্র এঁকেছেন। জীবনের প্রতি কোন বিশেষ স্থির করা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁর ছবিগুলি তৈরি হয়নি। এরই মাঝে জীবনের মৃদু পরিহাস ফুটে উঠেছে। পাঠকের অজ্ঞাতসারেই তিনি সৃষ্টির কারুকার্য ফুটিয়ে তোলেন। এক গভীর এবং সূক্ষ্ম জীবনবোধ সমৃদ্ধ ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার এখানেই নিজস্বতা আর এই বৈশিষ্ট্যে তিনি আধুনিক জীবনের ভাষ্যকার।

গুয়াহাটি 11 মার্চ, 1987 — মহেশ্বর নেওগ

যাত্রাভঙ্গ

বসন্তপুরের রাজা চন্দ্রাকর যখন সেনাপতি বীরবাহুর অক্ষমতা এবং শিথিলতায় অগ্নিশর্মা হয়ে, 'তবে এই তোর উপযুক্ত শাস্তি' বলে হাতের উন্মুক্ত তরবারি সেনাপতির বুকে বসিয়ে দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বীরবাহু 'উঃ ভগবান' বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, তখনই পিছনের এবং আশপাশের সবাই 'সামনের লোক বসে পড়ুন, সামনের লোক বসে পড়ুন' বলে, চেঁচিয়ে উঠল।

এর আগে দু'রাত্রি থিয়েটার হয়ে গেছে। পরশু তারাবাড়ি[১] এবং গতকাল মাঝগাঁয়ের[২] লোকেরা অভিনয় করে গেছে। আজ নবমীর দিন তুলসীঘাটের পার্টি। পূজোর একমাস আগে থেকে ন-পাড়া দুর্গাপূজা সমিতির সম্পাদক শ্রীবিনন্দমাধব হাজরিকার কাছে সাধারণত গোটা জেলার পনেরো বিশটা থিয়েটার পার্টির ম্যানেজার আসে পূজোর কটা দিন থিয়েটারের বন্দোবস্ত করতে। সরগরম এই শহরের লোকেদের সামনে থিয়েটার দেখানোর জন্য সব পার্টির ম্যানেজারেরই প্রবল আকাঙ্ক্ষা। বিনন্দমাধবের আগের সম্পাদকেরা প্রথমে আসা তিনজনের সঙ্গে তিনদিনের বন্দোবস্ত সেরে ফেলতো। কিন্তু নাগাড়ে কয়েকবার ধরে থিয়েটার দর্শকদের প্রয়োজনীয় (যথোপযুক্ত?) আনন্দ না দিতে পারায় বর্তমান সম্পাদক নতুন কায়দায় পার্টি-বাছা শুরু করলেন।

কায়দাটা অনেকটা ইন্টারভ্যু গোছের বলা যায়। বিমন্দমাধবের রসজ্ঞান আছে। থিয়েটারের নাম কি, নায়ক-নায়িকা কি রকম, নাচিয়ে কজন, সত্যি সত্যি মহিলা নাচিয়ে আছে কি না, মেডেল পাওয়া নাচিয়ে কিংবা ভাঁড় মানে বিদূষক আছে না নেই ইত্যাদি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পেলে তিনি পার্টি নির্বাচন করেন এবং সবশেষে নির্বাচিত পার্টির ম্যানেজারটিকে প্রয়োজনীয়, যেমন নাটকের কথোপকথন কমিয়ে যুদ্ধ বেশি দেখানো, প্রত্যেক দৃশ্যের শেষে নাচিয়ে কিংবা ভাঁড়ের প্রবেশ,

---

মূল অসমীয়া 'তরাবারী' এবং 'মাজগাঁও' বাংলায় 'তারাবাড়ি' এবং 'মাঝগাঁ' যুৎসই মনে হয়েছে।

ইত্যাকার উপদেশ দিয়ে বিদেয় করেন। বিনন্দমাধবের রসজ্ঞান মান্ধাতা আমলের, এমন অপযশ নেই, বরং দর্শকের মন বুঝে উপযুক্ত খোরাক যোগানোর গুণ আছে বলেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের বিশ্বাস। বিশেষ করে কলেজের দিনগুলোতে সস্তা সিনেমা দেখে বেড়ানোর জন্য কেউ দোষারোপ করলে 'ধুর দু'আনা দামের বই একটা কিনলেও অনেক উপদেশ পাবে। সিনেমায় তথ্য উপদেশ খোঁজার জন্য যেয়ো না। এনজয়মেন্ট ইজ এনজয়মেন্ট' — বলা মানুষ বিনন্দমাধব।

এ সমস্ত পেরিয়ে এবার পুজোর জন্য নির্বাচিত হয়েছিল মাঝগাঁ নাট্য-সঙ্ঘ, তারাবাড়ি যুবক সমিতি এবং তুলসীঘাট অপেরা পার্টি। ১৯৩৮ সনে প্রতিষ্ঠিত তুলসীঘাট অপেরা পার্টির পুজোর সর্বোত্তম দিনটিতে থিয়েটার করতে পারার সৌভাগ্যের মূলে ছিল, ওদের শক্তিশালী নাটক, গোপীনাথ বরা রচিত 'অবুঝ বন্দিনী' আর তাদের পদক-প্রাপ্ত শিল্পীমহল। কিন্তু পার্টির পরিচালক বিপিন বরার আন্তরিক দুঃখ, শহরে এসে নানা রকমের উন্নত (বাহারী) সিন-সিনারি ব্যবহার করে থিয়েটার করার বদলে প্যান্ডেলের মাঝখানে পেড়ে রাখা ত্রিপলের ওপর যাত্রা করতে হচ্ছে বলে।

আকারের দিক থেকে প্রথম সারির হলেও, বড় বড় চট, সামিয়ানা ইত্যাদি জোড়া দিয়ে করা পুজোর প্যান্ডেলটা দেখলে বারান্দায় বসা দর্জির দু'বছরের মেয়েটার ফ্রকের কথাই মনে পড়ে যায়। প্যান্ডেল-ইনচার্জ প্রাণকৃষ্ণ শইকিয়াকে ঠিক সময়ে টিনের প্যান্ডেল না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করার আগে, 'জীবনে কখনও দোরে দোরে, মাড়োয়ারীর গুদামে গুদামে টিন চেয়ে দেখেছ? ভোলা কন্ট্রাক্টরের খোঁজে তার বাড়িতে একদিনও গ্যাছো? মুখে অত ডজন ডজন কথা কিসের?' ইত্যাকার দু'ডজন একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি থাকতে হবে।

প্যান্ডেলের একদিকে সাজঘর অবশ্য টিন দিয়ে ঘেরা হয়েছে। মাঝখানে ত্রিপল পেতে তৈরি করা রঙ্গমঞ্চ থেকে সাজঘরের দুয়ারে টাঙানো পর্দা অবধি রাস্তাটা দুপাশে ফালা করা বাঁশ বেঁধে নটনটীর প্রবেশ প্রস্থানের পথ করা হয়েছে। এই পথের দুপাশে দর্শকের ভিড় প্যান্ডেলের অন্যান্য জায়গার থেকে চোখে পড়ার মত। পরশু অর্থাৎ যাত্রার প্রথম দিনেই দাঁড়িয়ে থাকা উৎসুক আর উত্তেজিত দর্শকের ঠেলায় ফালি বাঁশের ওপর সরাপাটের দড়ি দিয়ে বাঁধা গিঁট ছিড়ে গিয়েছিল, ফলে মনধনদার হাতে তৈরি নারকেলের দড়ি দিয়ে মজবুত করে বাঁশগুলোকে বাঁধা হয়েছে।

কিন্তু আজকে আবার গিঁটগুলো স্থানচ্যুত হয়ে গিয়ে ঢলঢল করছে। চেরা বাঁশ দিয়ে ঘেরা এধরনের সুরক্ষিত অঞ্চল পুজোমণ্ডপে আরও বেশ কয়েকটা আছে, যেমন ধরা যাক মা দুর্গার সামনের জায়গাটুকু, যাত্রা পার্টির রান্নাঘর, মোহনের পুতুলের দোকান ইত্যাদি। কিন্তু ওই বেড়াগুলোর বাঁধন দেখলে মনে হবে দড়ি পচে যাবে তবু গিঁটের দৃঢ়তা অক্ষুণ্ণ থেকে যাবে।

সাজঘরের কাছে এই হ্যাণ্ডারটার* সামনে দর্শকদের ভিড় হওয়ার প্রথম কারণ কুশীলবদের প্রবেশ-প্রস্থান-অভিনয় আদির সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, তাদের কথাবার্তা পরিষ্কার শুনতে পাওয়ার আগ্রহ। দ্বিতীয়, তৃতীয় কারণও থাকা সম্ভব, কিন্তু থাকলেও সহজ ভাষায় সেই সত্য প্রকাশ করাটা রীতিমত দুঃসাহসের কাজ।

আজকের এই উৎসাহী দর্শকদের একটা প্রধান অংশের সকলের নাম, মুখাকৃতি, পিতৃকুল পরিচয়ের চাইতে তাদের সাজপোশাক দেখেই সনাক্ত করা সহজ হবে বলে মনে হয়। দুটো ফেল্ট ক্যাপ, দুটো ফুলছাপা কাপড়ের হাওয়াইয়ান শার্ট, একটা টি শার্ট, একজোড়া রিমলেস চশমা, প্রথম বাঁশের ওপর পেটের ওপর ভর দিয়ে একটা চকোলেট রঙের কর্ডের প্যান্ট, দ্বিতীয় ফালি বাঁশে পা তুলে দেওয়া একজোড়া কলকাতার চিনেবাজারের কম্বাইন্ড কালারের জুতো। একটা মধ্যম শ্রেণীর অত্যুৎসাহী দর্শক পাওয়ার আনন্দ তুলসীঘাট অপেরা পার্টির মেডেল না পাওয়ার বেদনাকেও প্রশমিত করতে পারবে — আশা আছে। সাজঘর থেকে আসা যাওয়ার রাস্তাটার এদিকটাতে একটু জায়গা ছাড়া আছে। সেই জায়গাটায় গোটা কয়েক বাচ্চা ছেলে বসে।

এদের পরিচয় সহজ। নিরাপদ দূরত্বে থেকে পুতুলের দোকানের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা। মদন ডাক্তারের সাত বছরের ছেলেটার বেলুন ফোলানোর সময় কাছে দাঁড়িয়ে থাকা, কারো হাতে একটা ফেটে গেলে কাড়াকাড়ি করে ফাটা রাবারগুলো কুড়িয়ে নিয়ে তাই মুখে পুরে কুলের মত ছোট গুটলি বানিয়ে হাতের তালুতে ঘসে ক্রমাগত কর্কশ আওয়াজ করা আর বাড়ির সঙ্গে পূজোর কদিন কোন সম্পর্ক না রাখা এদের ধর্ম। এরা দুপুরে, শেষ রাতে মণ্ডপের নিচে ফাঁকা বেঞ্চ কটাতে শুয়ে থাকে আর কোথাও চারটে পয়সা পেলেই মিষ্টি কিনে খায়। এই খালি জায়গাটার ওদিকটায় মণ্ডপটার সমান লম্বা একটা চিক দিয়ে মণ্ডপের এক তৃতীয়াংশ ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এই চিকটার প্রয়োজন যথেষ্ট, গুরুত্ব লক্ষ্য করার মত, কিন্তু কার্যকারিতা সন্দেহজনক। চিকটার ওপাশে মেয়েদের বসার ব্যবস্থা।

কনকলতা প্রাইমারি স্কুল থেকে আনা বেঞ্চগুলো সারি দিয়ে চিকের আড়ালে সাজানো হয়েছে। ক শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে ছাত্রের উচ্চতা যে ভাবে বেড়ে যায়, কনকলতা স্কুলের বেঞ্চের উচ্চতাও সেভাবেই বাড়তে থাকে। মণ্ডপেও বেঞ্চগুলোকে সেভাবেই সাজানো হয়েছে। ক-শ্রেণীর নিচু খাটো বেঞ্চ একেবারে আগে, তার পিছনে খ-শ্রেণীর, তার পিছনে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত উঁচু বেঞ্চ। মোটামুটি ভাবে এই ব্যবস্থাটা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলে চিকের আড়ালে খুব কম খরচে সাজানো একটা প্রাইভেট কলেজের লেকচার গ্যালারির

* 'হ্যাণ্ডার' মূল অসমীয়া শব্দ অর্থে, বাধা দেওয়ার জন্য পাথালি করে বেঁধে রাখা বাঁশ।

চেহারা দেখা যেতো; কিন্তু এ শৃঙ্খলা বেশিদূর টেকেনি। এক রকমের কাগজের অভাবে তাড়াতাড়ি করে বাজারে ছেড়ে দেওয়া পাঁচমিশেলি চেহারার সংস্কৃত নোট বইয়ের মতই শেষের দিকে জুড়ে গেল উকিলের ঘরের সামনের বারান্দায় রাখা মক্কেল বসার লম্বা বেঞ্চ, মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের চেয়ার, দিই না দিই গড়িমসি করে দেওয়া, নিচে R.S. লেখা রমেশবাবুর চেয়ার কটা।

এই চেয়ার বেঞ্চগুলোতে বয়সানুক্রমে বসার কোন রকম ভাগ বাঁটোয়ারা নেই, কিন্তু বসার সময় আপনা আপনি ভাগ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। চিকের কাছ থেকে পিছন দিকের আট দশটা বেঞ্চে ছাত্রী-অছাত্রী-প্রাক্তন ছাত্রী এধরনের স্থানীয় মেয়েরা ঠেলাঠেলি করে বসেছে। পিছনের চেয়ার বেঞ্চগুলোতে যদিও মর্কট-কর্কট জাতীয় কোন প্রাণীর অপশাসনের আশঙ্কা নেই তবুও ঐ অঞ্চলে বসার কণামাত্র ইচ্ছেও মেয়েগুলোর নেই। ওখানে বসে নৃত্যরত সখীর পায়ের ঘুঙুর পর্যন্ত দেখা যায়, তবুও ওখানে মেয়েদের কেউ বসবে না। ঐ অঞ্চলটায় বসেছে মাঝবয়েসী বুড়িরা, লিলির মা, মন্দিরার ঠাকুরমা, নরেন ডাক্তারের শাশুড়ি।

চিকের আড়ালে গোটা মহিলা অঞ্চলটাকে সমান দুভাগ করে একটা বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়েছে। কবে কে এই বেষ্টনী প্রথার প্রবর্তন করেছিল, সে বিষয়ে বিনন্দমাধব বরুয়ারও কিছুমাত্র জানা নেই। বেড়ার এদিকটায় লম্বা লম্বা বেঞ্চের একাধিপত্য, এদিকে চেয়ার নেই। শেষের দিকে দু-একটা ছিল, কিন্তু এমারজেন্সি কেসে লাগতে পারে বলে কেউ বসে পড়ার আগেই সেগুলো ওখান থেকে নিয়ে পিছনে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। যাত্রা আরম্ভ হওয়ার আগে মহিলাদের বসানোর দায়িত্বে থাকা, পূজা সমিতির অক্লান্ত কর্মী বিনন্দমাধবের ভাইপো শিবা*, শিবার বন্ধু রজনী, সূর্য আর অনিল ঐ চেয়ার কটা দখল করেছিল।

এই ভাগটা সত্যি সত্যিই যাত্রা দেখে আনন্দ পেতে আসা মেয়ে দর্শকদের জন্য। সাজপোশাক, কোন অঞ্চল থেকে এসেছে, কোন কোন তরফের লোক—এর ওপর ভিত্তি করেই মহিলা আর মেয়েলোক—তার মানে বসবার আসন ভাগ করা হয়েছে। বেগুনি রঙের হাফপ্যান্ট পরিয়ে আনা কোলের বাচ্চাটা, ষষ্ঠীর দিন ড্রাইভার মরদের আনা মাপজোকহীন আড়ে বহরে বড় পায়ের স্যান্ডেল জোড়া। কেরোসিন তেলের কুপির আলোয় চর্চিত প্রসাধনে বাঁ কানের ওপর থেকে যাওয়া পাউডারের চমক, তিন ইঞ্চি গজালের মাথা দিয়ে ঘসে ঘসে দেওয়া কপালের মাঝের টিপটা, উৎসাহে দৌড়ে আসা আট বছরের "হেই মা জলদি আয় যাত্রা শুরু বটে" — চিৎকারটা, এসব থেকেই কোন্ মেয়ে বেড়ার কোন্ দিকে বসবে সে বিষয়ে রজনী, সূর্য আর শিবা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়।

---

* 'শিব' শব্দের অসমীয়া উচ্চারণ 'শিবঅ', উচ্চারণ নৈকট্যের কারণে 'শিব'র বদলে 'শিবা' ব্যবহার করা হল। অন্যথায় 'শিবু'।

বানিয়া পট্টি, দেশোয়ালি পাড়া, ওদিকে নদীর পাড়ের মানুষ, শিবা এমনিতেই চিনতে পারে।

'আসুন, আসুন, আপনারা এদিকে আসুন, এদিকে ঢুকে ঐ আগে চলে যান। এই — এই ছোঁড়া এখানে কি? যা বাইরে দিয়ে ঘুরে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে বস'গে যা।' লাহন দাস স্ত্রীপুত্র কন্যা নিয়ে এসেছিল, ইচ্ছে ছিল নিজে ভেতরে ঢুকে বউকে একটা ভাল জায়গায় বসিয়ে দেবে; পরে আর সাহস হল না, যদি কেউ কোত্থেকে উল্টোপাল্টা বলে দেয়। মহিলাদের প্রবেশ পথের মুখে দাঁড়িয়ে বউকে কোথায় বসাল দেখে সে কেটে পড়ল। পরে একসময় সুবিধামত একখিলি পান আর একটা লেমনেড দিয়ে যাবে, ব্যস।

দেশোয়ালি মেয়েছেলেদের তো চিনতে পারা না পারার প্রশ্নই ওঠে না।

'হেই, উধার কাঁহা যাতা হ্যায়, ইধার আও, হিঁয়া বয়ঠো।' 'হিঁয়া' মানে একেবারে শেষের বেঞ্চটা। ওদের টাঙাচালানো মরদগুলোর মতই শিবা ওদের গালিও দিতে পারে।

রজনী একটা ছোট্ট চিমটি কেটে একবার শিবাকে বলল, 'দেখেছিস?'

'হুঁ।'

'অ্যাঁ, সাংঘাতিক।'

সূর্যও মাথাটা কাছে এনে শুনতে পেয়েছিল। বলল, 'আরে কজন অসমীয়ার ঘরে এরকম দেখেছিস অ্যাঁ? একদম পার্সির মত।'

'বাড়ি কোথায় রে?'

'ধনসিংয়ের চালের দোকানের কাছে যে সাইকেলের দোকানটা আছে তার পেছন দিকটায়।'

দেশোয়ালি মেয়েছেলেদের সঙ্গে আসা সামলার মেয়ে তিতলি ইতিমধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। মণ্ডপে ক্ল্যারিওনেট, ঢোলক, হারমোনিয়াম, করতালের ঐকতানে একটা যুদ্ধের সুর বেজে চলেছে। বাপের সঙ্গে তিন মাইল হেঁটে আসা খর্গেশ্বর ত্রিপলের কাছে বসে থাকা ছেলেদের দঙ্গলের মধ্যে বসে ঝিমোচ্ছে, তার ওপরের পকেটে জোরজার করে বাবার ঢুকিয়ে দেওয়া কমলাটা মেরে দেওয়ার জন্য পাশের ছোঁড়াগুলো একজোটে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্যান্ডেলের বাইরে অমৃত, সৈফুদ্দিন ও বাপুটি পাশের হোটেলটায় 'এখানে চা, মাংস ও পরোটা পাওয়া যায়'— লিখে রাখা মোটা কাগজের সাইনবোর্ডটার তলায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে হেঁকে উঠছে, 'এই যে রাত দুটোয় যাত্রা দেখাবে না কি? টাউনে টাকা কামাতে এসেছ?' ঠিক এই সময়ে নিতাই পাড়া থেকে দুই যুবতী মাইসেনা এবং শীতলা সহ তিনজন মহিলা এসে মহিলা অঞ্চলে প্রবেশ করল।

শীতলা আজকের যাত্রাপার্টির পরিচালক বিপিন বরুয়ার মেয়ে। শীতলার বাবার

সঙ্গে আসার উদ্দেশ্য একবার জেলা শহরটা দেখা। মাইসেনার মা এবং শীতলার মা দুই বোন। বিকেল থেকেই মাইসেনা শীতলার বেশবাসে একটা শহুরে ছাঁচ দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত একটা কিছু হয়েও যেতো, কিন্তু শীতলার কাপড় জামাগুলোই যেন একটু কেমন ধরনের। মেখলাটার তিন আঙুল চওড়া ফুলটা যে কি করে ঢাকে, পাটের চাদরটা বার বার বুকে তোলার অভ্যাসও ওর নেই; শেষে বাধ্য হয়ে বাবার নিজের হাতে তৈরি করা রুপোর ফুলপাখিওলা পিনটা বুকে আটকে দিতে হল। গতবার মেলায় যাবার সময় কেনা মাইসেনার স্যাণ্ডেলটা তাকে পরিয়ে বার দুয়েক হাঁটিয়ে দেখা হল। কিন্তু মাইসেনার মনের খুঁতখুঁতুনি একেবারে গেল না। তবুও এখন তুলসীঘাটের মেয়েরা দেখলে শীতলার দিকে একবার ফিরে তাকাবে। এদের নিয়ে এসেছে নিতাই পাড়ার চনমনে যুবক মাইসেনার দাদা বীরেন।

সে ভেতরে ঢুকে মেয়েমানুষের মহল পার হয়ে মহিলামহলের দিকে এগোল। মাইসেনারা তার পিছন পিছন। বীরেন শিবার পরিচিত। দুজনেই একসঙ্গে ক্লাস টেনে স্কুল ছেড়েছে। বীরেনের বাবা ঘরে ছেলেকে সোনার কাজ শিখতে জোরাজুরি করাতে বাপে-ছেলেতে একটু আড়াআড়ি চলছে। ফলে শিবা কি করবে ঠিক করার জন্য সূর্যদের মুখ চাওয়া চাওয়ি করার ফাঁকে বীরেন পাঁচজনকে মহিলা অঞ্চলে বসিয়ে দিয়ে কোমরে গোঁজা রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে বাইরে চলে গেল। এই বেঞ্চটাতে আগে থেকেই তিনজন ভদ্রমহিলা বসেছিলেন। ভোলা কন্ট্রাক্টরের স্ত্রী, ডেকা উকিলের মা আর শিবার ঠাকুরমা।

এই মুহূর্তে একটা হুইসলের তীক্ষ্ণ শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল সমবেত বাদ্য এবং সাজঘরের পর্দার আড়ালে ঘুঙুরের শব্দ। পরমুহূর্তে লম্বা লম্বা বেণী দুলিয়ে হাতের রুমালগুলো মুঠোয় ধরে আগাপাশতলা জিংক অক্সাইডের ঘন পলেস্তারা নিয়ে ছটা মেয়েবেশী ছোকরা দৌড়ে এসে ত্রিপলের মাঝখানে দুই সারিতে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর 'কদম তলে শ্যামল কালিয়া মুরলী বাজায়' বলে একটা গান এবং যুগপৎ নাচ শুরু হল।

কিন্তু শিবার ঠাকুরমা এই শুভারম্ভের প্রতি কোন নজর দিতে পারলেন না। তিনি একবার পাশে বসা মাইসেনার মা ললিতার দিকে আরেকবার ঘুরে পিছনে তাকাতে থাকলেন।

'একটু ওদিকে সরো তো হে', তিনি ডেকা উকিলের মাকে লক্ষ্য করে আওয়াজ দিলেন। ডেকা উকিলের মা এবং আশেপাশের সবাই মাইসেনাদের দলটাকে এর মধ্যে লক্ষ্য করেছে।

'ভাল আপদ ঘাড়ে চেপেছে' বলে মাইসেনাদের দিকে একটু বাঁকাভাবে তাকিয়ে ভোলা কন্ট্রাক্টরের স্ত্রী বিঘৎখানেক সরে গেলেন। ফলে শিবার ঠাকুরমা আর মাইসেনার মা'র মাঝখানে এক বিঘৎ জায়গা খালি থাকল।

সামনের বেঞ্চ থেকে অমলা জিগ্যেস করল, 'কি হয়েছে মাসি?'

'দেখছ না মহারানীদের পুরো লাইন জুড়ে বসতে না পারলে যেন পড়েই যাবে।'

কন্ট্রাক্টরের স্ত্রী নাক সিটকে বলা কথা কটা মাইসেনাদের কানে ঠাক ঠাক করে লাগল। মা মাথাটা একবার উঠিয়েছিল, দেখে মাইসেনা বলল, 'তুই কোন রা কাড়বি না, চুপ করে থাক, ওদের বলতে দে।' পাড়ায় কারও সঙ্গে ঝগড়া লাগলে তার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করা মা'র গুণের কথা মাইসেনা জানে। কিন্তু সে বোঝে আলাদা করে প্রত্যেকটা মানুষ যতই জঘন্য প্রকৃতির হোক, যতই না অভদ্র হোক, তবু এরা সবাই জোট হয়ে একটা তথাকথিত ভদ্রসমাজ তৈরি করেছে। অতএব এখানে মান অপমান, শৃঙ্খলা, ভদ্রতার প্রশ্ন আছে। তিনবার জেলে যাওয়া মানিক গুণ্ডাও এখানে সব সময় চুপচাপ বসে থাকে। কিন্তু কিছু একটা জবাব না দিয়ে কন্ট্রাক্টরের স্ত্রীর কথাগুলো এরকম নিঃশব্দে হজম করে ফেলার মত ঘটনা মাইসেনার মা'র এই বয়স অবধি কখনো ঘটেছে বলে মনে পড়ে না।

কিছু বলবেন না ভেবেও বলব কি বলব না করে বললেন, 'ওদের কথাবার্তার রকমটা দেখছিস না?'

কথা কটা শিবার মা'র কান পার হয়ে ডেকা উকিলের মা রতনী বরুয়ানীর বুকে সজোরে ধাক্কা মারল। গলাটা একটু চড়িয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'শোন, এটা কুয়োতলা নয় যে কোমর কসে দৌড়ে আসবে। বসে আছ বসে থাক, ঝগড়া করতে হলে বাইরে যাও।'

'আমরা কেন যাব। তোমার গায়ে ফোস্কা পড়লে তুমি যাও।'

'বউ, বলছি না তুই চুপ করে থাক।'

'দাঁড়ারে বাবা। কথা বলতে দিবি না নাকি ?'

'থাম না, দাদা আসুক, তুই চুপ থাক, ঝগড়া করিস না।'

কন্ট্রাক্টরের বউ কিছু একটা বলবে বলবে করছিল, এই সময় বছর বারোর মেয়ে মীরা সামনের বেঞ্চ থেকে মুখ ঘুরিয়ে ললিতার দিকে ফিরে বলল, 'কি হে, তোমরা কি এখানে ঝগড়া করতে এসেছ নাকি? ভারি অসভ্য।' ক্লাসফ্রেন্ডের জেঠির পক্ষ নিয়ে কিছু একটা না বলে থাকাটা ঠিক মনে করল না মীরা। কথায় তার সঙ্গে কেউ এঁটে ওঠে না, এ ব্যাপারে ক্লাসেও তার সুনাম আছে। কিন্তু মীরা আর বেশিদূর এগোতে পারল না। মিনতি পাশে ছিল, চাপা স্বরে ধমকে উঠল, 'চুপ কর, ইনি এলেন ওকালতি করতে। এনার সমবয়সী যেন।' মীরার দিদি মিনতি প্রথম বর্ষের ছাত্রী, অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে ঝগড়া করাটাও অপছন্দ করে।

'কোথাকার লোকরে এগুলো?' প্রথম বেঞ্চে বসা সমীরণ মঞ্জুলাকে শুধোয়। ঘটনাটা একদম প্রথম সারি অব্দি চলে এসেছে, কেবল চিকটুকু পার হয়ে এখনও

বাইরে বেরুতে পারেনি। মঞ্জুলা চুপ করে থাকল। পাশ থেকে বোন উত্তর দিল, 'ওদিকে যে পট্টিটা আছে, সেই ওখানকার লোক।'

'তাড়ায় না কেন এগুলোকে? ইস, কেন অন্যখানে আর বসাই যায় না। বড় ভদ্রলোক এলেন। দ্যাখ্ দ্যাখ্ ঐ মেয়েটার নাকফুলটা দেখেছিস ? হি হি হি হি।' ও একবিঘৎ পরিমাণ রুমালে মুখ চেপে হেসে ফেলল। ঠিক তখনই চিকের বাইরে যাত্রাপার্টির যাতায়াতের পথের দিক থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো, 'খুব ফুর্তি?'

সমীরণ মাথা নিচু করল, মুখের ভাবে একই সঙ্গে আনন্দ, লজ্জা এবং কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ পেল। কথাটা কে বলেছে গলার আওয়াজেই সে বুঝতে পারে। যাত্রার আসরের এই চেঁচামেচিতে কার কথা কে শোনে, তবুও এরই মধ্যে একটা গলার স্বর তার চিনতে ভুল হয় না। মাত্র দিন কয়েক আগে এই কণ্ঠস্বরের অধিকারীটির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে।

'বুঝলে, ঐ মেয়েটাকে আমি চিনি। সেদিন জুতো পায়ে তার যাওয়ার কি কায়দা! ঠিকমত পা ফেলতে পারছে না, এদিকে ইস্টাইলের কি বহর! দেখলেই থুথু ফেলতে ইচ্ছে করে।' মিনি নামের একটা মেয়ে ফোড়ন কাটল।

'ছিঃ, গরীব বলে অত ঘেন্না কোরো না। গরীব বলে কি ওদের ভাল কিছু পরতে নেই নাকি ? ওরাও তো আমাদেরই মত। তবে—' এতক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মঞ্জুলা কথা বলল।

সমর্থনের বদলে প্রতিবাদে আহত হল মিনি, 'তোমরা সাম্যবাদী, তোমাদের কথাই আলাদা।' মঞ্জুলার কথার এর চেয়ে ভালমন্দ ব্যাখ্যা মিনির ভাঁড়ারে নেই।

মাইসেনার হাজার আপত্তি থাকা সত্বেও, কন্ট্রাক্টরের বউ, শিবার ঠাকুরমা এদের শালীনতার প্রশ্ন থাকা সত্বেও, ঝগড়ার গতি বাড়তে থাকল। শেষদিকে মাইসেনার মায়ের গলা স্বভাবসুলভ উচ্চতায় ওঠার উপক্রম করল, ভাষাও যথাযথ সঙ্গত ছিল।

'ছোট জাতের সঙ্গে বসলে যদি নাক কাটা যায় তাহলে বাবুদের বউরা আসিস কেন? মাচায় উঠে বসে থাকতে পারিস না?'

'বৌ তুই চুপ করবি তো কর, না হলে আমি চললাম।' মাইসেনা নিরুপায় নিঃসহায়, সঙ্কুচিত লজ্জিত।

'চেয়ারে বসলেই কি আর মানুষ সভ্য হয়? চোদ্দপুরুষের পোড়ামুখ যাবে কোথায়? আর এই ঝগড়ুটেগুলোকে ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ওগুলো গেল কোথায়?'
'ডেকা উকিলের মা উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে শিবা, সূর্য, অনিল আর রজনীকে খুঁজতে থাকলেন। শিবা মেয়েদের ভিড় কমেছে ভেবে 'স্টুডেন্ট টি হাউসে' ঢুকেছিল। সূর্য, রজনী আর অনিল মেয়েদের পিছনে একে অন্যের কাঁধে হাত রেখে অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়িয়েছিল। এই অঞ্চলটাতে অন্যমনস্ক হওয়ার পক্ষে বড়ই

অসুবিধা। কিন্তু ডেকা উকিলের মা উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে ওদের একজনের এবং পরে তিনজনেরই ধ্যানভঙ্গ হল। সূর্য তাড়াতাড়ি করে কাছে গেল। ডেকা উকিলের মা ততক্ষণে পিছনে চলে এসেছেন।

'জেঠি কি হল?' সূর্য জিগ্যেস করে।

'ঐ যে ঐ মেয়েলোক কটাকে ওখানে বসিয়ে দিয়েছিস, ভালই করেছিস। লোকজনের ওপর একটু নজর তো রাখতে হয়।' জেঠি সংক্ষেপে যা বিবরণ দিলেন তাতে সূর্য, অনিল আর রঞ্জনী — তিনজনেরই ধারণা হল যে ঐ পাঁচজন বসেই অকথ্য ভাষায় ঝগড়া করছে আর সত্যি বলতে কি একহাতেই তালি বাজছে। সূর্যর পৌরুষ আছে। সে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে মাইসেনাদের কাছে পৌঁছে গেল।

'আপনারা এখান থেকে উঠুন তো।'

মাইসেনা কেঁদে ফেলতে গিয়েও সামলে নিল। সে তার মা'র মতো হলেই ভাল ছিল। কিন্তু সে তক্ষুনি উঠে দাঁড়াল, 'চল শীতলা।' মাকে কিছু বলার সুযোগই দিল না। তার সামনে মাকে একটা জোয়ান ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করতে দেয় কি করে। মাইসেনার বৌদি আর দূর সম্পর্কের পিসিও শীতলার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। অগত্যা মাকেও উঠতে হল। ওরা সবাই সূর্যের পিছন পিছন মহিলা অঞ্চলের পিছন দিকে চলে এল। সূর্য বেড়ার এদিকটায় এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আপনারা এদিকে চলে আসুন।'

এদিকে অরণ্যরাজ বিচিত্রসিংহ সম্মুখে বেঁধে রাখা মধুপুরের রাজকন্যাকে সম্বোধন করে বলছে, 'হে সুন্দরী, আমার এই রাজ্য, আমার এই দৌলত, আমার সৈন্য সামন্ত সব তোমার চরণে অকুণ্ঠ চিত্তে সমর্পণ করছি, কেবল তোমার একটুখানি ভালবাসার আশায়। আমার প্রতি করুণা কর, হে সুন্দরী।'

সিগারেটে একটা টান দিয়ে বিনন্দমাধব সুন্দরীর উত্তরটা শুনতে যাবে, এমন সময় খবর পেলেন মহিলা অঞ্চলে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। ভিতরে তিনি যতক্ষণে সূর্যের কাছে পৌঁছলেন ততক্ষণে বীরেনও সেখানে হাজির হয়েছে।

'কি হয়েছে? কি হয়েছে?' বীরেন আর বিনন্দমাধব একই সঙ্গে জিগ্যেস করে।

ঘটনাটি সংক্ষেপে বলা হল।

'কেন? ওখানে বসলে কি হয়?' বীরেন ঠাণ্ডা কথায় কাজ হাসিল করার পক্ষপাতী।

'মানে, একটা শৃঙ্খলার ব্যাপার—'

'কিসের শৃঙ্খলা? আপনিই তো বলেছিলেন চাঁদা দিলে ওখানে বসতে পারবে বলে। আমরা চাঁদা দিইনি? আমি নিজে পাঁচ টাকা দিয়েছি।' দানের পরিমাণটাও তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সূর্য কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, বিনন্দমাধবের মুখের ওপর অত চোটপাট সে সহ্য

করতে পারল না। বীরেনের গলার ওপর একপর্দা চড়িয়ে বলল, 'পাঁচটা টাকা চাঁদা দিয়ে কি এত বাহাদুরি করছ? নাও, নিয়ে যাও, তোমার চাঁদা না হলেও পূজো হবে।' সূর্যর পাঁচ আঙুলের ফাঁকে ওপরের পকেট থেকে পাঁচের বদলে একটা দশ টাকার নোট বেরিয়ে এল, বিকেলের কার্নিভালের দলামোচা নোট। বীরেনের কান লাল হল, সে বলে ওঠে, 'কি, তুমি টাকা দেখাচ্ছ নাকি?'

'বাদ দাও, বাদ দাও, চল তো, ঝগড়া করার দরকার নেই।' একজন সূর্যকে ঠেলে বাইরে নিয়ে গেল। বেরিয়ে যেতে যেতে সূর্য চেঁচাল, 'নয়তো কি? সাত জন্মে পাঁচ টাকা দিয়ে দেখেনি, দু পয়সার মানুষ নয়, বড় বড় কথা।'

'আপনারা কিছু মনে করবেন না, ছেলেমানুষের কথা। আপনারা এখানে বসুন, এ সব ঝামেলায় যাবেন না।' বিনন্দমাধব বিনম্র হয়ে মাইসেনাদের বোঝালেন। মাইসেনারা বসল মহিলা মহলের একেবারে শেষের ইমারজেন্সি চেয়ারগুলোতে। বীরেনের পিঠে হাত দিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে বিনন্দমাধব দেখলেন যে ইতিমধ্যে মহিলাদের দিকটায় অনেক লোক ঢুকে পড়েছে। গণ্ডগোলের আভাস পেয়ে খবর নিতে আসা অভিভাবকবৃন্দ। ইতিমধ্যে শিবা দৌড়ে এল। বিনন্দ তাকে একদিকে টেনে নিয়ে বললেন, 'তুই কোথায় ছিলি? এখানে আজেবাজে লোক ঢুকতে দিস কেন? বার বার বলেছি তুই গেটে থাকবি। বার করে দে সব।'

ধীরে ধীরে অবশ্য সবাই বেরিয়ে গেল। একটা গণ্ডগোল না হলে ভেতরে থাকাটা খারাপ দেখায়। ভিতরে গণ্ডগোলের সবিশেষ বিবরণ শিবা এতক্ষণে টের পেল। স্থানচ্যুত মাইসেনাদের কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল। অনুতাপে তার গলা নরম হয়ে এল। মাইসেনার মা'র কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বলতে লাগল, 'বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটে গেল মাসিমা, আমি এসব কিছুই জানতাম না। আমি গেটে ব্যস্ত ছিলাম। যেখান সেখান থেকে লোক এসে ভেতরে ঢুকে পড়ে, এই নিয়ে কালকেও গণ্ডগোল হয়েছে। আর কিছু ছেলেপিলে আছে অকারণে ভেতরে ঘুরে বেড়ায়। আমি ছাড়া এসব সামলানো কারও সম্ভব নয়। আজ দেখুন, বাইরের উটকো পাবলিক একেবারে নেই। কিন্তু আমি ওদিকে থাকতে থাকতেই যে এদিকে এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল জানতেই পারিনি। যা হয়েছে, হয়েছে, আজ শেষের দিন আর কিছু মনে রাখবেন না।' শিবা অনর্গল বলে গেল। শহরটার মধ্যে ওর যাদের সঙ্গে কথা বলার সুবিধা আছে সেই বয়স্কা মহিলারা সবাই তার মাসি, আর যারা মাসি নয় তারা পিসি। মাসির কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে সে মাইসেনাকে জিগ্যেস করল, 'তোমাদের খুব খারাপ লাগছে তাই না?'

'না খারাপ লাগার কি আছে?' মাইসেনা মাথা নিচু করে উত্তর দিল। শিবা একবার শীতলাকে দেখে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

যাত্রার একটা দৃশ্য শেষ হয়েছে। কনসার্ট বাজছে। যাত্রার অভিনেতাদের

কয়েকজন সাজপোশাক সমেত 'স্টুডেন্ট টি হাউসে' ঢুকে পড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। অরণ্যবন্দিনী পিছন দরজা দিয়ে সাজঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাঁহাতে মেখলাটাকে কুঁচিয়ে ধরে নিয়ে ডানহাতে বিড়ি ধরে টেনে চলেছে। দর্শকদের মধ্যে কয়েকজন এই মওকায় বাপুর পানের দোকানে গিয়ে একটা পান খাওয়ার জন্য হুটোপুটি শুরু করেছে। পাশের পানের দোকানের দোকানদার বুলু সারাদিনের বিক্রির পয়সা ভরে রাখা ক্যাপস্টান মিক্সচারের কৌটো ঝাঁকিয়ে চেঁচিয়ে চলেছে, 'এই চলে গেল, শেষ হয়ে গেল মিঠে পান।' ছোট ভাই দুলু বিক্রির জন্যে রাখা একটা হুইসল তুলে নিয়ে প্রাণপণে বাজিয়ে চলেছে।

মুখে স্যাদা রং মাখা, সাদা জামাকাপড় পরা একজন ত্রিপলের ওপর একটা কাঠের চেয়ার রেখে গেল। বোঝা গেল, পরের দৃশ্য আরম্ভ হবে আর সেই দৃশ্যে রাজা আসবেন।

'মাসিমা, চা খাবেন নাকি?' শিবা একবার মাইসেনার মাকে জিগ্যেস করল।

'না বাপু থাক,' মাসিমা উত্তর দিলেন।

'তুমি খাবে বল তো আনিয়ে দিই।'

মাইসেনাও মাথা নাড়ল। অগত্যা শিবা পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেটের রাংতায় মোড়া কয়েকটা পান বার করল।

রাজার বেরোনোর কথা থাকলেও রাজা এলেন না, তার বদলে রিহা মেখলা পরা বছর তেরোর একটা ছেলে এবং খালি গায়ে কোট পরা একটা যোয়ান ছেলে। এরা যাত্রার সঙ। প্রথমে গান আরম্ভ করে প্রমীলা বেশধারী সঙটি একটি বিশেষ মুদ্রায় দাঁড়িয়ে রইল। আর পুরুষটি তার চারদিকে ঘুরে ঘুরে তার রূপ গুণ কীর্তন শুরু করে দিল। নাচের সময় ছেলেটা একবার মেয়েটার থুতনিটা ধরে মুখটা ঘুরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল উঠল। 'লাগাও ফুর্তি', বলে কেউ বা কানফাটা চিৎকার করল।

'যুদ্ধ লাগলে আমাকে উঠিয়ে দিস,' বলে ঘুমিয়ে পড়া হরুবাপু যুদ্ধ লাগার আগেই চিৎকারের চোটে উঠে বসল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই বিশেষ দৃশ্যটি উপভোগ করে ইদ্রিস জিভের নিচে দুটো আঙুল চালিয়ে একটা সিটি মারল।

এমন সময় শীতলা মাইসেনার কানে কানে বলল, 'আমার ভাল লাগছে না দিদি, চল উঠে যাই।'

'কি হল তোর?'

শীতলা কোন কথা না বলে মাথা নিচু করল।

'ঠিক আছে, আর একটু দ্যাখ। বেশি দেরি করব না।' এমনিই মাইসেনা একবার পিছন ফিরে দেখল, শিবা ওদের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। মাথা হেঁট করে মাইসেনা কিছু একটা আন্দাজ করল। কেন যে ওর কান দুটো গরম হয়ে উঠল নিজেও ঠিক বুঝতে পারল না।

'এনকোর এনকোর' বলে চারদিক থেকে বার বার অনুরোধ আসা সত্বেত্ত সঙ দুজন একছুটে সাজঘরে ঢুকে পড়ল। পর্দার আড়ালে রাজা তৈরি হয়েই ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন, পিছনে পিছনে মন্ত্রী। লোক পাঠিয়ে সেনাপতিকে ডেকে আনা হল। রাজা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে উচ্চস্বরে অকর্মণ্যতার জন্য সেনাপতিকে ভর্ৎসনা করতে থাকলেন। নাট্যকার গোপীনাথ বরার মতে, এই অংশের ডায়লগ মেডেল পাওয়ার মত। সহিষ্ণুতার শেষ সীমা পার হয়ে এবার সেনাপতিও দাম্ভিক ভাষায় জবাব দিতে শুরু করল। এবার রাজা হাতের উন্মুক্ত তলোয়ার সেনাপতির বুকে বসিয়ে দিলেন এবং সেনাপতি 'হে ভগবান' বলে লুটিয়ে পড়ল। এমন সময় চিৎকার শুরু হল 'সামনের লোক বসে পড়ুন, সামনের লোক বসে পড়ুন।'

কিন্তু সামনের লোকেরা কিছুতেই বসে পড়তে রাজি নয়। বুদ্ধি করে বিনন্দমাধবদের ঠিক করে রাখা আগের পূজোতে গণ্ডগোল পাকানো গুণ্ডা রামপালের অশেষ চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে প্রায় সবাই বসা থেকে চিকের দিকে ফিরে উঠে দাঁড়াল। বিনন্দমাধব তাড়াতাড়ি প্রমীলা মহলের দিকে পা বাড়ালেন। তিনি প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকছেন ঠিক সেই অবস্থায় তাঁর গা ঘেঁসে দৌড়ে বেরিয়ে গেল শিবা। কিছু বুঝতে না পেরে তিনি 'শিবা শিবা' করে বার দুয়েক চেঁচালেন।

কিন্তু সম্ভবত শিবা তখন আলো থেকে নিজেকে আড়াল করতে প্রাণপণে দৌড়ে চলেছে।

গণ্ডগোলের আনুমানিক কেন্দ্রস্থল লক্ষ্য করে বিনন্দমাধব এগোলেন। শীতলাদের কাছে আসতেই দেখলেন, মাইসেনা দাঁড়িয়ে আছে, লাইটের আলোয় তার মুখটা আগুনের মত লাল। তার সারা শরীরের সঙ্গে হাতের মুঠোয় বাগিয়ে ধরা স্যান্ডেলটাও রীতিমত কাঁপছে।

ঠিক তারই পাশে হাঁটুতে মুখ গুঁজে নিজেকে লুকোনোর চেষ্টা করে চলেছে শীতলা। বোধহয় কেঁদে ফেলবে।

বিনন্দমাধবের পিছনে তখন ঘটনার বিশদ জানতে আসা মানুষের উপচে পড়া ভিড়। প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে গেটে কেউ নেই। সহকারী সম্পাদক গোবিন্দ ত্রিপলের কাছে গিয়ে যাত্রার অভিনেতাদের প্রায় ধমকে বলে উঠলেন, 'কি করছেন আপনারা? চালিয়ে যান।' অন্ততঃ কিছু মানুষকে যদি আকৃষ্ট করে রাখতে পারা যায়।

মৃত্যুপথযাত্রী সেনাপতি দাঁড়িয়ে পড়ে ঘাড় উঁচু করে ঘটনাটি বোঝার চেষ্টা করছিল। গোবিন্দর এক ধমকে ধপ করে লুটিয়ে পড়ে ককিয়ে উঠল, 'উহ্ আহ্, আপনি, আ-মা-কে লঘু পা-পে-তে গুরু দ-ণ্ড দিলেন ম-হা-রা-জ। আ-মি কোন অ-মা-ন-বি-ক কাজ করিনি।'

ভুল ঘরে

তিন রাস্তার মাথায় দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলাম। এদিকে আগে কখনও আসিনি। একে তাকে জিগ্যেস করেই অ্যাদ্দুর এসেছি। এই দুটো রাস্তার কোন্‌টা দিয়ে যেতে হবে সেটা অনুমান করাও সম্ভব নয়। এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলাম লোকজনের কোন দেখা নেই। কেবল একটা দশ বারো বছরের ছেলে হাতে একটা পাচন নিয়ে শিস দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে এদিকে আসছে।

সাইকেলের সামনে ঝুলিয়ে আনা ঝোলাটায় আরেকবার চোখ পড়ল। নিচের দিকে একটা জায়গা গোল হয়ে ভিজে গেছে। বোধহয় মিষ্টির ঠোঙাটা ফেটেই গেছে। বিধিমতে বার করে একবার দেখে ঠিকঠাক করে রাখা উচিত ছিল, কিন্তু কুঁড়েমিতে পেল।

'ও ভাই! দক্ষিণপাটে কোন্ দিক দিয়ে যাব বলতে পারো!' বাচ্চা ছেলেটা আসতেই জিগ্যেস করলাম।

'কোথায়'?

'দক্ষিণপাটে'।

সে সামনের তিনটে রাস্তা ভাল করে দেখে নিল। তারপর হাতের ডালটা তুলে দেখাল, 'এই দিকে'।

তার পাচনটা যে রাস্তা দেখাল সেই রাস্তা দিয়েই আমি অ্যাদ্দুর এলাম। হাসি পেল। হেসে বললাম, 'ঠিক আছে, যা।' একটু সময় ভেবে নিয়ে সাইকেলে চড়ে ডানদিকের রাস্তাটা ধরলাম।

দক্ষিণপাট। মা'র ইচ্ছাপূর্ণ হলে এটি আমার ভবিষ্যৎ পত্নীর গ্রাম। বয়স ছাব্বিশ হল। বিয়ে এড়ানোর যুক্তি কমে এসেছে। যুক্তি দেখানোর প্রয়োজন বা ইচ্ছেও আর নেই। তার ওপর মা'র জন্য কমবেশি কিছু ভাবতেই হয়। মা'র জন্য অনেক কিছু করার আছে। আর এই কারণেই রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণপাট খুঁজতে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু এই যাত্রার পিছনে আমার আন্তরিক তাগিদের চাইতেও মা'র প্রতি দায়িত্ব পালনের ইচ্ছেটাই বেশি, কথাটা ভেবে মনটা

মাঝে মাঝে অবসন্ন হয়ে পড়ছে। কনের বাড়ির সঙ্গে পরিচিত হয়ে, নিজে দেখে কনে পছন্দ বা অপছন্দ করতে নিজেই চলেছি।

ঝোলায় দুফানা কলা, কয়েক রকমের আধসের মিষ্টি, তিনটাকা দামের একগজ ব্লাউজের কাপড় আর একটা নতুন বছরের ক্যালেন্ডার। এর একটা জিনিসও আমার মতামতের অপেক্ষা রাখেনি — মা'র কথামত আমি কেবল দোকান থেকে কিনে এনেছি। অবশ্য ক্যালেন্ডারটা আমার ঘরের বেড়া থেকে খোলার সময় আমি আপত্তি করেছিলাম। মা বললেন, 'হোক, তুই পরে একটা আনিয়ে নিতে পারবি, গ্রাম গঞ্জে বাড়ি, তায় ছেলেপিলের ঘর, দিলে খুশি হবে।' মা রঙচঙে ছবিটার কথাই বোঝাতে চাইছিল।

তারপরে খুশি মনেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তা অবধি মা এগিয়ে দিয়েছেন। আমি সাইকেলে চড়ার মুহূর্তে মা বোধহয় একবার আমার স্বর্গত পিতার কথা ভেবেছিলেন। আমি কিন্তু সেই সময় অন্য কিছু ভেবেছি। দক্ষিণপাটে যেতে আমার একটুও আপত্তি নেই, তবু কল্যাণীর কানে একবার কথাটা তুলে দিয়ে যেতে পারলে ভাল হত।

একবার তাড়াতাড়ি ব্রেক চেপে ধরলাম। প্রয়োজনের থেকেও দশহাত দূরে গিয়ে সাইকেলটা দাঁড়াল। পুরোনো সাইকেল। পাশ কেটে বেরিয়ে লোকটিকে ঘাড় ফিরিয়ে ডাকলাম। 'এই যে শুনুন তো, দাদা দক্ষিণপাটে যাওয়ার রাস্তা এটাই তো, না কি?'

লোকটি কাছে এলো, বলল, 'ইস, ভুল করেছেন ঐ তিন রাস্তার মাথাতেই ঘুরতে হত। যাক, এসেই যখন পড়েছেন ফিরতে হবে না। একটু ঘোরা পড়বে যদিও এদিকেই যান, একটু এগিয়ে বাঁদিকে একটা পায়ে চলা পথ পাবেন, ওটা দিয়ে বেরোলেই সোজা পাকা রাস্তায় পড়বেন। ঐ রাস্তা ধরে এগোলে প্রথমে বরজহা, তারপরেই দক্ষিণপাট।'

'ধন্যবাদ'।

'অবশ্য পায়ে চলা পথে সাইকেলে একটু অসুবিধা হবে।'

'তা হোক, যোয়ান মানুষ' কথাটা এমন ভাবে বললাম, নিজেরই হাসি পেল। লোকটিও হেসে ফেলল। আবার সাইকেলে উঠলাম।

কষ্ট সহ্যও করতে পারি, অগ্রাহ্যও করতে পারি। ছাব্বিশ বছরে যাকে বলে যোয়ান মরদ। আমার ছাব্বিশ বছরের দশটা বছর পার করার স্মৃতি আমি কখনই ভুলতে পারব না। মা'র বোধহয় আমার চাইতে বেশি মনে আছে। বাবা বেঁচে থাকলে বোধ করি কথাগুলো এমন ভাবে মনে থাকত না। লোকের ঘরে ধান ভেনে, কাপড় কেচে, মা'র আমাকে পড়ানোর কষ্ট এক সময় আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। লুকিয়ে-চুরিয়ে উপার্জন করে মাকে রেহাই দেওয়ার কথা ভেবে একেকদিন অস্থির হয়ে যেতাম।

আজ অবশ্য বুঝতে পারি, সে সময়টা ছিল অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতার। একদিন দেখলাম আমাদের স্কুলের একসঙ্গে পড়া ইক্রাম একটা খাসির ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে সামনে ঝুলিয়ে বসে আছে। সামনে দাঁড়িপাল্লা। নিঃসন্দেহে উৎসাহ পেলাম। পান বিড়ির দোকান খুলব বলে মা'র কাছে টাকা চাইলাম। আমার বয়স দশ বছর কমিয়ে দিয়ে মা আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন, আমিও কাঁদলাম।

এরপর থেকে এরকম উপার্জনের ইচ্ছা নিয়ে মা'র কাছে আর অনুমতি নিতে যাইনি। যেদিন সত্যি সত্যিই কাজের উপযুক্ত হলাম সেদিন মা নিজেই আমাকে এগিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য কেরানির চাইতে বেশি কিছু ভাবার পক্ষে মা'র সহায় সম্বল কমে এসেছিল। তাঁরই কথামত আমি চাকরির জন্য রামদাস সেরেস্তাদারের সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়ি গিয়েছিলাম — নম্র মুখে, চাল-চলনে একটা গাম্ভীর্য নিয়ে। আর সেদিনই কল্যাণীর সঙ্গে প্রথম দেখা।

পাঁচ বছর আগে তখন কল্যাণীকে সেরেস্তাদারের মেয়ে বলেই ভেবেছিলাম। প্রথম দেখাতেই ভাল লেগেছিল। খুব সহজ ভাবেই ওর সঙ্গে আলাপ চালাতে পেরেছিলাম। এর চাইতে ওর বেশি অপকার করার ইচ্ছা আমার ছিল না।

কল্যাণী ওর নিজের কথা শুনিয়েছিল: ওর বাবা মা বেঁচে নেই, দাদা নিষ্কর্মা। ও তাই সেরেস্তাদারের ঘরে ঝাড়া হাত পায়ে দিন গুজরান করে। ও সেরেস্তাদারের বাড়ির ঝি নয়, কিন্তু কি, এই উত্তরটা পায় না বলেই খুব বাজে লাগে। সেরেস্তাদারের নিজেরও ছেলেমেয়ে আছে।

মা'র কথা, আমার কথা ভাবতে গিয়ে কল্যাণীর কথাও চলে আসছিল। অন্য কারও কথা না ভেবে কল্যাণীর কথা ভাবছি কেন, তার পক্ষে আমি যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করছিলাম। বছর দুয়েক পর ক্রমশ কল্যাণীর সহজ-সরলতা সম্পর্কে আমি সন্দিহান হয়ে পড়ছিলাম। এক সময় সত্যিই মনে হল কল্যাণী মেপেজুপে কথা বলে। প্রয়োজন বুঝে হাসে, ঘরের খবরের চেয়ে আমার ভালমন্দ সংবাদের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়।

হঠাৎই কল্যাণী আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিল। এরা বুদ্ধিমতী হলে এবং নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়লে সাধারণ আদান প্রদানগুলো রহস্যময় এবং জটিল হয়ে পড়ে, কল্যাণীকে দেখেই কথাগুলো সেদিন থেকে ভেবে চলেছি।

দুর্ঘটনা বাঁচাতে আলপথ থেকে পাশ কাটাতেই একেবারে ভেবেলী লতা এবং ঢেঁকিশাকের ঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। সাইকেলটা টেনে আনতেই কানের মধ্যে খরখর করে উঠল, 'চোখ বুজে সাইকেল চালাও নাকি?'

দুটো ছেলে, একটা ষোল আরেকটা বছর বারোর।

'আমি তো ঠিকই আসছিলাম, এখন তোমরা যদি হঠাৎ করে গাছের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসো — আমি কি করতে পারি?'

'কি করতে পারি। যদি করতেই না পারো তো সাইকেলওয়ালা হয়েছ কোন্ কম্মে।' ওরা চলতে শুরু করল। যেতে যেতে ছোটটা বলে গেল, 'ইস, সাইকেল দেখাতে এসেছে।'

আমি একটু হাসলাম। ঝোলাটা ঠিকঠাক ঝুলিয়ে আবার সাইকেলে উঠলাম। পায়ে চলা পথ এবার কল্যাণীর চিন্তা ছেড়ে আমার যুবশক্তির অনুশীলনে আমাকে বাধ্য করল।

মাথার ওপরে এপাশ থেকে ওপাশে হেলে থাকা বাঁশ, সামনে দেখা যাচ্ছে কোন এক সময়ে দারুণ বৃষ্টির পরে এ রাস্তায় চলা গরুর গাড়ি, গরু-মোষের, মানুষের চলার অবিকৃত সাক্ষী যা আমার সাইকেলের যম। মিষ্টির ঠোঙাটা ফেটে যাওয়ার ব্যাপারে আমি এখন নিঃসন্দেহ। তবু আমার কিছু করার নেই বলেই মনে হল। অবশ্য প্রয়োজন হলে হবু পত্নীর বাড়ির লোককে এ যাত্রার বিবরণ দিয়ে মিষ্টি-কলা-কাপড় একাকার হয়ে যাওয়ার কারণটা জানানোর চেষ্টা করতে হবে। একটু লজ্জার কথা, কিন্তু বোঝালে বুঝবে নিশ্চয়।

অবশ্য আশা করে অনেক ক্ষেত্রেই ফললাভের থেকে বঞ্চিত হতে হয়। কল্যাণীও কি জানি, সেটাই বোঝাতে চেয়েছিল মনে হয়। গোল মুখ, ফর্সা রং, উজ্জ্বল এবং তীক্ষ্ণ চাউনি, অনবরত চুলে বিলি কাটতে থাকা সরু আঙুল, সব মিলিয়ে প্রায়-সুন্দরী কল্যাণীর থেকে অবশ্য আমি অনেক বেশি আশা করেছিলাম। যদিও নিজে আশা করেছিলাম এবং নিজে নিজেই নিরাশ হলাম। যদি আমার বিশ্লেষণ সঠিক হয় তবে কল্যাণীর চোখে মমতা, কথায় সহানুভূতি ছিল এবং অন্তরে ভালবাসা অবশ্যই ছিল। কিন্তু তা যে আমার জন্য এ কথাটা প্রথমে ভাবতে যত ভরসা পেয়েছি, পরে ততটাই সন্দেহে ডুবে গেছি।

গত তিন বছর ধরে কল্যাণী আমার সঙ্গে কেবল মৌখিক পরিচয়টাই রক্ষা করে আসছিল যেন। শুধু আত্মতুষ্টির জন্য আমি তার মধ্যে হৃদ্যতা খুঁজে পেতাম। যুবক-যুবতীর বন্ধুত্ব, হয় সেটা বেড়ে প্রণয়, নয়তো কমে গিয়ে নেহাৎই পরিচিতির পর্যায়ে চলে আসে,— কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাতে আমার লোকসান।

একবার কয়েকদিনের জন্য সেরেস্তাদার পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেই নতুন জায়গায় কল্যাণী আমার কাছে কাছেই থাকল। আমার সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করে, বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করে ও সমস্ত ব্যাপারটা উপভোগ করেছিল। ওর সারল্যে ভরা দিনগুলিতে আমারও ভালই কেটেছিল। মাঝে মাঝে নিজের মনের কথা বলার জন্য সুযোগের কথা আমি যে আগে ভাবিনি তা নয়। কিন্তু নতুন জায়গায় এসে কল্যাণীকে সারাক্ষণ কাছে পেয়ে কথাটা মনে এলো না। এখন এর একটা সাধারণ ব্যাখা করে নিজেকে আশ্বস্ত করি। সেদিন নতুন জায়গায় একটু

খোলামেলা মন নিয়ে আমার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। ওখানে মানুষ বলতে আর কে-ই বা ছিল। আমাকে নিরীহ্ গোছের দেখে একটু খাটিয়ে নিয়েছিল। বুদ্ধিমতী মেয়ে, সন্দেহ্ নেই।

এভাবে ভেবে দেখলে আমার সকল আশায় ছাই পড়ে। কল্যাণীকে এত ভালবাসি, তার সম্পর্কে এ ধরণের রূঢ় চিন্তা করতে ভাল লাগে না।

পরে মা'র কথা ভেবে একটা নতুন চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতেই হ্ল। পাড়ার বিভিন্ন তরফের লোক নানা ভাষায় আমাকে যে কথাগুলো জানায়, শেষে তার একটাই অর্থ দাঁড়ায়, মা'র সুখের জন্য তাড়াতাড়ি আমার একটি বিয়ে করা দরকার।

আমার সমবয়সী ইন্দির মাকে একদিন আমার জামা ধুতে দেখে কলের পাড়ে 'বলি আর কত দিন এভাবে কাটাবে?' বলে চোখ মটকাল।

'ঠিক আছে, ভালই তো চলছে।'

'চলবেই তো— ।' ইন্দির মুখ টিপে হাসল। ওর ইশারা ইঙ্গিত মাঝে মাঝে অরুচিকর ঠেকলেও বেশির ভাগ সময়ই বেশ মজার। আমি হাসলাম, বললাম, 'তোমার স্বভাব আর গেল না।'

'ঠিক আছে, আমাদের কথা ছাড়, তুমি নিজে কিছু একটা কর যদি তো কর, আর না হলে আমাদের বল আমরাই পারব।'

'বাঃ, না পারার কি আছে? ইচ্ছে করলে তুমি একটা ঘটকালির দোকানও খুলে ফেলতে পারো।' আমি হেসে উত্তর দিলাম।

ইন্দির মাকে উসকে দিয়ে গেল।

শান্তির বুড়ো বাপ একদিন আমাকে ধীরে সুস্থে বসিয়ে নিয়ে জানালেন, 'বাপু, বাবার যা হ্ল সে তো হ্ল, যা গেছে, তা গেছে সে সব ভেবে লাভ নেই। কিন্তু তোর মা'র ওপর একটু নজর রাখিস। তোর জন্য বড় কষ্ট করেছে। তোকে আর বলে কি হবে, তুই তো সবই জানিস। তোর যদি একটা বিয়ে-টিয়ে হ্য়ে যেত তাহলে বুড়ি বাকি দিন কটা তোদের নিয়ে আনন্দে কাটিয়ে দিত।'

'দাদু, বুঝি সব, আদতে টাকাপয়সার আরেকটু জোগাড় না হলে সাহস হ্য় না।'

'ঠিক কথা, ভেবে-চিন্তে কিছু একটা কর। তোদের জ্ঞানগম্যি হয়েছে —।'

আমার বাবার চাইতে অনেক বড় শান্তির বাবা। চোখে দেখেন না, গলা শুনে টের পান কে। অনেক দিন সংসারটাকে আগলে রেখে এখন শেষের পথ চেয়ে বসে আছেন। হয়তো সংসারের মায়া এখনও ত্যাগ করতে পারেননি। তাই তাঁর সব কথাতেই একটা বিদায়ের ভারাক্রান্ত সুর শোনা যায়।

একদিন রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে জেঠাইমা জিগ্যেস করলেন 'হ্যাঁ রে পবন, মাকে এই রান্নাঘরটা থেকে মুক্তি দিবি না নাকি ?'

'মাঝে মাঝে তোরা একটু হাত লাগালেই তো পারিস', আমি জবাব দিয়েছিলাম।

মোটের ওপর সকলেরই এক কথা। গত বছর বিয়ে করেছে সহকর্মী কেরানী উপেন, মাকে মেয়ে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। এক ফাঁকে বলেছিল, 'এবার তোর পালা।'

শেষে যেদিন মা নিজেই বললেন, আমি মা'র পরামর্শ চাইলাম। কিন্তু কল্যাণীর কথাটা বলতে পারলাম না। বার দুয়েক বুকটা ঢিব ঢিব করে উঠলেও কিছু বলা যায়নি। এখন ভাবি, মা পুরোন আমলের, নতুন কথা না শোনানোটা একদিক থেকে ভালই হয়েছে। তাছাড়া মা'র জীবনের সবচেয়ে বড় দায়িত্বটা পালন করার পূর্ণ সুবিধা পেলে তিনি সুখী হবেন। শান্তি পাবেন।

মা'র কথা মতই আজ এই ঝোলাঝুলি নিয়ে দক্ষিণপাটে কনে দেখতে আসা। কিন্তু কল্যাণীর কানে একবার কথাটা দিতে পারলে ভাল হত।

পায়ে চলা পথটা একটা চওড়া রাস্তায় গিয়ে শেষ হল। লোকটার কথামত পাকা রাস্তার নামে এখানে সেখানে দু-একটা পাথর উঁকি মারছে কেবল। ঠিক সময়ে একজনকে পেয়েও গেলাম এবং তার কথামত দক্ষিণপাটের দিকে সাইকেল চালিয়ে দিলাম। কিছুদূর গিয়ে নামতে হল। একপাল গরু রাস্তা জুড়ে আসছে।

সাইকেল নিয়ে পাশ কেটে যেখানে দাঁড়ালাম সেটা একজনের বাড়ির সদর, ঘেঁসতে ঘেঁসতে একবারে ডাঁই করা শুকনো গোবরের ওপর উঠে পড়লাম। দু-একটা গরুর দল পার হয়েছে এমন সময় পিছন থেকে একটা বেশ জোরালো কণ্ঠস্বর কানে এসে লাগল। ফিরে দেখি বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এক বুড়ি।

'সেই সকালে জায়গাটা ঝাঁট দেওয়ার পর থেকে ঝাঁটাটা এই মাঝরাস্তায় পড়ে আছে। এর ওপর দিয়ে অন্তত দশবার মাগী এলো গেল — একটু সরিয়ে রাখ্ — না তা নয়। তোমরাই বল, এই সব অলক্ষুণে স্বভাব চোখে দেখা যায়? সেই কথা বলতেই মহারানী গোঁসা করে ঘরের কোণে গিয়ে ঢুকল। আমাদেরও কেউ সারাজীবনের জন্য দাসী বাঁদী করে পাঠায়নি। সময়মত ভাত না পেলে যখন পিঠে পড়বে তখন বুঝবি ঠ্যালা!'

কথাগুলো বেড়ার ওপাশে ঘরের উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা দুই মহিলার সম্ভবত পুত্রবধূর ওপর বর্ষিত। বেড়ার ওপারের একজন কথোপকথনে অংশ নিল, 'ভাত রাঁধেনি বুঝি?'

'কোথায় ভাত। দেখে যাও তোমরাই, যেখানকার হাঁড়ি সেখানেই পড়ে আছে।'

গরুগুলো পার হয়ে গেল, আমি সাইকেলে উঠলাম। আমার পত্নী মা'র হবে পুত্রবধূ; এই বিষয়ে মা'র পরামর্শ মত চলে ভালই করেছি ভেবে আশ্বস্ত হওয়ার চেষ্টা করলাম।

হসপিটালের সাইনবোর্ডটা দেখে বুঝতে পারলাম আমি বরজহা গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলেছি। খুব তেষ্টা পেয়েছে। কিছুদূর গিয়ে একটা বাড়ির সামনে নামলাম। একটি অল্পবয়সী মেয়ে একটা গরু তাড়িয়ে নিয়ে গেটের সামনে চলে এসেছিল,

এমন সময় আমায় দেখে ঘোমটা টেনে তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল, গরুটা আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। হাতের চেলাকাঠটা ফেলে দিয়ে মেয়েটি ভেতরে ঢোকার মুখে আমি বললাম, 'একগ্লাস জল দেবেন?'

একটু থমকে গেল মেয়েটি। না চেয়েই 'ভেতরে আসুন বলে' ভেতরে চলে গেল। আমি বেড়ার গায়ে সাইকেলটা ঠেস দিয়ে উঠোনের মাঝে জলের জন্য দাঁড়িয়ে থাকলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই একটি ঘটি হাতে মেয়েটি বেরিয়ে এলো। কিছু না বলে ঘটিটা মাটিতে রেখে একটু দূরে সরে দাঁড়াল।

ঘটিটা হাতে তুলে নিয়ে আমি জিগ্যেস করলাম, 'দক্ষিণপাট আর কদ্দুর?'

মেয়েটি ঘোমটাটা একটু টেনে নিয়ে বলল, 'জানি না, ঘরে পুরুষ মানুষ কেউ নেই।'

আমি জলটাও পুরোপুরি খেতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি ঘটিটা নামিয়ে রেখে সাইকেলে চড়লাম। কথার সুরটা কানে তখনও রীতিমত বাজছে। আমি কি আলাপ জমানোর চেষ্টা করেছিলাম? একবার নিজেরই সন্দেহ হল। হাসিও পেল। একটু পরে আমার মনে হল আমি দক্ষিণপাটে এসে গেছি। কাছেই একটা গাছের নিচে চেরাবাঁশ দিয়ে তৈরি একটা বেঞ্চে দুজন লোক বসেছিল, তাদের একজনকে জিগ্যেস করলাম, 'এটাই তো দক্ষিণপাট?'

'হ্যাঁ।'

'মনেশ্বর শর্মার বাড়িটা চেনেন?'

'চিনি। সোজা গিয়ে যে রাস্তাটা ডানদিকে ঢুকেছে সেদিকে ঘুরে কারুকে জিগ্যেস করলেই দেখিয়ে দেবে।'

অন্যজন জানালেন, 'জিগ্যেস করার কি আছে, একটু গেলেই বাড়ির সামনে দুটো নারকেল গাছ দেখতে পাবে, ওটাই মনেশ্বরবাবুর বাড়ি।'

'বেশ', বলে এগোলাম।

এবার কিন্তু সত্যিই বুকটা ঢিব ঢিব করছে। একেবারেই অচেনা লোকজন, তার ওপর সম্বন্ধটাও রহস্যজনক, উপরন্তু আমি নিজেই প্রার্থী। সঙ্কোচ হল। কিছু সম্ভাবনার কথা মনে এলো, কিছু প্রশ্নের জবাব চিন্তা করলাম, না দেখা মেয়েটার কথা মনে এলো। আবার একবারের জন্য কল্যাণীর কথা মনে পড়ল। শেষবারের মত তার কথাও একবার ভাবলাম। রাস্তাটা দিয়ে ঘুরে গেলাম। কিছু দূর এগিয়ে একজোড়া নারকেল গাছ একটা বাড়ির সামনে দেখতে পেলাম। ব্রেক চেপে উল্টোপাকে কয়েকবার প্যাডেলটা ঘোরালাম। নিজের অবস্থাটা ভেবে নিজেরই হাসি পেল। এবার আস্তে আস্তে প্যাডেল ঘুরিয়ে এগোতে থাকলাম। যত দেরি করতে চাইলাম নারকেল গাছ দুটো যেন ততই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। গাছ দুটোর মাঝখানে সাইকেলটাকে দাঁড় করাতে পারলাম না। সামান্য এগিয়েই নামতে হল।

ফিরে সাইকেলটাকে নারকেল গাছে ঠেকিয়ে বাড়িটা দেখলাম। সামনে বারান্দা না থাকা একটা খড়ের ঘর। বেড়াগুলো মিহি করে মাটি দিয়ে লেপা। এখানে ওখানে এক আধ চাপড়া চুন লেগে আছে। আশেপাশে চুনে লেপা ঘর দেখে বাচ্ছাদের চকের ঘসা মনে হল যেন। উঁচু ভিটেটায় ভোরবেলায় পরিপাটি করে লেপার চিহ্ন আছে। গেটের কয়েকটা বাঁশ খুলে সাইকেলটা ঠেলে উঠোনের একপাশে রেখে দিলাম। উঠোনের মাঝখানে ধান শুকোতে দেওয়া আছে। সাইকেলটাকে এবার দাওয়ায় ঠেকিয়ে রাখলাম। সাবধানতা সত্ত্বেও কিছুটা মাটি খসে পড়ল। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম তের চোদ্দ বছরের একটা ছেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখে হওয়ায় আমি জিগ্যেস করলাম, 'বাবা বাড়িতে আছে ভাইটি?'

'নেই।'

'কোথায় গেছেন?' চটপট জানতে চাইলাম।

'নামঘরে*।'

'কখন আসবেন?'

'নামগান শেষ হলে আসবেন।'

'কটা নাগাদ?'

'জানি না, কেন?'

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'আমার দেখা করা দরকার ছিল। তা নামঘর কত দূরে?'

ছেলেটা আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে দেখে আশ্বস্ত হলাম। বলল, 'ঠিক আছে, আপনি ভেতরে বসুন, আমি বাবাকে ডেকে আনি। আসুন।'

ভেতরে গেলাম। মোটামুটি ভাবে ঘরটা সাফসুতরো। এক কোণে খুঁটিতে একটা হরিণের সিং, তাতে লাল নীল কাগজ জড়ানো একটা বাঁশের ধনুক আর রুদ্রাক্ষের মালা ঝোলানো। আমার হবু সঙ্গিনীর বাড়িতে ধর্ম আর নাটক দুটোরই চর্চা আছে বলে মনে হল। সকালবেলা মোছা মেঝেটায় পায়ের দাগগুলো শুকিয়ে গেছে।

আমি যখন ঘরের একমাত্র চেয়ারটায় বসে পড়েছি, তখন আরও চারটে প্রাণী আমার চারপাশ ঘিরে ধরেছে। তিনটি ছেলে, একটি মেয়ে, তাদের বয়স আট, ছয়, চার আর মেয়েটি নিতান্তই বাচ্ছা, সবেমাত্র হাঁটতে শিখেছে। হয়তো দু-একটা কথাও বলতে পারে। শেষের দুটি একেবারে ন্যাংটো, দ্বিতীয়টি বোধহয় দাদার একটা লম্বা শার্ট পরে হাঁটু অব্দি ঢেকে নিয়ে একই সঙ্গে দুই কাজ সেরেছে। সে-ই আমাকে প্রথম প্রশ্ন করল, 'অ্যাই তুই কোত্থেকে আসছিস?'

আমি হেসে বললাম 'অনেক দূর থেকে আসছি।'

চার বছরের যেটা তার প্রত্যয় হল না, বলল, 'ইস অনেক দূর থেকে

---

* আসামের বৈষ্ণবদের উপাসনার স্থান। অনেকটা চণ্ডী মণ্ডপের মত, তবে চারদিক ঘেরা থাকে।

এসেছিস? এই এখান থেকে এলি না?'

আট বছরের ছেলেটাকে জিগ্যেস করলাম, 'তোমার নাম কি মনা?'

উত্তর দিল, 'মনোহর।'

এর সঙ্গে কথা চলতে পারে ভেবে বললাম, 'মা বাড়িতে আছে?'

'না, ঘাটে গেছে।'

'ঘরে কে আছে?'

'দিদি আছে।'

এর মধ্যে দরজা দিয়ে যাকে উঠোনে ক্ষণিকের জন্য দেখেছিলাম বুঝলাম দিদি মানে সে-ই হবে।

আমি একটু ভেবে নিলাম। আসার সময় মা'র শিখিয়ে দেওয়া কথাগুলো মনে পড়ল। একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল। লজ্জাও হচ্ছিল। এরই মধ্যে ছ'বছরের ছেলেটো নিঃশব্দে আমার পিছনে গিয়ে আমার জামাটা ধরে টেনে দিল। তার এই রসিকতা গ্রহণ করার মত মনের অবস্থা আমার তখন ছিল না। অবশ্য মনোহর তাকে ধমক দিল, 'এই গাধা, এ রকম করতে নেই, দাঁড়া, বাবা আসুক, বলে দেব।'

আমি উঠে গিয়ে সাইকেল থেকে ঝোলাটা নামালাম। ব্লাউজের কাপড়টা বার করে শার্টের পকেটে রাখলাম। মনোহরের হাতে ঝোলাটা ধরিয়ে দিয়ে বললাম, 'এটা ভেতরে দিয়ে এসোগে।'

'দিদির হাতে' বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু মুখে যোগাল না। মনোহরের পিছন পিছন আর দুটো প্রাণীও দৌড়ল। মেয়েটার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে একটু দেরি হল। শেষে একা পড়ে গেছে দেখে আমার দিকে একবার তাকিয়ে থপ থপ করে সেও ছুটল। আমি রুমাল বার করে একবার মুখটা মুছলাম। বাবা মা'র অনুপস্থিতিতে সহজভাবে ব্যাপারটা শুরু করতে পারায় একটা স্বস্তি অনুভব করলাম।

ক্ষণিকের দেখা মেয়েটির চেহারাটা ভাবলাম। গায়ের রংটা ফর্সাই মনে হল। ধীরে ধীরে হাঁটছিল। লম্বায় কল্যাণীর মতই হবে। ভেতর থেকে একটা গণ্ডগোলের আওয়াজ এলো। একটা 'রাখ রাখ', একটা 'দে দে' করছে মাঝখানে আবার একটি 'আমি দেখি আমি দেখি' করে চেঁচাচ্ছে। এদের এই নেওয়া দেওয়া, এবং চাওয়াকে কে শাসন করছে অনুমান করলাম।

বেশি সময় একলা থাকতে হল না। ছয় আর চার বছর আবার হাজির হল। তাদের দুজনের এক হাতে একটা করে খোসা ছাড়ানো কলা, তাতে একটা করে কামড় লাগানো হয়ে গেছে। আরেক হাতে আস্ত একটা—বুঝলাম আপাতত দুটো করে ভাগে পড়েছে। ছয় আমার কাছে ঘেঁসে এল, জামা টেনে নাকের শিকনিটা মুছে নিয়ে একটা হাঁটু আমার চেয়ারের একদিকে উঠিয়ে দিল। তারপর আমার পকেটে বাঁ হাতের কলাটা ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই এটা ফাউন্টেন?'

'হ্যাঁ', আমি জানালাম।

সে বাঁ হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তুইও একটা ঘড়ি এঁকে দে না।'

হাতটা ধরে নিয়ে ভাবলাম, ফাউন্টেন পেন দিয়ে ঘড়ি আঁকার কথাটা ও জানে কি করে? অবশ্য খুব আশ্চর্যের ব্যাপার নয়, তবু মনে হল এর আগে কেউ কি ঘড়ি এঁকে দিয়েছিল নাকি? অমূলক চিন্তা ছেড়ে প্রশ্ন করলাম, 'দিদি কি করছে?'

'কাঠ রোদে দিচ্ছে', সে জানাল।

'যা গিয়ে বল, ডাকছি।'

'কেন?'

'এমনিই, যা।'

সে একছুটে 'দিদি দিদি' চিৎকার করতে করতে গেল। আমি একদলা থুথু গিলে ফেললাম। মা'র কথাগুলো মনে পড়ে গেল।

একটু পরে ছয় বছরেরটা ফিরে এল। এতক্ষণে দ্বিতীয় কলাটার ওপর আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। আমি জিগ্যেস করলাম, 'বলেছিস?'

সে মাথা নাড়ল। কিছুটা সময় এমনিই গেল। পকেট থেকে ব্লাউজের কাপড়টা বার করে দু'হাতের মধ্যে ভাঁজ করে লুকিয়ে রাখলাম। আবার ছয়কে বললাম, 'দিদিকে আরেকবার ডাক গে যা।'

পাশের ঘরে ঢুকেই 'এই যে দিদি' বলে একটা আকাশ ফাটানো চিৎকার করে হঠাৎ থেমে গেল। পরক্ষণেই তাকে বলতে শুনলাম, 'তোকে ডাকছে না? ও তুই পালিয়ে আছিস?' অবস্থাটা দুর্বিসহ মনে হল। কান মাথা যেন গরম হয়ে গেল। কি ভেবে ব্লাউজের কাপড়টা আবার পকেটে রাখলাম। একটু পরে শরীরের একপাশ আড়াল করে একটা পা চৌকাঠের ওপর তুলে দিয়ে মনোহরের দিদি এস দাঁড়াল। একটু অপেক্ষা করে জিগ্যেস করল, 'ডেকেছিলেন কেন?'

চোখ দুটো সুন্দর, চাহনিতে একটা অর্থ যেন চেষ্টা করলে বার করা যায়। গায়ের রং উজ্জ্বল, শরীরের গড়নে একটা লাবণ্য আছে। মেয়েটি দেখতে ভাল।

'কেন ডেকেছিলেন?' আমার চোখে চোখ রেখে সে জিগ্যেস করল এবার।

'তোমার নাম কি' অপ্রস্তুত হয়ে জিগ্যেস করে নিজেই হকচকিয়ে গেলাম।

'সাদরী'।

আমি যেন মাথা হেঁট করে নামটা মনে রাখার চেষ্টা করলাম। দ্বিতীয় প্রশ্নটা মনে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। মুখ তুলে চাইতেই তার চোখে চোখ পড়ল। অবস্থাটা অনুকূল থাকলে লজ্জায় কুঁকড়ে পড়া মেয়েটিকে দেখে মজা পেতাম, কিন্তু আমি নিজেই যেন ভারসাম্য রাখতে পারছিলাম না। কথা না বলাটা খারাপ দেখায় ভেবে খপ করে জিগ্যেস করলাম, 'তুমি কদ্দুর পড়েছ?'

এবার যেন ও লজ্জায় নুয়ে পড়ল। আমিও বুঝলাম প্রশ্নটা বড় চিরাচরিত

ধরনের হয়ে গেছে। তবুও সে উত্তর দিল, 'সিক্স পর্যন্ত, *মাইনর দিইনি।'

সঙ্গে সঙ্গে ভাবলাম কেন দেয়নি জিগ্যেস করব নাকি? করলাম না। আবার গভীর করে তাকালাম।

মেয়েটি দেখতেও সুন্দরী, গলাটাও মিষ্টি। অন্তত আমার পছন্দের বিচারে। আমার মুখে আর কথা জোগাল না। পকেটে হাত ঢোকালাম। ব্লাউজের কাপড়টায় হাত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসরোধ হল যেন। আর দেরি নয়। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'নাও, ধর।'

'কি?'

'কিছু নয়— একটা ইয়ে।'

'কেন?'

'এমনিই, ধর না'

'না লাগবে না, ঘরে বাবা-মারা নেই।'

'কিচ্ছু হবে না, ধর। আমি বাবাকে বলে দেব।'

ও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। হাতটা বাড়িয়ে ধরে থাকার শক্তিও আমার নিঃশেষ হয়ে গেল। কান দুটো ভোঁ ভোঁ করছে। অবশ্য একটু পরে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে কাপড়ের টুকরোটা নিয়ে ও সাঁত করে ঘরে ঢুকে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। যেন এইমাত্র একটা ঝড় বয়ে গেল। খানিকক্ষণ একা বসে রইলাম। চারবছুরে, মনোহর — এরা কেউ নেই, সব বেরিয়ে গেছে। আমি সাদরীর কথাই ভাবতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ বাদে বাঁশের গেটটার মুখে একজনকে দেখা গেল। খালি গায়ে দেখে মানুষটিকে কর্মঠ বলে মনে হল। লোকটি ভিতরে এল। বুঝলাম সাদরীর বাবা। চেয়ারটায় সোজা হয়ে বসলাম। তিনি ভিতরে ঢুকেই সোজা প্রশ্ন করলেন, 'তুমি নাকি বাবা আমাকে খুঁজছিলে?'

'আজ্ঞে।'

'কোত্থেকে আসছ?'

'টাউন থেকে।'

'কি ব্যাপার বল তো? আমি তোমাকে ঠিক চিনতে পারলাম না।'

আমি মাথা হেঁট করেই বললাম, 'আপনার বাড়ির কথা বিপিনদা মাকে বলেছিলেন। সেই কথার পর মা একবার আপনার বাড়ি ঘুরে যেতে বলাতে এলাম।'

সাদরীর বাবা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমার মনে হল নির্বাচনী পরীক্ষা যেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'কোন্ বিপিনের কথা বললে?'

---

* ক্লাশ সিক্স থেকে সেভেনে ওঠার জন্য বোর্ডের পরীক্ষা চালু ছিল তখন আসামে। মাইনর ইংলিশ তথা এম ই বলা হত।

'টাউনে থাকে যে বিপিন। সম্পর্কে আপনার ভাগ্নে।'

মাথা নিচু করে কিছু ভাবলেন, তারপর বললেন, 'আমার ভাগ্নে? ব্যাপারটা কি বল তো?'

আমি একে একে বলে গেলাম বিপিনদার মাকে খবর দেওয়ার কথা, মা'র আমাকে পাঠানোর কথা। সাদরীর কথাও তুললাম।

'আচ্ছা তোমার বাবার নাম কি বল তো?'

'মহীকান্ত শর্মা, মারা গেছেন।'

এমন সময়ে ঘটাং করে একটা শব্দ হল। বুঝলাম সাইকেলটা পড়ল। উঠে দরজার কাছ থেকে দেখতে পেলাম। মনোহর হাঁসফাঁস করে সাইকেলটা তোলার চেষ্টায়, বাকি দুটো অপরাধীর মত দূরে দাঁড়িয়ে। আমার পিছন পিছন সাদরীর বাবাও বেরিয়ে এলেন, তিনি ধমক দিলেন, 'এই গাধাগুলো, রাখলি? দাঁড়া, আজকে। এই বদমাশটা, যা ভেতরে যা, প্যান্ট পর গে।'

আমি আবার এসে চেয়ারে বসলাম।

'আচ্ছা বাবা, তুমি আমার বাড়ি খুঁজে পেলে কি করে?'

'একে-তাকে জিগ্যেস করে পেয়ে গেলাম।' প্রশ্নটার কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে ওঁর দিকে চেয়ে বললাম, 'তাছাড়া বিপিনদা বলেছিলেন মনেশ্বর শর্মার নাম বললে যে কেউ বাড়ি দেখিয়ে দেবে।'

'মনেশ্বর শর্মা?'

'হ্যাঁ।'

তিনি চঞ্চল হলেন। খাটো গলায় বললেন, 'এঃ, তুমি দারুণ ভুল করেছ। কে তোমায় বাড়ি দেখিয়ে দিল? ছ্যাঃ ছ্যাঃ।'

আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। আমি ওঁর মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

'মনেশ্বর শর্মার ঘর আগে পড়বে। সরকারি রাস্তায় উঠে একটু গিয়ে ডানদিকে যে রাস্তা পড়বে সেই রাস্তায় একটু এগিয়ে কয়েকটা বাড়ি পেরোলেই দুটো নারকেল গাছ পড়বে বাড়ির মুখে। ওটাই মনেশ্বর শর্মার বাড়ি। আচ্ছা ভুল হয়েছে, যা হোক।'

শেষের কথাগুলো কানের ভেতর গরম তেল ঢালল। আমার মাথাটাই ঘুরে গেল। একটুও দেরী না করে 'আচ্ছা আমি চলি, কিছু মনে করবেন না, বুঝলেন' বলে তাঁর উত্তরের অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে পড়লাম।

বাইরে যে সাইকেলটা নেই, দেখা সত্ত্বেও দাঁড়ালাম না। এক নিঃশ্বাসে নারকেল গাছ পার হয়ে সোজা রাস্তায় এসে উঠলাম। দেখলাম একটু দূরে আট, ছয় আর চার বছুরে, তিনটেতে মিলে সাইকেলটাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। ওপরে কেউ ওঠেনি।

আমি কাছে গেলাম।

ছ' বছরেরটা বলে উঠল, 'অই আমাকে একটু চড়াতো'। সঙ্গে সঙ্গে চার বছরেরটা 'আমিও আমিও' করে প্রায় কেঁদে দিল। আমি তখন অন্য জগতে। সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে এগোতে গিয়ে দেখি একটা বাচ্ছা প্যাডেলের ওপর, আরেকটা মাডগার্ডে উঠে বসেছে। ওদের কিছু দূর নিয়ে যেতে হল। এমন সময় প্রথমে দেখা বড় ছেলেটা ছুটে এসে আমাকে ঝোলাটা ফেরৎ দিয়ে বাচ্ছা দুটোকে নামিয়ে নিয়ে গেল। আমি নির্বিকারে ঝোলাটা নিলাম।

একলাফে সাইকেলে উঠে সাইকেল এবং শরীর দুয়েরই মায়া ত্যাগ করে চালাতে লাগলাম। মনে হল খিলখিল করে সাদরী পিছনে তাড়া করেছে। বাচ্ছাগুলোর খাওয়া কলার খোসাগুলো যেন পিঠে এসে সপাসপ পড়ছে।

প্রথম তিন রাস্তার মাথায় ঐ বাচ্ছাটার দেখিয়ে দেওয়া রাস্তাটাই যে ঠিক রাস্তা বেশ বুঝতে পারলাম। আসলে শিশুদের ভিতরেই ঈশ্বর থাকেন।

কোন্ রাস্তা দিয়ে যে বাড়ি ফিরলাম আমি নিজেই জানি না। একেবারে সোজা পিছনের উঠোনে গিয়ে সাইকেল থেকে নামলাম। নামতে গিয়েই অবাক হলাম। কল্যাণী।

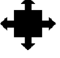
রান্নাঘরের চৌকাঠের পাশে বেড়ায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্থির উজ্জ্বল চাহনি, সুঠাম শরীর, প্রশান্ত হাসি। অনেক দিন আগেকার পুরনো কল্যাণী — ছ' বছর আগেকার। খুঁটিতে সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রেখে জিগ্যেস করলাম, 'কল্যাণী যে — কখন এলে?'

অনেকক্ষণ থেকে উত্তর দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকার মত করে সে একনাগাড়ে বলে গেল, 'কিছুক্ষণ আগে—সকালেই এসেছি; কখন থেকে যাব যাব করছি, আইতা* যেতেই দিচ্ছেন না, বলছেন ভাত খেয়ে যেতে হবে, আমি কিন্তু ভাত-টাত খাব না।'

উঠোনে দড়িটাতে মেলে দেওয়া ভেজা ভেজা গামছাটা দিয়ে কপাল আর গলার ঘাম মুছে ফেললাম।

---

* 'আইতা'-র বাংলো প্রতিশব্দ নেই। সম্মানিত প্রৌঢ়া রমনীকে অসমীয়াতে এই নামে সম্বোধন করা হয়।



বৃন্দাবন

উপেন শহরের একদিক থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি পাড়ার চেনা লোকের নাম এক-নাগাড়ে ভেবে গেল। অফিসে একসঙ্গে কাজ করা মানুষজনের নামও যতটা সম্ভব মনে করল। কোথাও কোন রকমে কেউ বাদ পড়লে বিয়ের পরে কথা শুনতে হবে। রাস্তায় দেখা হলে পরে বলবে, 'চুপে চাপে বিয়েটা সারলেন, তাই না? ঠিক আছে...'

নয়তো দূর থেকেই বিয়েতে বলা হয়নি এমন কারুকে দেখে মিথ্যের ডালি সাজাতে হবে — উপযাচক হয়ে জিগ্যেস করতে হবে, 'বিয়েতে তো এলেন না।' ভদ্রলোক হয়তো অভিমান ভরে বলবেন 'আমন্ত্রণে যুদ্ধেও যাবে, বিনা নিমন্ত্রণে ভোজনেও না যাবে।'

তখন উপেন বলবে, 'কেন চিঠি পাননি? এই ছেলেগুলো বড় ইরেসপন্সিব্‌ল বুঝলেন, শুধু আপনাকে না, অনেককেই ওরা চিঠি দিয়েছি বলেও চিঠি দেয়নি। অথচ দেখুন আমি নিজের হাতে প্রত্যেকের নাম ঠিকানা লিখে দিয়েছি।'

এত ঝঞ্ঝাটে পড়ার চাইতে এখন বরং স্থির মস্তিষ্কে নামগুলো মনে করা ভাল, অন্তত যদ্দূর সম্ভব। সামনে টেবিলের ওপর একগাদা ছাপা নিমন্ত্রণের চিঠি, সঙ্গে একগাদা খাম, অনেকগুলোতে ঠিকানা লেখা, একটু দূরের বন্ধুবান্ধবের জন্য, কয়েকটায় বুকপোস্ট লিখে ডাকটিকিট লাগানো হয়ে গেছে। চিঠিগুলোর ওপরে কলম চালিয়ে উপেন ভাবছে আর কাকে নিমন্ত্রণ করা বাকি থাকল। এমন সময় ভেতরের দরজার পর্দা সরিয়ে দোরগোড়ায় নিজরা* এসে দাঁড়াল। ডাক দিল, মামা।

উপেন মারোয়াড়ি পাড়াটার কথা ভাবছিল। 'বাবুজি বাবুজি' বলে মুখ চেনা অনেকের সাথেই আছে, এমন কি দোকানে ঢুকলেই দারচিনি এলাচের বাটি এগিয়ে দেওয়ার মত পরিচয়ও অনেকের সঙ্গেই; কিন্তু মুশকিল হল পুরো নাম কারোরই

---

* অসমীয়া 'নিজরা' শব্দের বাংলা অর্থ ঝর্না

জানা নেই। একজনকে যদি মুরারীলাল বলে জানে তো উপাধি জানে না, আবার একজনকে আসকারন বলে জানে কিন্তু তিনি কি লাল সেটা জানে না।

নিজরা আবার ডাকল, এবার একটু জোরে, 'মামা।'

উপেন শুনতে পেল, জিগ্যেস করল, 'কি হল, ও নিজরা?'

'ই-স একবার ডাকলে শোনেই না' কথাগুলো বলে নিজরা টেবিলের দিকে এগোল।

উপেন বলল, 'আমি কিছু একটা ভাবছিলাম রে। কি হল, ডাকছিলিস কেন?'

টেবিলে ঠিকানা লেখা চিঠি কটা এমনিই উল্টেপাল্টে দেখে নিজরা জিজ্ঞেস করল, 'সেই তাকে চিঠি দিয়েছ?'

'কোন্ তাকে?'

'সেই যে একদিন বিকেলে আমাদের বাড়িতে এসেছিল।' নিজরা মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল।

উপেন বলল, 'আমাদের বাড়িতে বিকেলে বিকেলে অনেক লোকই তো আসে; কি করে জানব তুই কার কথা বলছিস।'

'আরে না না, সেই যে সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়েও এসেছিল, চা খেতে গিয়ে যে সাদা কাপটার হাতলটা ভাঙল, তোমার সমানই লম্বা-কালো চশমা পরা লোকটা—'

উপেন একটু মনে করার চেষ্টা করল তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'ও, চন্দ্র রাজখোয়া, না হক বড় ভাল মনে করেছিস তো, আমি এক্কেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।'

উপেন সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারে সোজা হয়ে বসে কলমটা তুলে নিল। খামে ঠিকানা লিখতে লাগল।

'ইস্ — সব ভুলে যায়,' বলে টেবিলের ওপর থুতনি রেখে নিজরা গাদা করা চিঠির ভেতর থেকে একটা খাম তুলে নিল। একটু নেড়েচেড়ে দেখল, তারপর রেখে দিল। পরের বার একটা চিঠি নিয়ে ভাঁজ খুলে অঙ্কের বিদগ্ধ পণ্ডিতের সহজ ধারাপাতের পাতা ওল্টানোর মত অত্যন্ত উদাসীন দৃষ্টিতে চিঠির ছাপা অক্ষরগুলোর ওপর চোখ বোলাল। তারপর জিগ্যেস করল, 'এতে আপনার নাম আছে না মামা?'

উপেনচন্দ্র রাজখোয়ার নামটা লিখে নিচে ইংরেজিতে লোকাল শব্দটা লিখছিল। মুখ নামিয়ে জিগ্যেস করল, 'কোথায় রে?'

নিজরা চিঠিটা তুলে ধরে দেখাল, 'এখানে।'

উপেন মুখ তুলে জানাল, 'হুঁ।'

পরমুহূর্তেই টেবিলের কিনারে নিজরা কনুইয়ে ভর দিয়ে আর একটু ঝুঁকে উঁচু হওয়ার চেষ্টা করে প্রশ্ন করল, 'আর কার নাম আছে মামা?' আগ্রহে ওর চোখ চকচক করছিল।

উপেন বুঝল 'তোর নামও আছে' বললে নিজরা খুশি হবে। সেই আশাতেই কথাটা জিগ্যেস করেছে। কিন্তু এ কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কি কাণ্ড ঘটবে সেটাও উপেন জানে। সঙ্গে সঙ্গে ও দৌড়ে বেরিয়ে যাবে, চিৎকার করে ব্যাপারটা দিদিমাকে, বৃন্দাবন বুড়োকে জানাবে, বিয়ের জন্য যে দু-একজন আত্মীয় কুটুম্ব জমা হয়েছে তাদের সবাইকে জানাবে, তারপর বাড়ির গলিতে বেরিয়ে সঙ্গী সাথীদের জুটিয়ে ঘোষণা করবে — 'বুঝেছিস, মামা বিয়ের কার্ডে আমার নামটাও লিখে দিয়েছে।' এ পর্যন্ত ঘটনা যেনতেন। কিন্তু ওর ফুর্তি সইতে না পেরে যদি কোন হিংসুটে মেয়ে ব্যাপারটার আদ্যোপান্ত জেনে নিয়ে বলে 'আমার বড়দিদি বলেছে চিঠিটায় নাকি তোমার নাম নেই' তাহলে কিছুক্ষণের জন্য মেয়েটার দিদি বড় না নিজরার মামা বড় এই নিয়ে একটা বিশাল তর্ক হবে। শেষ পর্যন্ত যদি প্রমাণ হয় যে নিজরার মামা ফাঁকি দিয়েছে, তাহলে নিজরার দিদিমা, বৃন্দাবন বুড়ো পায়ে ধরেও ওকে ভাত খাওয়াতে পারবে না। কেউ যদি ভালবেসে হাত বাড়ায় তো এক ঝটকায় হাত সরিয়ে দেবে, কাঁদবে না কিন্তু মুখখানা দেখলে মনে হবে, বৃষ্টি আসবে না, কিন্তু আকাশে মেঘের এমন ঘনঘটা যে কখন কি হয় কেউ বলতে পারে না — যেন এই ঘরদোর উড়িয়ে নেয় আর কি —।

বিস্তর ঝামেলা। এই মেয়েটাকে নিয়ে উপেনের যা ঝামেলা, মাসের শেষে সরকারি মালখানার টাকা পয়সার হিসাব পাই পাই করে মেলাতেও অতটা নয়। এই মেয়ের ব্যাপারে সামান্য অসাবধান হওয়ার যা হ্যাপা, হাজার হাজার সরকারি টাকা সিন্দুকে রেখে চাবিটা পকেটে ফেলে পিকনিক করতে গিয়ে কয়েকটা ঘন্টা অসাবধানে কাটিয়ে আসাতেও অত ল্যাঠা নেই।

অগত্যা উপেন প্রথমে মাথাটা এপাশ ওপাশ নাড়াল, পরে জানাল, 'না রে, আর কারো নাম ওতে নেই।' ও ভেবেছিল কথাটা শুনে নিজরা নিরাশ হবে, চোখ দুটো ঘোলা করে ওর দিকে তাকাবে, কিন্তু কিছুই হল না। এত সহজে ওকে বুঝতে পারলে কথাই ছিল না। ও নির্বিকার চিত্তে চিঠিটা আবার ভাঁজ করল, যেখান থেকে নিয়েছিল সেখানেই রেখে দিয়ে ডাকটিকিট লাগানো একটা চিঠি তুলে নিয়ে কেবল জিজ্ঞাসা করল, 'দিদার নামটা কেন দিলে না?'

উপেনের হাসি পেল। ওর কথার উত্তর না দিয়ে সে তাড়া দিয়ে বলল, 'রাখ রাখ, এলোমেলো করিস না, আমি সাজিয়ে রাখছি, ছেড়ে দে।'

'কোথায় এলোমেলো করলাম, আমি তো শুধু দেখছি।' উত্তর দেয় নিজরা।

'আমার লেখা হলে তখন দেখিস, এখন ভেতরে যা।'

'ইস কক্ষনো না, আমি তোমার কাছেই থাকব।'

'ও —। আমি তোর সঙ্গে কথা বললে হবে নাকি? দেখছিস না, কত চিঠি লেখা বাকি?' উপেন টেবিলের চিঠিগুলো দেখাল।

নিজরা উত্তর দিল, 'কাকে চিঠি লিখতে হবে সে তো আমিই তোমাকে মনে করিয়ে দিলাম'।

'ঠিক আছে, মনে পড়লে আবার তখন আসিস। এখন দিদা কি করছে দেখগে যা — দিদার কাছে বসে থেকে নাম মনে পড়লে আমাকে এসে বলে যাবি।'

'ইস্ রাম —' মহাসমস্যায় পড়ে গেল নিজরা, এবার বিরক্ত হয়ে আসল কথাটা বলল, 'দিদাই তো তোমার কাছে থাকার জন্য আমায় পাঠিয়েছে।'

এটাই আসল কথা। উপেন অনুমান করতে চেষ্টা করল কি সুখে মা ওকে তার কাছে পাঠিয়েছে। সে ডাকল, 'শোন তো।' তাড়াতাড়ি নিজরা ওর কাছে গেল, খুব একটা গভীর এবং গোপন পরামর্শ নেওয়ার ভঙ্গিতে কানটা উপেনের মুখের কাছে নিয়ে এল। উপেন বলে, 'তুই দিদার কাছে যাবি, বুঝলি।'

'হুঁ', কিছু একটা রহস্যের সন্ধান পেয়ে মাথা দোলাল। বাকি কথা কটা শোনার জন্য কানটা আরো কাছে নিয়ে গেল। বৃন্দাবন বুড়ো শুয়ে থাকলে সুতো নিয়ে নাকে সুড়সুড়ি দেওয়া, দিদার চাদরের মাথায় দড়ি বেঁধে দড়ির আরেকটা মাথা চেয়ারে বেঁধে দেওয়া, এ ধরণের গোপন পরামর্শ উপেনের সঙ্গে প্রায়ই হয় নিজরার। উপেন চুপি চুপি বলল, 'গিয়ে বলবি মামা আমাকে আপনার কাছে থাকতে বলেছে আর আমি কোন গণ্ডগোল করব না বলে আপনাকে বলতে বলেছে।' পরমুহূর্তেই ওকে ঠেলে পাঠাল, 'যা যা দৌড় লাগা।'

একটু দূরে থেকে নিজরা ভ্রূ কুঁচকে ঠোঁটটা ছুঁচলো করে 'উঁ' বলে একটা দীর্ঘ সানুনাসিক আওয়াজ করে মামার দিকে তাকাল, তারপর পর্দা সরিয়ে ভেতরে চলে গেল। যেতে যেতে গজগজ করে বলে গেল, 'দিদা বলবে মামার কাছে যা, মামা বলবে দিদার কাছে যা, কি যে মুশকিল।'

ও গজগজ করলে গোটা ঘর শোনে। কথা বললে কয়েক ঘর মিলে শুনতে পায়। দিদিমা সুবর্ণলতা জিগ্যেস করলেন, 'কি আবার মুশকিল হল ও নিজরা?'

এই অবস্থায় প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর দেওয়াটা রাগ পড়ে যাওয়ার লক্ষণ। মাঝে মাঝে এটা ও পছন্দ করে না। সে দিদিমার কাছে থম ধরে বসে রইল।

সুবর্ণলতা নিজের পুরোনো দিনের বাক্সটা খুলে নিয়ে অন্য এটা সেটার মধ্যে থেকে শরাই ঢাকনি কটা বার করেছিলেন। অনেক দিন এই বাক্সটা খোলাই হয়নি। বহুকাল আগে রাখা জিনিসগুলো লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে আছে, কর্পূরের গন্ধটাও জিনিসগুলোর গায়ে লেগে আছে। সুবর্ণলতা অনেক দিন বাক্সটা খুলে জিনিসপত্রগুলি সাজিয়ে রাখার কথা ভেবেছেন, কিন্তু আলস্যের দরুনই কি না কে জানে, ভাবাই হয়েছে করা হয়নি। ছেলের বিয়ের ব্যাপারে টুকিটাকি জিনিসের কথা ভাবতে ভাবতে আজ হঠাৎ শরাই ঢাকনি কটার কথা তাঁর মনে পড়েছে। আটা, ময়দা, টিন, মোটর গাড়ি, ব্যাণ্ডপার্টি; ঢুলি এই সমস্ত বড় বড় জিনিসের সঙ্গে

সুবর্ণলতার কোন কারবার নেই; কিছু টুকিটাকি জিনিস যা সময়ে কারও মনেই থাকে না, কিন্তু সময়মত না পেলে হুটোপাটি লেগে যায় — তুই সাইকেলটা নিয়ে এদিকে যা, তুই অমুকের ঘরে গিয়ে দ্যাখ, তুই অমুকের ঘরে যা—সেই ধরনের জিনিস — ধরা যাক ধানের গোছা, শরাই ঢাকনি, একটা ছোট কাটারি, হাতে নিয়ে ঘোরা যায় এরকম চিরুনি, সলতে পাকানোর জন্য সুতো একমুঠো — এ সব নিয়েই তাঁর চিন্তা। উপেন হয়তো সারাদিন টো টো করে ঘুরে পি ডব্লু ডি অফিস থেকে চারটে ত্রিপল আর নাটমন্দিরের পঞ্চাশটা চেয়ার বিয়ের পরের দিনই ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে যোগাড় করে ফিরেছে, ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণলতা জিগ্যেস করবেন, 'চন্দ্র গোঁসাইর ঘরে পরাতটার খোঁজ করেছিলি?'

করেনি ! রাগ ব্রহ্মতালুতে গিয়ে ঠেকল। উপেনেরও, মায়েরও। উপেনের কথা, এত জিনিসের চিন্তায় আমার মাথা ঘুরছে — তার ওপর কোথাকার পরাত, কোথাকার কি —। মা'র কথা, শুধু ঘুরে বেড়াতেই দেখছি কাজের কাজ একটাও হচ্ছে না, আজ পর্যন্ত পরাতটা ঘরে এল না।

অতএব শরাই ঢাকনি কটা বার করার জন্য সুবর্ণলতা বাক্সটা খুললেন। সঙ্গে সঙ্গে খুচখাচ জিনিস আরও কটা বেরতে পারে। কিন্তু বাক্সের ঢাকনাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুকটা একটা মোচড় খেল। মেয়ে মনোরমার বিয়ের পর বাক্সটা যেমন ভাবে রেখেছিলেন সেভাবেই আছে। এটা সেটা সরিয়ে শরাই ঢাকনি বার করতে গিয়ে হৃদয়ে জমে থাকা অনেক কথার স্তূপ সরিয়ে আগের বিয়ের ঘটনাগুলি বেরিয়ে এল। এমন সময় নিজরা গন গন করে উঠল, 'ইস কি যে ঝামেলা।'

সে উত্তর না দেওয়ায় সুবর্ণলতা একবার তার মুখের দিকে তাকালেন, কিন্তু মুখের চেহারা দেখে কিছু জিগ্যেস করতে সাহস পেলেন না। কি ঠিক, জিগ্যেস করতে গিয়ে ধমকও খেতে হতে পারে।

একটা একটা করে নানা রঙের কয়েকটা ঢাকনি বার করার পর যখন চারপাশে ঝুলে থাকা পুঁতিগুলো ঝিলমিল করে উঠল, তখন নিজরা কাছে এসে কাপড়গুলো নাড়াচাড়া করে দেখতে লাগল। তারপর হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'জানো দিদা, বিয়েতে কাকে নেমন্তন্ন করতে হবে মামা ভুলে গেছিল, আমি মনে করিয়ে দিলাম।'

'ভাল করেছিস মামনি। ঘরের মধ্যে এখন তোর মাথাটাই ঠিক আছে। বাকি সবাই পাগল হয়ে গেছে।'

চারপাশে পুঁতি লাগানো ঢাকনা একটা নিয়ে মুখ ঢেকে নিজরা বারান্দায় চলে এল। দু-একবার এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে হঠাৎ তার মনে হল এভাবে থাকলে চলবে না; কাজ করা দরকার।

বিয়েটা কাছে এসে পড়েছে মানেই কাজকর্ম বেড়ে গেছে। সেই মত বাড়িতে লোকজনের জমায়েতও বেড়েছে। উপেনের বিধবা কাকিমা দিন কুড়ি আগেই এসেছেন। পিসির মেয়ে সুরমা দাদার বিয়ের ছুতো ধরে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এসেছে। আর এসে অবধি উপেনদের বাড়িতেই কাটাচ্ছে; মণ্ডপ, লোক খাওয়ানোর দায়িত্ব মামা মহীধর নিজের অভিজ্ঞ কাঁধেই তুলে নিয়েছেন। ফলত একা উপেন একটু সহায় পেয়েছে, বৃদ্ধা সুবর্ণলতা রান্নাঘরের সমস্ত দায়িত্ব সুরমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে একটু হাঁফ ছেড়েছেন। অন্তত যে কদিন ও আছে।

নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই নিজরার। যে যত কাজই করুক ও হাত না লাগালে কোন কিছুই ঠিক হয় না। সুরমা ভাত ঠিকই রাঁধবে, তরকারি, ভাজা সবই খেতে ভালই হবে, কিন্তু দিদা যে বেগুন ভাজা খায় না, মামাকে যে কাঁসার ফুলকাটা থালাটায় ভাত দিতে হবে, এসব ব্যাপার সে না শিখিয়ে দিলে হবে না। আশপাশের কয়েক ঘর তাম্বুল পান* দিয়ে নেমন্তন্ন করে আসি বলে দিদিমা বেরোবেন, তাম্বুল পানের ঝুড়িটা বৃন্দাবন সঙ্গে নিয়ে যাবে, কিন্তু বাটাটা? আর কে নেবে — ডাক নিজরাকে।

'আমি সঙ্গে না গেলে দিদা যে কোথাও নড়তেই পারে না' বলে নিজরা যখন ভিতর থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, তার আগেই তার ফ্রক পরা হয়ে যায়, কেবল চিরুনিখানা নিয়ে সুরমার সামনে দাঁড়াতে যা বাকি।

মোটের ওপর নিজরা চোখ না দিলে এই বাড়িটা বাড়ি থাকত কিনা সন্দেহ। মাথা থেকে শরাই ঢাকনিটা সরিয়ে ও পাশের চেয়ারটায় রাখল এবং বারান্দা থেকে নেমে গেল।

বৃন্দাবন বুড়ো পিছন দিকে যেখানে বরকে চান করানোর বেদী করা হবে সেই জায়গাটা ঠিক করছিল। বেশির ভাগ কাজটাই দিন-হাজিরায় লাগানো লোকেরাই করে গেছে, এখানে ওখানে উঁচু নিচু অসমান মাটিটাটি ঠিক করার আছে, বৃন্দাবন তাই করছিল। নিজরা সেখানে গিয়ে হাজির হল। কিছুক্ষণ বৃন্দাবনের কোদাল চালানোর দিকে চেয়ে থেকে ও বলল, 'ও দাদু, আমার তুলসীর চারাটা তুমি কাটবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি।'

পিছন দিকটায় একলা একলা কাজ করতে বৃন্দাবনের একঘেয়ে মনে হচ্ছিল। মাঝে সুরমা তরকারির খোসা ফেলতে এসে একবার জিগ্যেস করেছিল, 'দাদু, চা খাবে নাকি একটু?' এছাড়া বহুক্ষণ সে কারো গলা শুনতে পায়নি। এখন নিজরার গলা পেয়ে সে এমন ভাবে মাথা তুলে চাইল যেন মনে মনে ওরই প্রতীক্ষায় ছিল। জিভের আড় ভাঙতে হলে বৃন্দাবনের কাছে নিজরার চেয়ে উপযুক্ত আর কেউ

* অসমীয়া সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান আচার, বিনা তাম্বুল-পানে অতিথি আপ্যায়ন কিংবা নিমন্ত্রণ কোনটাই গ্রাহ্য নয়।

নেই। সামান্য সময় হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বৃন্দাবন বলে উঠল, 'কেন কাটব না শুনি? কোদালের সামনে যা পড়বে একদিক থেকে সব চেঁছে তুলে নেব। ইস্, বড় এলেন রে কোথাকার মহারানী হুকুম দিতে ! এক্ষুনি সব কেটে ফেলব।' শেষের কথাগুলো সে এমনভাবে বলল যেন গোটা পৃথিবীটাকেই চেঁছে সমান করার উদ্দেশ্যে সে আজ কোদাল হাতে নিয়েছে। নিজরা কেন তেত্রিশকোটি দেবতা এলেও তাকে আজ থামাতে পারবে না। সামনের জায়গাটায় এমন খরখর করে কোদাল চালাতে শুরু করল যেন যত তাড়াতাড়ি পারে ঐ তুলসী চারাটার কাছে পৌঁছনোই তার একমাত্র লক্ষ্য।

'ইস, আমার চারাটা!' নিজরা লাফিয়ে উঠল।

'ই-স, ওনার চারা!' বৃন্দাবন নাক কোঁচকাল, নিচের ঠোঁটটা উল্টে বলিরেখাঙ্কিত মুখখানা গরুতে খুবলে নেওয়া পাকা কাঁঠালের মত বিকৃত হয়ে গেল।

'হেঁঃ উনি তুলসীর চারাটাকে একেবারে মাটির নিচে থেকে তুলে এনেছেন।'

কেউ কম যায় না। হাঁটু অবধি ফ্রক পরা নিজরা আর হাঁটুর ওপরে কাপড় পরা বৃন্দাবন দুজনেই সমান। কিন্তু এবার নিজরা একটু মুশকিলে পড়ে গেল। তুলসীর চারাটা যে মাটির নিচে থেকেই বেরিয়েছে এটা সেও দেখেছে, আর সে যে মাটির নিচে থেকে গাছটাকে নিয়ে আসেনি এটাও সে ভাল করেই জানে। সুতরাং কি বলবে ভেবে না পেয়ে বৃন্দাবনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। অবশেষে তার আত্মসম্মানে ঘা লাগল এবং রাগ চড়ে গেল।

'কি ঝগড়া করে বাবা এটা। ভারি একেবারে কাজ দেখাচ্ছে।' মুখ ঝামটাল সে।

'দেখাবই তো' বৃন্দাবন মুখে মুখে জবাব দিল, 'তোমার মত নাকি? কাজ করলে কাজ দেখাবই।'

'ইস আমি কাজ করিনি?'

'কোন্ কাজটা করেছ শুনি, কোন কাজটা ?' পারলে বুড়ো যেন তেড়ে আসে।

নিজরা বৃন্দাবনকে জব্দ করার জন্য মুখ বাড়িয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠল, 'কাল যে তোমরা — ওখানটায় ঐ সামনে গর্ত করছিলে তখন আমি কাজ করিনি?'

করেছিল, মহীধর আর বৃন্দাবন যখন প্যান্ডেলের খুঁটি পোঁতার ব্যবস্থা করছিল, খুঁটিগুলো একলাইনে রাখার জন্য একটা দড়ি ধরে চিহ্ন দেওয়ার প্রয়োজনে নিজরা কাছে থাকাতে মহীধর ওকে দড়িটার মাথাটা একটু সময় ধরে থাকতে দিয়েছিল। অতএব নিজরা অবশ্যই কাজ করেছিল। কিন্তু এখন ও কথাটা শেষ করা মাত্র বৃন্দাবন মুখিয়ে উঠল, একটা তাচ্ছিলের সুর ফুটিয়ে বলল, 'উঁ—বড় কাজ করেছ।'

নিজরা তক্ষুনি গোঁ গোঁ করে চলে এল, বৃন্দাবনটা এমনিই বদমাশ, আর আজ

এত বেশি বদমায়েশি করছে যে ওর কাছে থাকাই ঠিক নয়। যেতে যেতে সে বলে গেল, 'দাঁড়াও, মামী এলে ঠিক বলে দেব।'

ওর যাওয়ার দিকে কিছু সময় চেয়ে থেকে বৃন্দাবন বুড়ো একা একাই হো হো করে হেসে উঠল, অদ্ভুত তৃপ্তির হাসি। তৃপ্তি যেন তার হাসিতেই নয়, কপাল বেয়ে নেমে আসা ঘামের বিন্দুতেও ঝরে পড়তে লাগল। এরকম একটা খুনসুটির পর তার গায়ে সে এমন একটা শক্তি পায় যে গোটা দিন না খেয়ে-দেয়েও সে সমানে কোদাল চালিয়ে যেতে পারে।

নিজরা কলঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি পায়ে জল ঢালল। পিছন থেকে এসে আগে পা ধুয়ে তবে ঘরে ঢুকতে হয়। ভেজা পায়েই থপথপিয়ে রান্নাঘরে গেল। উনুনের ওপর তরকারি টগবগ করছে। সুরমা ওর আসা টের পায়নি, গলা শুনে ফিরে তাকাল, 'আমি তরকারি কুটে দিই পিসি'?

'ই এখন এসেছে। আমার তরকারি কোটা কখন শেষ', সুরমা হাসল।

'ভাজা করবে না?' পুরোপুরি আশা ছেড়ে নিজরা জিগ্যেস করে।

'ভাজা, তরকারি, ডাল সবই হয়ে গেছে, তুমি বরং সন্ধ্যাবেলায় কুটে দিও, আমি ডেকে আনব'খন তোমাকে।'

'আজ ভাত তরকারি খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, তাই না?' বিরস কণ্ঠে কথা কটা বলে নিজরা সরে গেল।

আজ তার কোথাও হাত লাগাতে হয়নি, অথচ বাড়িটার কাজকর্ম সব ঠিকঠাকই চলছে—অবশ্য বৃন্দাবনের কথা বাদ। কেবল উঠোনে মাটির গ্লাসগুলো এভাবে পড়ে থাকাটা ঠিক হয়নি। এত গ্লাস দিয়ে কি হবে জিগ্যেস করাতে মামা উত্তর দিয়েছিল, বিয়েতে অনেক লোক আসবে তাই এত গ্লাস। রিক্‌শা থেকে নামিয়ে পিছনের চাতালে আনতেই কয়েকটা ভেঙেছে। বাকি সব গাদা হয়ে পড়ে আছে। মামা বলেছে একেবারে ধুয়ে-পাখলে গ্লাসগুলো তুলে রাখতে হবে। নিজরা ভাবল ধোওয়ার আগে এভাবে গাদা হয়ে পড়ে থাকার চাইতে উঠোনে সারি দিয়ে রাখলে কি এমন খারাপ হবে। গায়ে গায়ে লাগিয়ে সে গ্লাসগুলোকে সার বেঁধে রাখতে শুরু করল। সুরমা একবার বাধা দেওয়াতে বলল, 'থামো তো, কি সুন্দর লাগছে।'

সুবর্ণলতা অনেক দিন ধরে পড়ে থাকা সরার ঢাকনিগুলি রোদে দেবেন বলে এসে দেখেন উঠোনে গেলাসের মেলা লেগেছে। তিনি সুরমাকে আস্তে করে জিগ্যেস করলেন, 'ওকে আবার এ কাজে কে লাগাল?

'নিজেই, আমি না করলাম, শোনেই না তো কি করব?'

দূর থেকেই সুবর্ণলতা ডাক দিলেন, 'দেখি নিজরা এদিকে একটু আয় তো মা।'

নিজরা মাথাই তুলল না।

'শুনেছিস?' সুবর্ণলতা আবার ডাকলেন।

'একটু পরে যাচ্ছি, দাঁড়াও।'

'দাঁড়াতে পারব না, তাড়াতাড়ি আয়।'

'উফ্ ভগবান, একটা কাজ করতে দেয় না। খালি চেঁচাবে আর চেঁচাবে।' বলে মহা বিরক্তিতে নিজরা উঠে গেল। শুধু আজকের ব্যাপার নয়, ও জরুরি একটা কাজে হাত দিলেই দিদা ডাক দেবেই, একদম ধরাবাঁধা ব্যাপার।

'জামায় এসব কি লাগিয়েছিস্?' সুবর্ণলতা ওর ফ্রকের পিছনটা দেখান। উঠোনে বসে গ্লাস সাজাতে গিয়ে এক চাপটা ধুলো লেগেছে। বাঁ হাতে নিজরা ধুলো ঝেড়ে নিল।

'জামা কাপড় নষ্ট করিস কেন?'

সুবর্ণলতা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ও জবাব দিল, 'কাজ করলে নোংরা হবে না?'

'তুই যে এসব কাজে লেগে গেছিস, বর-কনেকে চান করাবি না?'

সর্বনাশ! নিজরা জিভ কাটল। আসল কাজটাই ভুলে গেছে। 'এ রাম!' বলে যে রকম বিরক্তি প্রকাশ করে ও বর-কনের কাছে দৌড়ল তাতে বোঝা গেল কাজের চাপে ও কিছু সামাল দিতে পারছে না। চারদিকে সমান ভাবে চোখ দিতে গিয়ে যদি কোন কাজ বাদ পড়ে যায়, সেটা মোটেই তার দোষ নয়। একজন মহিলা কত দিক সামলাবে।

মোটা কাগজের বাক্সে একটা দুটো নয় প্রায় গোটা পনেরো বর আর ষোল সতেরো জন কনে যে যার ইচ্ছেমত শুয়ে আছে। কোন বরের পা কোন কনের নাকের ওপর উঠে আছে। এতে কারও আপত্তি নেই। কেবল যে জোড়ার কাল বিয়ে হয়ে গেছে, তারা বাক্সের কিনারে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের একমাত্র ভাগ্য-নিয়ন্তা নিজরা যেভাবে থাকতে বলে গেছে, সেভাবেই আছে, একটি হাতও কেউ কারও দিকে বাড়িয়ে দেয়নি। এই একঝাঁক বর-কনের মধ্যে কার কোন্ দিন বিয়ে হবে সেটা নিজরাই ঠিক করে। মাঝে মধ্যে সে শুধু দিদার পরামর্শ নেয়। কালকে যাদের বিয়ে হয়ে গেছে, কদিন ধরে তারা শুধু লোকের বিয়ে দেখে যাবে, কখনও-সখনও অবশ্য বিয়ের দৌলতে ভালমন্দ খেতে পায়। দশ পনেরো দিন না গেলে এদের আরেকবার বিয়ে হয় না। শুধু নিজরা ঠিকঠাক চিহ্ন দিতে ভুলে গেলে অবশ্য তাদের চার-পাঁচ দিনের মধ্যে আরেকবার বিয়ে হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ধরা পড়ে গেলে মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাবে। অনেক শয়তান বরের বিয়ে হয় হয় অবস্থায় ভেঙে গেছে। নিজরা হয়তো বরটিকে বাক্সের কিনারে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছে, কিন্তু সে তা না থেকে বারে বারে কেবল শুয়ে পড়তে চায়। 'কথা বললে শোনে না?' বলে নিজরা তার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে যদি তাকে ধাক্কা দিয়ে

শুইয়ে দিল তো তার আর বিয়ে হল না। কত সাধনার ফলে কপালে এসে বসা প্রজাপতি ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল, আবার কবে এসে বসে ঠিক নেই।

এই গুচ্ছের বর-কনের ঝামেলাটা সুবর্ণলতাই নিজরার ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। নিজরা যখন টেবিলের সামনে বসে মামার অর্ধসমাপ্ত চিঠিগুলি সমাপ্ত করার চেষ্টা করে, অথবা সুবর্ণলতার তাঁতশালে* বসে মাকু চালানোর চেষ্টা করে নচেৎ, গরমের দিনে বাইরে শোবে বলে বৃন্দাবনের পেতে রাখা তক্তপোশে গজাল ঠুকতে যায়, তখনই সুবর্ণলতা হাঁক পাড়েন, 'দ্যাখতো এটা কি?'

নিজরা কাছে এলে ছেঁড়া চাদরের কাপড় দিয়ে তাকে একটা পুতুল বানিয়ে দেখান। পুতুলই একমাত্র তাকে খানিক আটকে রাখতে পারে। শেষে একদিন উপেন একটা থলে নিয়ে বেরোয় এবং একগাদা রংবেরঙের কাটা কাপড়ের টুকরো ভর্তি করে বাড়ি ফেরে। দুপুরবেলায় বসে বসে প্রথম কিছুদিন সুবর্ণলতাই বর-কনে সাজিয়ে দিতেন। পরে নিজরা নিজেই পারতো, কেবল কাপড় পরানোর সময় সে খুব মুশকিলে পড়ে যায়। ওর ভারি পছন্দের হলদে সিল্কের কাপড় আছে মাত্র এক টুকরো। সেটা দিয়ে যে কোন্ কনের চাদর হবে এই নিয়ে দিদিমার সঙ্গে তার অনেক কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। শেষমেশ অবশ্য ঠিক হয়েছে যার যেদিন বিয়ে থাকবে, সেই চাদরটা সেদিন সে পরবে। বিয়ে হয়ে গেলেই খুলে রাখতে হবে। এরকম আরও কয়েকটা চাদরের কথা সে মামাকে বলেছে, কিন্তু উপেন নাকি দোকানে অনেকবার খোঁজ করে জেনেছে ঐ কাপড়ের পার্শেলটা মারোয়াড়ির গুদামে এখনও এসে পৌঁছয়নি। দুই একদিনের মধ্যে এলেও আসতে পারে, কিছু ঠিক নেই।

কিন্তু একটা কথা ঠিক, বর-কনেতে নিজরার মন পড়েছে। এইজন্য তার কাজের বহর বেশি দেখলেই সুবর্ণলতা তাকে বর-কনেকে চান করানোর কথা বলেন।

কপালে এককোঁটা জল দিয়ে নিজরা তার বর-কনেকে চান করায়। তারপর কাপড় পরায়। মধ্যে মধ্যে কখনও চুপিসারে রান্নাঘরের দিকে এগুতে থাকা বেড়ালটাকে ধমক দিয়ে ওঠে, 'অ্যাই চুন্নী, কোথায় যাস? দাঁড়া, গেলি শিগগির।' বেড়াল হয়তো অন্যদিকে সরে পড়ে, কিন্তু এদিকে হয়তো হেলান দিয়ে দাঁড় করানো বরমশায় কাত হয়ে যান। তাড়াতাড়ি নিজরা বলে ওঠে, 'ও বাব্বা রাগ হয়েছে? তোমার জন্য রাখা দুধটা বেড়ালটা খেতে এসেছিল, আমি ওকেই বকেছি। তোমাকে কিছু বলিনি তো।'

সাজপোশাক পরানো-টরানো হয়ে গেলে যখন শুভলগ্ন উপস্থিত, তখন সুবর্ণলতার পালা। সুবর্ণলতাকে বিয়ের বাসরে গাইতে হবে।

---

* তাঁত অসমীয়া গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে পড়ে। এমন অসমীয়া মহিলা খুব কম পাওয়া যাবে যিনি তাঁত চালানো জানেন না। হাল আমলের কথা আলাদা।

সুবর্ণলতা একসময় বিয়ের গান গাইতেন, এখন সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ পরে এক কলি মনে পড়ে, কিন্তু যখন যেটা গাইতে হয় সেটা মনে পড়ে না। কনে হোমস্থলীতে বসার সময় হয়তো জল ভরার এককলি গেয়ে দেন। দু'লাইন বিয়ের নামগান ফিরিয়ে ফিরিয়ে গাওয়ার পর প্রায়ই সুবর্ণলতার গলার স্বর ধীরে ধীরে বুজে গিয়ে আর শুনতে পাওয়া যায় না। অনেক দূরের কোন একটা কিছুতে চোখের দৃষ্টি যেন তাঁর স্থির হয়ে যায়, চোখের পলক ফেলতেও ভুলে যান তিনি, ঠোঁটের গুনগুন যেন সেই বিয়ে নামের জনক রাজার মেয়েটির মতই পাতালে আশ্রয় নেয়।

নিজরা চেঁচিয়ে ওঠে, 'কি হল দিদা? গাও না। চুপ করে আছো কেন?'

কেন? কেন যে সুবর্ণলতা মাঝে মাঝে এমন মূক হয়ে যান সেকথা এই বাচ্ছা মেয়েটাকে কি করেই বা বোঝাবেন। কখনও বুকটার ভেতর এমন একটা খিঁচ ধরে, তখন মনে হয় নিজরাকে কাছে টেনে নিয়ে তিনি বুঝি একধার থেকে সমস্ত জমানো কথা উজাড় করে দেবেন। ও বুঝুক চাই না বুঝুক, বলা হয়ে গেলে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে নিঃশেষে কাঁদবেন। কি জানি, হয়তো তেমন ভাবে কাঁদতে পারলে বুকের মধ্যে পাষাণ হয়ে থাকা জমাট ভার খানিকটা লাঘব হত।

এই ঘরটাতে, এই উঠোনে, মনোরমার বিয়েতে এই শহরের সবচাইতে দক্ষ বিয়ের গানের যুবতীরা এমন গানের ঢেউ তুলেছিল যে শেষ রাতে বৃদ্ধারা পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'ওদের কি মুখ ব্যথা করে না?' বরযাত্রীরা অভিভূতের মত ওদের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। উপস্থিত এক সঙ্গীতশিল্পী ঐ মেয়েদের সঙ্গে সমানে কথাবার্তা চলাচ্ছিলেন এবং মাঝে মাঝেই নোটবুকে কি সব টুকে নিচ্ছিলেন। বর এসে মঞ্চের পিঁড়িতে বসল যখন তখন তার চুল এবং মুখ ঢেকে রাখা রুমালখানার পর্যন্ত বর্ণনা করে ওরা এমন জোড়ানামের ভনিতা করল যে মিলিটারিতে কর্মরত প্রসন্নও লজ্জায় ঘেমে নেয়ে গেছিল।

সেই শেষ। তারপর আর সুবর্ণলতা বিয়ের গান শোনেননি। শোনার ইচ্ছেও করেনি। তবুও হঠাৎই কখনও শেষ রাতে অনেক দূরে ডেকে যাওয়া বসন্তমঞ্জরীর ডাকের মত তীব্র, মর্মস্পর্শী আর করুণ অনুভূতি নিয়ে পাঁচ বছর আগের সেই বিয়ের গানের সুর তাঁর কানে বাজতে থাকে।

জোড়ানামের সময় মেয়েরা মনোরমার পাশে বসে থাকা প্রসন্নকে একটা সুন্দর সিঁদুরের কৌটোর পাশে মরচে ধরা টিনের সুটকেসের সঙ্গে তুলনা করেছিল। তা সে ছিল বিয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাওয়া কয়েকটা পাগল মেয়ের বর্ণনা মাত্র। পরে ওদেরই মধ্যে কেউ বলেছিল প্রসন্নর অর্ধেক সৌন্দর্যও যে পুরুষের আছে, তেমন পুরুষকে সে পরদিনই বিয়ে করতে রাজি।

আর মনোরমার চেহারা? মনোরমাকে নিয়ে সুবর্ণলতার কোনদিনই চিন্তা ছিল

না। লোকে বলতো মেয়ে হয়ে যদি জন্মাতেই হয় তবে মনোরমার মত হয়েই জন্মানো দরকার। অতএব তিনি প্রসন্নর সঙ্গে মনোরমার বিয়ে দিয়ে সুখী হয়েছিলেন, এর চেয়ে বেশি সুখী হওয়া কোন মা'র পক্ষে সম্ভব নয়। আর সবচেয়ে বেশি সুখী হয়েছিল মনোরমা নিজে। যেখানে প্রসন্ন চাকরি করত, সেখানে পৌঁছে মনোরমা মাকে দীর্ঘ চিঠি দিল, উপেনকে অবশ্য একটি ছোট চিঠিই দিয়েছিল। চিঠির ভাষা আর সুর থেকে সুবর্ণলতা বুঝলেন মেয়ে জন্ম দিয়ে বর্তানো দায়িত্ব সোনার সেতু বেয়ে তাঁর কাঁধ থেকে নেমে গেল।

বিয়ের পরে মনোরমার মনে হল প্রসন্নকে জীবনের পাত্র হিসাবে পাওয়ার জন্য অনেক দিন থেকেই আশা করেছিল সত্যি, কিন্তু প্রসন্নর ভেতর এমন আপন, এমন মায়াময়, এমন স্বপ্নময় মানুষ একজন তারই জন্য উন্মুক্ত হৃদয়ে, অসীম উৎকণ্ঠায়, উচ্ছল প্রেমপাত্র হাতে অপেক্ষা করেছিল, একথা সে ভাবতেই পারেনি। জীবন-যৌবনকে পরিপূর্ণ উপভোগের কথা সে নিশ্চয় ভেবেছে, কিন্তু একটা বিশেষ মুহূর্তের জন্য যে এত আনন্দ, এত শান্তি, এ পরিমাণ বিহ্বলতা জমা হয়েছিল, একটা সময় যে সাত সমুদ্রের সম্মিলিত গর্জনকে নস্যাৎ করে দেওয়া প্রেমের মৃদু গুঞ্জনধ্বনির তালে তালে সেও এমন নেচে উঠতে পারবে, এমন সে স্বপ্নেও ভাবেনি। সেই দিনগুলোতে সে ঘন ঘন মাকে লিখত, 'উপেনদার বিয়ে সামনের বছরই দিতে হবে মা। আমরা একমাস আগেই হাজির হব।'

উপেনের বিয়ের জন্য না হলেও মনোরমা বাড়ি এল। তখন সে ছ'মাসের অন্তঃসত্বা। আরও কিছুদিন পরে এলেও চলত, কিন্তু প্রসন্নকে সরকার কোন এক সীমান্তে পাঠিয়ে দিল। সীমান্তে নাকি কিছু লোকজন সরকারের ওপর সশস্ত্র হামলা চালাচ্ছে। প্রসন্নর মত কয়েকজন কুশলী যোদ্ধার সেখানে বড় প্রয়োজন।

প্রসন্ন সীমান্তে চলে যাওয়ার দিন মনোরমা অসম্ভব কেঁদেছিল। পরবর্তী সময়ে খবরের কাগজে সে শুধু সীমান্তের খবর খুঁজে বেড়াত।

নারীত্বই তিল তিল করে মনোরমাকে পূর্ণ করে তুলেছিল। জলের কল থেকে এক বালতি জল নিয়ে রান্নাঘরের দিকে মনোরমাকে ঢুকে যেতে দেখে প্রতিবেশী এক অভিজ্ঞা বৃদ্ধা ফিসফিস করে সুবর্ণলতাকে বলেছিল, 'ওকে আর এখন বেশি ভারি জিনিস নিয়ে ওঠানামা করতে দিও না।' কথা কটা সুবর্ণলতার কানে যেন মধু ঢেলেছিল।

এর পরে পরেই এই মেয়েটির জন্ম হয়েছিল। সীমান্ত থেকে প্রসন্ন লিখে পাঠিয়েছিল, 'ওর নাম রেখো নিজরা।' লিখেছিল জলা-জঙ্গল-কাঁটা পেরিয়ে দুর্গম পার্বত্য পথে চলতে চলতে ছোট একটা ঝর্ণার পাড়ে এসে দাঁড়াতে কেমন লাগে তা তোমরা কি বুঝবে।

এরপর কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল, কেউ কিছুই বুঝতে পারল না।

মনোরমাকে তন্নতন্ন করে খবর কাগজ খুঁজতে হল না, প্রথম পৃষ্ঠায় জ্বল জ্বল করে খবরটা ছাপা হল, এর কিছু পরে সরকারের তরফের লোকজন উপেন-মনোরমা-সুবর্ণলতার সঙ্গে দেখা করে গেল। বিদ্রোহীরা প্রসন্নকে দূর দূরান্তের অন্য এক সীমান্তে পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রসন্ন আর ফিরবে না।

পাগল হওয়ার কথা মনোরমার, কিন্তু পাগল হলেন সুবর্ণলতা, পাগল হল উপেন, বৃন্দাবন। তিন মাসের নিজরাকে কোলে তুলে নিয়ে মনোরমার আত্মাকে অভিশাপ দিতে দিতে সুবর্ণলতা বার বার চিৎকার করে জিগ্যেস করলেন, 'এই তোদের বুদ্ধি? এই তোদের মায়া মমতা? এই ফুলের মত শিশুটির, এই পেটের সন্তানের মুখের দিকেও একবার তাকালি না? পেটের সন্তানের মায়াও যদি তোকে বেঁধে রাখতে না পারে তবে মা হয়েছিলিস কি করতে ? এ সংসারে কোন্ মা এমন কোলের শিশুকে ফেলে রেখে........' সুবর্ণলতার আকাশ ফাটানো কান্নার ভেতর আর কিছু শোনা যায়নি।

কোন মা'রই পারার কথা নয়। কিন্তু মনোরমা কেমন করে যেন পেরে গেল। একরাতে পেরে গেল। কত রাতে কেউ বলতে পারে না। সে এক টুকরো কাগজে লিখে রেখে গেল, উপেন আর সুবর্ণলতার হাতে নিজরাকে সঁপে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ ভরসা করতে পারছে। এই মেয়েটির জীবনে তার উপস্থিতি অতি নিষ্ঠুরভাবে তার বাবার অনুপস্থিতিকেই প্রকট করবে। তা হবে মেয়েটির এক অপূরণীয় ক্ষতি। ওর ভালর জন্য উপেন-সুবর্ণলতা যা করবেন, মনোরমা বেঁচে থেকেও তার চাইতে এতটুকু বেশি করতে পারবে না। তার সমস্ত আশীর্বাদ উজাড় করে দিয়ে যাচ্ছে। এই পৃথিবীর বাইরে কোথাও যদি সে থাকে, তবে সেখান থেকেও তাকে যেন সে আশীর্বাদ করতে পারে।

কাগজের টুকরোটার শেষে মনোরমা মা ও দাদার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল। সুবর্ণলতার প্রাণশক্তি তখনই যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। কেঁদে-কেটে হাত-পা মুড়ে বসে থাকতে তিনি অবশ্য পারেননি, তিন মাসের নিজরার জন্য তাঁকেই মনোরমা হতে হয়েছিল। দিনে দিনে নিজরা বড় হয়েছে এবং ওর জন্যেই সুবর্ণলতাকে আবার হাসতেও হয়েছে।

মনোরমার চলে যাওয়ার পর কিছুদিন বৃন্দাবনের চোখের দিকে তাকানো যেত না। সে-ই কারো দিকে তাকাতে পারছিল না, না কি তার দিকেই কেউ তাকাতে পারছিল না বোঝা যায়নি, কিন্তু কেউ কারো দিকে তাকায়নি। এটাই ঘটনা। মনোরমার পরীক্ষার সময়ে এই বৃন্দাবনই কৌটো করে খাবার দিয়ে আসতো। এই বৃন্দাবনের সঙ্গে ঝগড়া-কাড়াকাড়ি, জাপটা-জাপটি করে মনোরমা বেড়ে উঠেছিল। মনোরমা তার চোখের সামনেই তিল তিল করে দেহের ঐশ্বর্য কুড়িয়েছে। ফ্রক ছেড়ে ব্লাউজ ধরেছে। পিছন খোলা ব্লাউজের হুক বহুদিনই বৃন্দাবন বুড়োই লাগিয়ে !'

কোন একদিন যে বৃন্দাবন মালী হয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছিল, এ কথাটা মনোরমাই তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। শেষে যখন বৃন্দাবন নিজরাকে কাড়াকাড়ি করে আবার মনোরমার সঙ্গে ঝগড়া লাগানোর ধান্দা করছিল তখনই তাকে মনোরমার পিছন পিছন কোদাল হাতে শ্মশানে যেতে হল।

অনেকগুলো দিন সুবর্ণলতা-উপেন-বৃন্দাবন কোন রকমে কাটিয়ে দিল। কিন্তু যেই মাত্র নিজরার মুখে বোল ফুটল, নিজরা কথা বুঝতে শিখল, তিনটি প্রাণীই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। মেয়ের চোখে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লে সুবর্ণলতার গলা দিয়ে এক ফোঁটা বিষ নেমে যাওয়ার মত অবস্থা হয়। তার গা-টা একটু গরম লাগা মাত্র উপেন তাড়াতাড়ি ডাক্তারের ঘরের দুয়ারে গিয়ে ধর্না দেয়। বৃন্দাবন যতক্ষণ জেগে থাকে ওর কাছ থেকে নড়ে না।

উপেন ওকে একগাদা ছবি আঁকা রঙচঙে বই এনে দিল, আর সুবর্ণলতা বসে বসে পুতুল বানিয়ে বর-কনেতে তার মনটাকে একটু অন্যদিকে ফেরালেন। না হলে সে একদিক থেকে এমন ঘরের কাজ শুরু করে দেয় যে বৃন্দাবন আর সুবর্ণলতার জন্য আর কোন কাজ পড়ে থাকার উপায় থাকে না।

আর এই বর-কনের বিয়ে দিতে-দিতে একদিন দিদিমা জানালেন, 'মামার যে বিয়ে সেটা তুই জানিস, না জানিস না?' নিজরা তখন ভেবে নিয়েছিল কদিন যাবৎ যে কটা বর-কনের বিয়ে হয়নি তাদের বিয়েগুলো ঝটাপট সেরে মাঝখানে মামার বিয়ের ব্যবস্থাটা সেরে ফেলবে। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন টের পেল যে মামার বিয়ের ব্যবস্থাটা একটু অন্য রকমের তখন একটু ভড়কে গেল। তারপর যে মুহূর্তে শুনতে পেল মামার বিয়ের পর পরই তাদের বাড়িতে একজন জলজ্যান্ত মামী আসবে, তার কয়েক ঘণ্টার ভেতরই পাড়া-পড়শী সবাই জেনে গেল যে উপেনের বিয়ে একটা এলেবেলে বিয়ে নয়। এই বিয়ের ফলে ওদের বাড়িতে একজন মহিলা আসবেন। সেই মহিলাটি উপেনের কি হবে ঠিক নেই, কিন্তু নিজরার যে মামী হবেন এটা ধ্রুব সত্য।

দেখতে দেখতে বাড়ির মধ্যে নিজরা একজন মামীর সৃষ্টি করে ফেলল। বেরোতে মামী, ঢুকতে মামী, ভাত খেতে মামী, শুতে গিয়ে মামী—মামী নাম কেবলম্। উপেন যদি রিক্শায় চড়ে কোথাও যাওয়ার সময় নিজরাকে না নেয় তো সে ডুকরে ওঠে না, কেবল ঘোষণা করে দেয়, 'মামী এলে বলে দেব দেখো।' জোর করে দুধ খাওয়ানো, চোখে সাবান ঢোকা সত্ত্বেও চানের থেকে রেহাই না দেওয়া ইত্যাদি নানা অপরাধের জন্য সুবর্ণলতাকেও মামীর আদালতে বিচারের অপেক্ষায় থাকতে হল। বৃন্দাবনের তো কথাই নেই। তার অত্যাচার এতটাই বেড়েছে যে নিজরা তাকে সাবধান করাই ছেড়ে দিয়েছে। তাকে সে বলে রেখেছে, কত ঠাট্টা করবে কর, মামী এলে দেখে নেব, ভেবেছ কি? মোটের উপর অবস্থাটা এমন

দাঁড়িয়েছে যে মামী আসার দু-এক দিনের মধ্যেই বৃন্দাবনের ফাঁসি হয়ে যাওয়ার কথা। উপেনের বেঁচে থাকাটা মামীর করুণা এবং তার কপালের ওপর নির্ভর করছে; সুবর্ণলতা অবশ্যই ঘরে থাকতে পারবেন, কিন্তু ক' সন্ধ্যা উপোস থাকতে হয় ঠিক নেই।

পরের দিকে উপেনের এমন মনে হতে লাগল যে পাশের ঘরটায় নিজরার মামীমা সত্যিই বুঝি বসে আছেন। একদিন শেষ বিকেলে বিয়ের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ পুলকিত হয়ে নিজরাকে একেবারে কাছে টেনে নিয়ে সে চাপা স্বরে জিগ্যেস করে, 'তোর মামীমাটি কেমন রে?'

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত করে রাখা প্রকাশকের মত, 'না বলব না, আর মামী এলে তোমাকে দেখাবও না' বলে ঝাঁকি মেরে চলে গেল নিজরা। চেঁচামেচির ভয়ে উপেনও চুপচাপ থাকল।

বিয়ের আয়োজন প্রায় শেষ, বিয়েও এসে পড়ল। কিছু টুকিটাকি জিনিসের ব্যাপারে অবশ্য সুবর্ণলতার মনে খুঁত থেকে গেল। এর জন্য অবশ্য উপেন গালিও খেল। অতিষ্ঠ হয়ে সে কিছু একটা বলতে চাইলে নিজরা হয়তো তখনই বলে ওঠে, 'ঠিক বলেছ, মামা কোন কাজই করে না, কেবল অফিসে যায় আর বাড়ি আসে।' এরপর আর তর্কাতর্কির কোন অবকাশ থাকে না।

এক সময়ের শহরের মেয়ে দূরে বিয়ে হয়েছে এমন অনেকেই এসে জমা হল। তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিজরার ব্যস্ততার অন্ত থাকল না। মায়েরা লুচি ভাজছে, ছেলেমেয়েরা আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে, একটা করে লুচি হাতে ধরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা উঠোনে দৌড় মারছে, দৌড়ঝাঁপের চোটে আধা খাওয়া লুচি হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে। তুলে নিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করতেই নিজরা নিষেধ করে ভেতর থেকে ভাল লুচি এনে দিচ্ছে; কাজের ফাঁকে সময় করে এসব কথা সুবর্ণলতাকে বলে বিস্ময় প্রকাশ করছে। গোটাকয়েক বাচ্ছা মেয়ে নিজরার বর-কনের বাক্সটা কিভাবে যেন বার করে ফেলেছিল, নিজরা কোন রকমে ফন্দি করে ওদের হাত থেকে বাক্সটা উদ্ধার করে উপেনের বাক্সের নিচে লুকিয়েছে। এত সব কাজের পরেও বাড়িতে হাজির হওয়া ছোট বড় সবাইকে, তার যে একজন মামী আসছে এ কথাটা বোঝাতেও বড় বেগ পেতে হচ্ছে। অবশ্য প্রত্যেকেই দু-একবার বলার পর ব্যাপারটা বুঝে যাচ্ছিল বলে তার ভালই লাগছিল।

কিন্তু একটা ব্যাপারে বড় রাগ হল নিজরার। একবার সে গিয়ে দেখে ওদের শোওয়ার ঘরে কে যেন কাদা পায়ে ঢুকে বিছানাটা কাদা পায়ের ছাপে ভরিয়ে রেখেছে। মামার বালিশ দুটোর পাশে ছোট বালিশটাকে কেউ তেরছা করে রেখে গেছে। এই বিছানাটা সামান্য নোংরা থাকলেও মামা বৃন্দাবনকে বকে। এখন বিছানাটার এ দুর্দশা দেখে সে তক্ষুণি সুবর্ণলতার কাছে গিয়ে নালিশ করল, 'দিদিমা,

আমাদের বিছানাটা দেখো গে, কে যেন কাদা পায়ে উঠে নোংরা করে রেখে দিয়েছে।'

সুবর্ণলতা সঙ্গে সঙ্গে চাদরটা পাল্টে দেওয়ালেন। কিন্তু রাতে শুতে গিয়ে নিজরা দেখল আবার কে যেন বিছানাটাকে কুঁচকে-মুচকে রেখে গেছে। রাগে তার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। আরেকবার চাদরটা পাল্টে দেওয়ার পর নিজরা তার ছোট বালিশটায় মাথা রেখে শুলো। বিয়ের শলা-পরামর্শ দিতে আসা মানুষজন যার যার ঘরে ফিরে যাওয়ার পর মাঝরাতে উপেন শুতে এল। নিজরার গায়ের কাপড়টাকে ভাল করে চাপিয়ে দিয়ে সে খুব সাবধানে শুয়ে পড়ল যাতে ওর ঘুম না ভাঙে।

নিজরার আবদার অনুযায়ী বিয়ের দিন ওর পরার জন্য একটা মেখলা-চাদর রাখা ছিল। সকালবেলাতেই সে সেটা পরে নিল। কাপড় জোড়া পরাতে সুরমার এক প্রহর টাক সময় নষ্ট হল, অন্তত দশটা সেফটিপিন লাগল। কিন্তু দুপুর পার হতে না হতেই সে আবার ফ্রক পরে ফেলল। বড়ই ঝঞ্ঝাট। প্রথম কথা যে দেখে সে-ই তাকে কনে বলা শুরু করল। দ্বিতীয়ত, বিয়ে-বাড়িতে তার জন্য যে পরিমাণ কাজ জমছে সেই পরিমাণে দৌড়ঝাঁপ করে সে কাজ করতে পারছে না, পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা মেয়ে-বউরা যখন জল ভরতে গেল তখন ছোট্ট একটা মাটির কলসী কাঁখে নিয়ে মেখলা চাদর পরে নিজরা সবার আগে আগে চলল। নদী থেকে ভরে আনা তার কলসীর প্রায় সব জলটুকুই মামার গায়ে ঢেলে দিয়ে সামান্যটুকু রেখে দিল। পরে সময় পেলে ওর বর-কনেকে চান করাবে বলে।

সমবয়সী বন্ধুরা ঠিকমত লুচি-ডাল-মিষ্টি খেল কিনা তার তদারকিতেই বিকেলবেলাটা নিজরা ব্যস্ত থাকল। ছেলেমেয়েদের ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে থাকল, 'এ্যাই তুই লুচি সন্দেশ খেয়েছিস?'

'খাইনি', বলার সঙ্গে সঙ্গে সে বৃন্দাবনকে জানায়, বৃন্দাবন ব্যবস্থা করে। একটু পরেই আরেকজন এসে হয়তো তার কানে কানে জানিয়ে দেয়, 'ওরা আগেই একবার খেয়েছে জানো? এমন মিছে কথা বলতে পারে ভাই!'

মাঝে মাঝে এমনিই হয়তো, নিজরা দৌড় মেরে মামার কাছে যায়, তারপর সুবর্ণলতার কাছে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ে জানায়, 'ওরেব্বাস, ভীষণ হাঁফ ধরে গেছে।' সুবর্ণলতা ওকে জাপটে ধরে কাছে বসাতে চান, পারেন না, হঠাৎও আবার দৌড় মারে।

সকালবেলাতেই উপেন আর সুবর্ণলতা বৃন্দাবনকে বলে রেখেছে, 'ও কোথায় কি করে বেড়াবে তার ঠিক নেই, তোর অন্য কিছু করার দরকার নেই, সারাদিন ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকবি।' বৃন্দাবন তাই করছে। ছেলে-মেয়ে-যুবতী-স্ত্রী-বৃদ্ধা-সবার মাঝে নিজরার পিছন পিছন সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সারাদিন ধরে বৃন্দাবনের নিজের বিয়েটা কবে এর জবাব দিতে দিতে হয়রান হয়ে গেছে। বিশেষ করে এই অল্পবয়সী মেয়েগুলোর গায়ে যে কি তেল হয়েছে ও ধরতেই পারছে না, কেবল ওর

সঙ্গে মস্করা করার সুযোগ খুঁজে যাচ্ছে। ও দু-একজনকে আবছা জবাব দিয়েছে। জনা দুয়েকের তামাশা তার খারাপ লাগেনি। কলেজে পড়া কাঁচা সোনার মত গায়ের রং যে মেয়েটার, সে জিগ্যেস করেছিল, 'ও বৃন্দাবন, তোমার নামটা দারুণ। তোমার ভিতরে না জানি কতই লীলা'।

বৃন্দাবন খুব বিষণ্ণ একটা হাসি দিল, তারপর নিচু গলায় বলল, 'মামনি, আমাদের লীলার কথা আর কি বলি। গোপীদের জুটিয়ে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তো মাতোয়ারা, এদিকে মরতে মরে গোপ। আমাদের বৃন্দাবনে সেই পোড়াকপাল গোপেরই লীলাখেলা মামনি।'

'এই ঘরে সবাই দেখছি একেবারে কথায় পাকা, কারুর পার পাওয়ার যো নেই' বাটায় করে তাম্বুল-মশলা পাঠানোর দায়িত্বে যে মেয়েটা সে ফোড়ন কেটে আবার কাজে মন দিল।

কনের বাড়ি মাইল ত্রিশেক দূরে। নিজরা উপেনের পাশে বসে কনে বাড়ি গেল। অনেক চেষ্টা করেও সে আর থাকতে পারল না, বরের পিছনে সুরমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। কনেকে যখন যজ্ঞের পিঁড়িতে এনে বসানো হল তখন নিজরা চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল। বিয়ে শেষ হওয়ার পর কনে যখন আবার ভেতরে গেল তখন নিজরা সুরমাকে, 'মামীকে দেখব' বলে ধরে বসল। সুরমা ওকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে নিজেই হেসে হেসে বৌদি বলে কনেকে ডেকে আগ বাড়িয়ে নিজরার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

কনের নাম রূপালি। মুখ তুলে নিজরার দিকে তাকাল। নিজরাও তাকাল। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। নতুন মামীকে ওর কেমন লাগল ও জানে না। কিন্তু তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে থাকলেন, এভাবে তার দিকে কেউ কখনও তাকিয়ে থাকেনি; হঠাৎই ওর কেমন যেন লজ্জা লাগল, মামীর চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে ও সুরমার আরও কাছ ঘেঁসে দাঁড়াল। রূপালির হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টানতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু তারও কেমন সংকোচ হল। কেঁদে কেঁদে ফুলে ওঠা চোখজোড়া কেবল একটু কেঁপে উঠল মাত্র।

সকালে বিয়ের শোভযাত্রা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্র সুবর্ণলতা হাতে একটা রেকাব নিয়ে পুত্র-পুত্রবধূকে সাদরে বরণ করতে বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাত কাঁপতে লাগল, এক অভূতপূর্ব উত্তেজনায় মুখের কথা জড়িয়ে গেল। উপেন মোটরগাড়ি থেকে নামার পরে তাঁর দু'গাল বেয়ে অশ্রুধারা নামল।

সারারাত জেগে বিয়ের জিনিস পাহারা দিয়েছে বৃন্দাবন, বর-কনের চারপাশে ভিড় করা লোকজনের পিছনে দাঁড়িয়ে সেও গামছার কোণায় চোখ মুছল। এই সেদিনও ওর কোমরে গামছার একটা দিক বেঁধে নিয়ে 'ও মা দেখে যা এই যে চোর ধরে এনেছি' বলে তামাশা করা উপেন আজ বিয়ে করে এল!

বরযাত্রীরা সকলে এবার তাড়াতাড়ি যে যার বাড়ি ফিরল, যারা থাকল তারা এবার কনের চারপাশে ভিড় করে বসল। একটা ফুলতোলা পাটির ওপর রূপালি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকল; তার চারপাশ ঘিরে থাকা কিশোরীর দল বৌদি, পিসিমা, মামিমা ইত্যাদি যে যার সম্বন্ধ পাতিয়ে ডেকে অজস্র কথা বলে চলল। শেষমেষ রূপালিকে কে যেন গান গাওয়ার জন্য জোরাজুরি করল। রূপালি মাঝে মধ্যে দু-একটা ছোটখাটো উত্তর দিল, কখনো বা একটু হাসল। ও প্রায় সকলকেই তুমি বলে সম্বোধন করল। দুপুরের দিকে রূপালি পাটির ওপরই শুয়ে পড়ল।। মেয়েরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় ব্যস্ত থেকে ওর চারপাশে বসেই থাকল।

নিজরা বাইরে সঙ্গীসাথীদের সামনে মামীমা দেখতে কত সুন্দর এটা প্রতিপন্ন করার অবিরত চেষ্টায় রত থেকে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। সন্ধের আগে আগে সুবর্ণলতা ওকে আস্তে আস্তে ঠেলে জাগালেন। বালিশ থেকে মাথা তুলেই ও জিজ্ঞেস করল,'দিদা, মামী কোথায়?'

এই প্রথম অকস্মাৎ সুবর্ণলতার বুকটা কি এক অজ্ঞাত কারণে ধক করে উঠল। মনে হল যেন এইবার জীবনের জমা-খরচের হিসাব করার সময় এসে গেছে তাঁর।

পরের দিন খাওয়া-দাওয়া, একের পর এক লোক আসছে, কনে দেখছে। বর-কনেকে নিয়ে নানারকম হাসিঠাট্টা চলছে। সবাই এ রকম আমোদ-প্রমোদে ডুবে থাকলে আর হাতের সামনে কিছু করার না থাকলে বৃন্দাবনের বড় একা লাগে। একটু দূরে একটা বেঞ্চে বসে সবার মাঝে বসে থাকা উপেন আর রূপালির দিকে সে তাকিয়েছিল, হঠাৎ কোথা থেকে নিজরা এসে তার কাছে বসল। প্যান্ডেলের লাইটের চারপাশে পোকার ঝাঁক তারই একটা নিজরার চোখে ঢুকেছে। বের করতে হবে। বৃন্দাবন ত্রস্তব্যস্ত হয়ে ওকে ভেতরে আলোর কাছে নিয়ে গেল। আজকের দিনটাতে নিজরার সঙ্গে তার একবারও মুখোমুখি হয়নি। সে ঘুরছে তার কাজের ধান্দায় আর নিজরা ঘুরছে রূপালির পিছন পিছন। আর রূপলির সঙ্গে বৃন্দাবনের এখনও পরিচয়ই হয়নি। গামছার একটা কোণা সরু করে নিয়ে পোকাটা বার করার সময় সে নিজরার গাল থেকে একটা সুন্দর গন্ধ পেল, হুবহু একটা হারিয়ে যাওয়া পরিচিত সুবাস। মনোরমা চলে যাওয়ার পর এ বাড়ি থেকে সুগন্ধের চল উঠে গেছে, উপেন দাড়ি কাটার পর মুখে যেটা ঘসে সেটা নিজরার গালে মাখার মত নয়।

কি ভেবে সে জিগ্যেস করল, 'তুই দেখি আজ সারাদিন আমার সঙ্গে কথাই বললি না? কি ব্যাপার?'

'বলব না তো, তুমি কেন সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ইয়ারকি কর'? বলেই নিজরা আবার দৌড়ে বেরিয়ে গেল। এই উত্তরটা বৃন্দাবন ওর কাছ থেকে বহুদিন বহুবার শুনেছে কিন্তু আজ তার মনে হল, 'না রে মামনি আর ঠাট্টা করব না, কখনও

ইয়ারকি মারব না — তবু আমার সঙ্গে একটু কথা বলিস।' তার মনে হতে লাগল আজ পর্যন্ত নিজরার সঙ্গে সে যত তামাশা করেছে দরকার হলে সে তার জন্য ক্ষমা চাইবে। কাকুতি জানাবে, তথাপি ও যেন বৃন্দাবনের সঙ্গে দুটো কথা বলে।

খাওয়া দাওয়া করে লোকজনেরা চলে গেল। শুধু দু-চারজন প্রতিবেশী তরুণী কনের সঙ্গে ভাত খাওয়ার জন্য থেকে গেছে। প্রথমে সুবর্ণলতা, উপেন এবং নিজরা খেয়ে নিল। তারপর কনেকে মাঝখানে বসিয়ে নিয়ে তরুণীর দল খেতে বসল। ভাতের প্রত্যেক গ্রাসের সঙ্গে প্রত্যেকের মুখে কথার ফুলঝুরি ছুটছে। সুরমা নিজের বিয়ের স্মৃতি একটু একটু করে বলতে লাগল। মুখে ভাতের গ্রাস আর হাসি নিয়ে অবিবাহিতা মেয়েদের ভবিষ্যৎ বিয়ের আয়োজন সম্পর্কে বিস্তৃত একটি কর্মসূচিও তৈরি করল। বেশির ভাগ সময় রূপালি হেসেই গেল। মাঝখানে শুধু জানাল ওর বিয়েতে বড় তাড়াহুড়ো হয়ে গেছে, দাদা ঠিকমত ছুটি না পাওয়াতে বাবাকেই একা সব সামলাতে হয়েছে— ইত্যাদি।

নিজরা সারাক্ষণ ওদের কাছেই বসেছিল, মাঝে একবার কাঁচের গ্লাসে একগ্লাস জল ভরে গ্লাস জল কোনটাই যাতে না পড়ে সেরকম সাবধানে ওদের শোওয়ার ঘরে ঢুকে গেল। ঘরের বিছানাপত্রগুলো এদিক সেদিক করা হচ্ছিল এটা সে বিকেল থেকেই লক্ষ্য করেছিল। এখন তার শেষ পরিণতি দেখে ওর চোখ চকচক করে উঠল। বিছানাটা দারুণ সুন্দর হয়েছে, শুধু চাদর-টাদরগুলোই নয়, খাটটা পর্যন্ত বদলে গেছে। ঘর জুড়ে নানা ধরণের সুগন্ধ। জলটা টেবিলে রেখে কাগজ দিয়ে ঢেকে রেখে সে বেরিয়ে এল। কলঘরে গিয়ে পা দুটো ঘষে ঘষে ধুয়ে নিয়ে ছোট্ট স্যান্ডেলজোড়া পরে নিল। তারপর একবার রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখল মামীদের খাওয়া হয়ে গেছে, হাত শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে গেল তবু কথা আর শেষ হয় না।

বারান্দায় সুবর্ণলতা একলা বসেছিলেন, নিজরা তাঁর কাছে গিয়ে পিছন থেকে জাপটে ধরল। কি এক অপূর্ব স্পর্শ লাভ করছেন যেন এমনভাবে চোখ দুটো বুজলেন সুবর্ণলতা। নিজরা বলল, 'জানো দিদিমা, মামী বলেছেন আমাকে নাকি মোটরে করে কোথায় নিয়ে যাবেন।'

কেন বলতে পারলেন না, সুবর্ণলতার মনটা যেন হা হা করে উঠল, 'যাস না মামনি, তুই যাস না।' কিন্তু তিনি শুধু বললেন, 'বেশ তো যাবি, এখন শুইগে চল, রাত তো অনেক হল, তোর ঘুম পায়নি?'

'পেয়েছে শোব' নিজরা বলার সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণলতা উঠলেন। 'আয়' বলে তিনি ভেতরে এলেন, পিছন পিছন নিজরা। মাঝের ঘরটা থেকে ডানদিকে ঘুরলে উপেনদের শোওয়ার ঘর, বাঁদিকে ঘুরলে সুবর্ণলতার। বাঁদিকে ঘুরে সুবর্ণলতা নিজরাকে ওদিককার ঘরে যেতে দেখে বললেন, 'আয়, আবার কোথায় চললি?'

'আমি শুয়ে থাকিগে' বলে নিজরা এক পা বাড়াল।

'শোয়ার জন্যই তো ডাকছি, তুই আমার কাছে শুবি।'

'ই-স' বলে নিজরা অত্যন্ত অবিশ্বাস আর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে মুখ ভেঙ্গাল।

'ইস কিসের। দেখে যা তোর বিছানা আমার সাথে কি সুন্দর করে পেতেছি।' বলে সুবর্ণলতা উপেনের শোওয়ার ঘরে এক পা রাখা নিজরার হাত ধরে টানলেন। নিজরা এ জাতীয় তামাশার কোন অর্থ খুঁজে না পেয়ে যখন ফ্যাল ফ্যাল করে দিদিমার মুখের দিকে তাকাল এবং দিদিমা, 'এ রকম করতে নেই, আয়' বলে সত্যিই টেনে আনলেন তখন তার সব অবিশ্বাস এক নিমেষে উড়ে গেল। 'ইস - না, আমি মামার কাছে শোব' সে চিৎকার করে উঠল। দিদিমা তাকে যত টানতে চেষ্টা করলেন, তত সে চেঁচাতে লাগল, 'আমি মামার সঙ্গে শোব।'

অন্য একটা ঘরে বসে উপেনের বুকটা মুচড়ে উঠল। এক তীব্র অনুভূতিতে তার হৃদপিণ্ড যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল।

বাটিতে হাত ধুয়ে তাড়াতাড়ি সুরমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেই নিজরাকে কোলে তুলে নিল। সুবর্ণলতার বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বোঝাল, 'দ্যাখ তোর বিছানা কি সুন্দর করে পেতে দিয়েছি, ছোট মেয়েরা তো দিদিমাদের সঙ্গেই শোয়, দিদিমা কত ভালবাসবে। ধেৎ বোকা মেয়ে—।'

এতদিন উপেনের সাঙ্গে নিজরার যে বিছানা ছিল, দিদিমার এখানে বিছানা সত্যিই তার চাইতে অনেক সুন্দর। ওর ছোট্ট বালিশটার ওপর বকপাখি স্বয়ং যেন সাদা একটুকরো কাপড় পেতে দিয়ে গেছে, দিয়ে গেছে সুন্দর ফুলকাটা ছোট একটা বিছানার চাদর। কিন্তু নিজরা হাত-পা দাপিয়ে সমস্ত বিছানাটা কুঁচকে ফেলল। সুবর্ণলতা আর সুরমার শত বোঝানো সত্ত্বেও, 'না না, আমি মামার সঙ্গে শোব' বলে চেঁচাতে লাগল।

রান্নাঘরে থালার কিনারে লেগে থাকা ভাতগুলো খুঁটতে খুঁটতে রূপালির পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘামতে থাকল। সমস্ত শরীরের রক্ত যেন তার মুখে এসে জমা হয়েছে। তার কানে শুধু নিজরার কথাগুলো আছড়ে পড়ছিল।

মুখ বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিল উপেনের। গত তিন বছর অর্থাৎ যেদিন থেকে নিজরা কথা বলতে শিখেছে, সেদিন থেকেই ও তার সঙ্গে শুয়ে আসছে। সে নিজে ওর জন্য একটা ছোট্ট বালিশ বানিয়ে এনেছিল। যখন ঘুম আসেনি ওকে গল্প শুনিয়েছে। যেদিন নতুন গল্প মনে আসেনি সেদিন 'এক দেশে নিজরা নামে একটা মেয়ে ছিল' বলে শুরু করতেই নিজরা বলতো 'ইস মিথ্যে কথা।' সারারাত স্বপ্ন দেখেই সম্ভবত নিজরা উহ্ আহ্ করলে সে ধীরে ধীরে ডাকতো, 'কী হয়েছে নিরু? —নিরু।' কোন উত্তর না দিয়ে চুপ হয়ে যাওয়া নিজরার গায়ের চাদর ঠিক করে দিয়ে তার গায়ে একটা হাত রেখে শুয়ে থেকেছে। গত একবছর শোওয়ার আগে নিজরার আনা একগ্লাস জল খেয়ে সে রোজ শুতে গেছে। সেই নিজরা আজ তার

সঙ্গে কেন শোবে না— সে কথা সে কি করে বুঝবে? কি-ই বা বুঝবে?

উঠোনের লাইটগুলো নিভিয়ে দেওয়াতে বাইরেটা একটু অন্ধকার হয়েছে। সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচু করে বৃন্দাবন জানলা দিয়ে নিজরাকে দেখতে চেষ্টা করছিল। ভেতরে ঢুকতে কিছুতেই তার সাহস হচ্ছিল না। নিজরা যে কেন কাঁদে একথাটা একমাত্র সে-ই যেন বুঝতে পারছিল। নিজরার মত সেও যদি একটু কাঁদতে পারতো! স্নান করার আগে উপেনের গায়ে সে তেল মাখিয়ে দিত, অফিসের কাপড়জামা বার করে দিত, তাম্বুল* কেটে জামার পকেটে ভরে দিত, আরও কত কি করত। কাল থেকে সে কি করবে? বাঁ হাতের তালুতে বুকটা ডলতে ডলতে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, যেন মনে মনে বলল, 'কাঁদ, মামনি কাঁদ'।

কেঁদে কেঁদে একসময় নিজরা ঘুমিয়ে পড়ল, বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে। ওর মাথায় বালিশ ছিল না, পরে সুবর্ণলতা বালিশে মাথাটা তুলে দিলেন। তাঁর নিজেরও অনেক রাত অবধি ঘুম এল না। মাঝে উপেনের ঘরের দরজাটা বন্ধ করার একটা ছোট্ট আওয়াজ হল। সমস্ত ঘর জুড়ে তখন ধূপের গন্ধ। সেই ধূপের গন্ধে গন্ধেই একসময় সুবর্ণলতা ঘুমিয়ে পড়লেন, ঘুমোল বৃন্দাবনও।

কত রাত বোঝা গেল না, হঠাৎ সুবর্ণলতার ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে লাইট জ্বেলে বিছানায় ফিরে দেখেন নিজরা বিছানার ওপর বসে। সহস্র কাকুতি নিয়ে চোখ দুটো তার ছলছল করছে। অনেক কথাই সে বলতে চায়, কিন্তু বলার মত কোন পরিচিত জন নেই তার— এমনি এক অসহায় চাহনি নিয়ে দিদিমার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

সুর্বণলতা বিছানায় এসে একহাত দিয়ে তাকে কাছে টেনে নিলেন। কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলেন না। তারপর একসময় চিবুকে হাত রেখে ওর মুখটা তুলে ধরে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে মামনি?'

নিজরার নাকের পাটা দুটো ফুলে উঠল, ঠোঁট ফুলে উঠল, চোখের কোণায় দু ফোঁটা জল টলটল করতে লাগল, প্রত্যেকটা শব্দ কেটে কেটে উচ্চারণ করল, 'আমি মামার কাছে যাব'।

সুবর্ণলতা আরও আঁকড়ে ধরলেন। শোকে দুঃখে নিজরা যেন ভেঙে খান খান হল। তার কান্নায় কোন শব্দ ছিল না। সে যেন বুঝতে পারছিল রাত্রির এই মৌনতার ধ্যান ভঙ্গ করা ঠিক হবে না। কেবল তার ছোট্ট শরীর কান্নার প্রতিটি

---

* অসমীয়া শব্দ 'তামোল' উচ্চারণ 'তামুল' আস্ত সুপারি মাটির নিচে রেখে মজানো হয়। গোটা তামুলকে দুই বা তিন টুকরো করে আধখানা পানে সামান্য চুন লাগিয়ে খাওয়ার রেওয়াজ আছে অসমে পান তামোল অসমে খুবই জনপ্রিয়।

তরঙ্গাঘাতে কেঁপে উঠতে লাগল। আর সেই কান্নার প্রতিটি ঢেউ আছড়ে পড়ল সুবর্ণলতার বুকে।

ধারাসারে বয়ে যাওয়া সুবর্ণলতার অশ্রু নিজরার মাথায় ঝরে পড়ছিল। আর সুবর্ণলতা ক্রমাগত মাথায় হাত বুলিয়ে সিক্ত করে তুলছিলেন ওর চুলগুলো। আরেকবার মনোরমাকে তিনি প্রাণ ভরে গাল দিলেন। এই রাতশেষে এই শিশুকন্যার চোখের জল দেখার জন্য যেখানেই থাক মনোরমা যেন একটিবার অল্পক্ষণের জন্য হলেও আসে।

সকালে নিজরাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে রূপালি নিজেই হাত-মুখ ধুইয়ে দিল, দুপুরে সামনে বসে থেকে ভাত খাওয়াল। বিকেলে তেল চিরুনি নিয়ে ওর চুল বাঁধতে বসল। মুখে পাউডার লাগানোর সময় নিজরা শুধালে, 'কাল রাতে মামা জল খেয়েছিল মাইমা?'

সারাটা দিন ধরে রূপালি এই ভয়টাই পাচ্ছিল, তার মুখটা রাঙা হল। জানাল, 'খেয়েছে।'

খেয়েছিল। আসলে উপেন রাতে শোওয়ার সময় খেয়েছিল একগ্লাস কুসুম কুসুম দুধ।

একটু সময় চুপ করে থেকে নিজরা আবার জিজ্ঞেস করল, 'মামা আপনাকে গল্প বলেছিল?'

এই মুহূর্তে রূপালিকে মা বসুন্ধরা যদি একটু লুকোনোর জায়গা দিতেন! যে গল্প উপেন তাকে শুনিয়েছিল সেই গল্প আজ অবধি না তাকে কেউ শুনিয়েছে, না কেউ শুনেছে। সে বলল, 'বলেছে নিজরা। আচ্ছা তোমার লাল ফিতে কটা আছে?'

নিজরাকে সাজগোজ করিয়ে ছেড়ে দেওয়ার আগে রূপালি তার মুখটাকে বুকে টেনে নিল। রূপালির উষ্ণ কোমল বুকের অপূর্ব পরশ বোধহয় মৌন করে দিল নিজরাকে।

সন্ধ্যার সময় দিদিমার গা ঘেঁসে বসে নিজরা ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করল, 'আজ আমি মামার সঙ্গে শোব না কি গো দিদা?' দিদিমা তাকে বর-কনের বাক্সটা কোথায় রেখেছে খুঁজে আনতে পাঠালেন।

নিজরা বর-কনে নিয়ে আর মেতে উঠল না, রাতে ফুঁপিয়ে কাঁদতেও সে যেন ক্লান্ত বোধ করল। কিন্তু এই পাগলী মেয়েটা এতটাই মূক হয়ে গেল যে বৃন্দাবন বাড়িটাতে কি যে একটা নেই, কি যেন হারিয়েছে মনে করে হাহাকার করে উঠল। বিয়েটা পার হওয়ার পর তার অনেক কাজ পড়েছে। কিন্তু কেউ যদি তার কাজে খুঁত না ধরে, কাজ করার সময় কেউ যদি ঘন ঘন এসে তাকে বিব্রত না করে তবে সে কাজ করবে কি ভাবে? বরের চান করার জায়গায় তুলসী চারাটা সে কাটেনি,

উল্টে আরেকটু মাটি ফেলে আরও একটু চাগিয়ে দিয়েছে, সেটা দেখতেও মেয়েটা একবার তার কাছে এল না। উপেনের এনে দেওয়া রঙচঙে বইগুলো উল্টেপাল্টে নিজরা যে কি আনন্দ পাচ্ছে বৃন্দাবনের বোধগম্য হল না। আজ তার ঐ বইগুলোকে পরম শত্রু বলে মনে হতে লাগল।

উপেন যতক্ষণ ঘরে থাকে পালিয়ে বেড়ায়। একটা ছোট্ট মেয়ের মুখোমুখি হওয়ার সাহস সে হারিয়েছে। দূর থেকে নিজরাকে দেখে তার নিজেকে অপরাধী মনে হয়।

এরপর অষ্টমঙ্গলায় যাওয়ার দিন এসে গেল। রূপালি আবার কনে সাজ পরল, উপেনও পরল, যে রকম নিজরার একজোড়া পুতুলের কদিন পরেই আবার বিয়ে হয়। উপেনরা বাড়ি থেকে রিক্শায় গিয়ে গাড়িতে উঠবে। সামনে দরজায় সুবর্ণলতা আর নিজরা এগিয়ে এল। গোয়ালে দুধ দোয়াতে যাওয়ার রাস্তাটার মুখে বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে। উপেন আর রূপালি সুবর্ণলতাকে প্রণাম করল। তারপর নিজরার গাল টিপে আদর করল। নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে রূপালির দিকে তাকিয়ে নিজরা প্রশ্ন করল, 'আপনি আবার আসবেন না কি মাইমা?'

সুবর্ণলতা নিজরাকে চট করে কাছে টেনে নিলেন। রূপালি নীরবে গিয়ে রিক্শায় উঠল। রিক্শায় উঠতে গিয়ে চাকার মাডগার্ডে পাটের মেখেলাটা আটকে গিয়ে পা-টা একটু বেআব্রু হয়ে পড়েছিল, তাড়াতাড়ি সে ছাড়িয়ে নিল।

রিক্শা থেকে নিজরার দিকে একবার ফিরে চাইতেও সাহস হল না রূপালির।

লজ্জা

স্নান করতে এসে নির্মালি হঠাৎই থমকে অবাক হয়ে গেল।

সাধারণত নির্মালি এ সময়টায় চান করতে আসে। একবার সে মা'র মত সকালে চান করার চেষ্টা চালিয়েছিল, কিন্তু পরে সে অভ্যাস ত্যাগ করেছে। ওর মনে হল চান করার নামে এরকম শাস্তি পাওয়ার কোন অর্থ হয় না। গায়ে ঢালার পর কনকনে ঠাণ্ডা জলটা যেদিক দিয়ে গড়ায় সেদিকে আর সাড় থাকে না। ঘষে-মেজে গা ধুতে তখন অসহ্য লাগে। তারপর আবার কাপড় বদলানোর সময় ঠাণ্ডা যেন একেবারে কামড়ে ধরে। সে তখন কুঁকড়ে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত হয়ে যায়, হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি লেগে যায়। ঠাণ্ডার চোটে মুখ দিয়ে গান বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু সে গান আর গান হয় না। পাথর ফেলা রাস্তা দিয়ে গ্রামোফোন বাজিয়ে চলে গেলে গানের যে অবস্থা হয়, নির্মালির মুখের গানও তেমনটি শোনায়।

অতএব নির্মালি মা'র মত ভোরে চান করার চেষ্টা ত্যাগ করল। মা তাড়াতাড়ি চান করেন রান্নাঘরে যেতে হবে বলে। রান্নাঘরের উনুন নির্মালি চান করলেও ছুঁতে পারে না, না করলেও ছুঁতে পায় না। সকালবেলায় ঘরের যে সমস্ত কাজ ও করে তা চান না করেও করা যায়। ভাত খাওয়ার আগে এক সময় চানটা সেরে নিলেই হয়। ভোরবেলাতেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তার কোন মানে নেই।

আগে বলতে, বেশ আগে, যখন নির্মালি স্কুলে যেত, তখন স্নানের ব্যাপারটা বেশ সংক্ষিপ্ত ছিল। ঘরে ঘড়ি ছিল না, কিন্তু মোড়ের মাথায় রত্না, জর্জিনাদের সঙ্গ ধরার ব্যবস্থাটা পাকাপাকি ছিল। ওরা কোন কারণে আগে চলে গেলে নির্মালির স্কুলে যাওয়ার আর সঙ্গী ছিল না। সুতরাং বাবা বেরিয়ে যাওয়ার একটু পর পরই আগের দিনের বাসি বেণী ছাড়াতে ছাড়াতেই ও চেঁচাত, 'মা, আমার হয়ে গেছে।' এর অর্থ আমার স্কুলে যাবার সময় হয়েছে, তোর ভাত হল, না হল না? *

---

* সাধারণত গ্রামে, কিছুটা শহরেও বটে, অসমীয়া পরিবারে মাকে 'তুই' বলার চল আছে।

এরপর পিছন দিকে গিয়ে দুই হাতের ডানায় দু'ঘটি জল ঢাললেই তার চান শেষ। পিঠের জায়গায় জায়গায় শুকনোই থেকে যেত, যেটুকু জল গায়ে পড়ত দুই হাত দিয়ে ঘসে ঘসে তাই দিয়ে সারা গা-টা ভেজানোর চেষ্টা করত। কখনও 'ইস, আজ অনেক দেরি হয়ে গেল, রত্নারা চলে গেলেই মরলাম আর কি' বলে তাড়াতাড়ি পায়ে দু'ঘটি জল ঢেলে হাত দুটো কনুই অবধি ভিজিয়ে ওই ভেজা হাতেই মুখটা ঘষে চলে আসতো। বেণী বাঁধার সময় তেলের হাতে হাত পা-টা একটু ঘষে নিলেই হাত-পা চকচকে হয়ে যেতো।

এক সময় নির্মালি স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিল, ল্যাঠা চুকল। সকালবেলা চান করার আর দরকার রইল না; বিশেষ করে শীতের দিনে।

আজকাল চান করার জন্য নির্মালি রোদের অপেক্ষায় থাকে। সরকারি কল থেকে জল নিয়ে এসে বড় বালতিটা টুপটাপ ভরে। কলসীটার দু' কলসী আর বালতিটার দু' বালতি হলেই বড় বালতিটা ভরে যায়। রোদ উঠলে জলের বালতিটাতে রোদ পড়ে। নির্মালির ধারণা তাতে জলটা একটু গরম হয়, অন্তত ঠাণ্ডাটা একটু ছাড়ে। জলের উষ্ণতা সম্পর্কে এরকম একটা আন্দাজ করে একসময় সে মেখলা চাদর জোড়া নিয়ে পিছন দিকে চলে আসে। সুপারি গাছটা থেকে রান্নাঘরের মাঝের বেড়াটা অবধি টাঙিয়ে রাখা তারটার ওপর মেখলা চাদরটা টাঙিয়ে দেয়, তারপর আস্তে আস্তে পাথরের পাটার ওপর বসে।

এই পাথরটা কোথাকার পাথর, কে কবে এনেছিল, এর কোন বৃত্তান্তই নির্মালির জানা নেই। জন্মানোর পর থেকেই এই পাথরের পাটাটা ও দেখে আসছে। এই পাথরের পাটার ওপর বসে দাঁড়িয়ে ও গা ধোয়, থালা বাটি ধোয়, কাপড় কাচে, মা চান করে, বাবা ভোলানাথ পিয়ন খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে যাওয়া গোড়ালিটা ঘষে ঘষে মসৃণ করে। মোটমাট ঘরের সব রকম ধোয়া পাকলার কাজ এই পাথরের পাটাটার ওপর হয়। জল পড়ে পড়ে পাথরটাকে বেশি বসে যেতে দেখলে ভোলানাথ কয়েক হাত দূরে একটা নতুন জায়গায় ওটাকে সরিয়ে দেয়। কয়েক দিনের মধ্যে ঐ জায়গাটার মাটিও নরম হয়, কাদা হয়, নির্মালির চান করার বালতিটার চাকতিটা বসে যায়, থালা বাসন মাজার জন্য ছাই আর খড়ের গোছা ছড়িয়ে জায়গাটা অত্যন্ত নোংরা চেহারা নেয়।

পাথরটার ওপর বসে চাদরটা সরিয়ে রোদের দিকে পিঠ করে বালতির জলে আঙুল চালিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বিনা কারণেই নাড়াচাড়া করে নির্মালি। অনেক দিন আগে শেখা কিন্তু এখন আর শোনাই যায় না, এমন একটা গানের গোটাচারেক কলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে থাকে অথচ গায়ে জল ঢালার নাম করে না।

কখনও কখনও মা মুখ ঝামটা দেয়, 'চান করবি তো কর আর না হলে উঠে আয়। কি তামাশা করে যাচ্ছিস তখন থেকে।'

'তামাশা করছি? জলটা কি রকম ঠাণ্ডা দেখ না এসে।' নির্মালি উত্তর দেয়।

মা গৌরীপ্রভা 'ই-স' বলে একটা টান দেন। বলেন, 'ওই জলেই আমরা কাকভোরে চান করি, আমাদের ঠাণ্ডা নেই, ওনারই কেবল ঠাণ্ডা লাগে।'

'হয়েছে, হয়েছে, কেউ যখন ঘুম থেকে ওঠে না তখন তুমি যে কি চান কর খুব জানি। আমাদের দেখিয়ে চান কোরো তো, তবে না বুঝি ক' চামচ জল গায়ে ঢালো।' এ সময়গুলোতে মায়ে ঝিয়ে 'তুই'র জায়গায় 'তুমি' সম্বোধন চলে।

পাথরের পাটার ওপর বসে থেকে এক সময় নির্মালি গায়ে জল ঢালে। কখনও এক দুই— তারপর তিন বলে এক নিঃশ্বাসে দশ বারো ঘটি জল ঢালে। ও এটা জানে যে একবার গা-টা ভাল করে ভিজিয়ে নিতে পারলে আর চিন্তা নেই। কিন্তু ওই প্রথম ঘটিটাই ঢালতে সাহস হয় না।

কিন্তু আজ প্রায় একই সময়ে গা ধুতে এসে নির্মালি অবাক হল। খালি গা-টা চাদরে ঢেকে চানের পর পরার জন্য মেখেলা চাদরটা হাতের ভাঁজে ফেলে নিয়ে ও পিছন দিকে এল। কিন্তু কাপড়টা তারের ওপর টাঙানোর জন্য মাথা তুলতেই ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছন দিকে নির্মালিদের বেড়ার ওপাশে যে ক্ষেত, সেই ক্ষেতে একটি জোয়ান বয়সের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। নির্মালি যখন ছেলেটাকে দেখল সে তখন অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই নির্মালির দিকে তার চোখ পড়ল। নির্মালি চটপট বুকের চাদরটার ডানদিকের পাড় ডানদিকের ওপরে এবং বাঁদিকের পাড় বাঁ বগলের নিচের দিকে পাঁজরের কাছে যতটা সম্ভব টেনে দেওয়ার চেষ্টা করল। কি করবে চট করে কিছু ভেবেও পেল না। একবার ভাবল দৌড়ে ভেতরে চলে যাবে। কিন্তু ওভাবে গেলে ও যে লজ্জা পেয়েছে এটা পরিষ্কার ধরা পড়ে যাবে। খানিকটা সময় যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে ও নিচের দিকে চেয়ে রইল, তারপর হাতের কাপড় জোড়া তারের ওপর ছুড়ে দিল। কাপড়ে তার মুখটা আড়াল হল, কিন্তু মেখেলা আর চাদরের সরু ফাঁকটা দিয়ে দেখতে পেল ছেলেটা ধীরে ধীরে হেঁটে বেড়াচ্ছে, এদিক সেদিক তাকাচ্ছে, মাঝে মাঝে নির্মালিদের ঘরের দিকেও দেখছে। কাপড়ের আড়ালে মুখ লুকোনোর পর লজ্জায় নির্মালির কান দুটো গরম হয়ে গেল। ছেলেটা যে কতক্ষণ থেকে ওকে দেখছে! আর ও-ই বা কতটা অসতর্ক ছিল কে জানে।

চাদর দিয়ে শরীরটা যতটা সম্ভব ঢেকে নিয়ে, খুব ধীর চালে, একটুও চঞ্চলতা প্রকাশ না করে নির্মালি ভেতরে চলে এল। একবার ভাবল মাকে জিগ্যেস করবে কোথাকার ছেলে, কি ব্যাপার। কিন্তু জিগ্যেস করল না, মাকে জিগ্যেস করতেও ওর লজ্জা হল।

নির্মালিদের ঘরের ডানদিকে এক দারোগার বাড়ি, চোরের ভয়েই কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হোক দারোগা আলকাতরার ড্রাম কেটে টিনের পাত দিয়ে

চারদিকটা উঁচু করে বেড়া দিয়েছেন। ফলে নির্মালিদের দিকটাও আড়াল হয়েছে। বাঁ দিকে এক কাঠের ব্যবসায়ীর বাড়ি। তার বাতার বেড়ায় নানা বুনো লতাপাতা উঠে ভালই আড়াল দিয়েছে। অন্তত উঁকি না দিলে নির্মালিদের দেখা অসম্ভব। বাকি রইল পিছন দিকটা

পিছন দিকে একটা খোলা জায়গা। নির্মালির যখন থেকে চোখ ফুটেছে তখন থেকেই ক্ষেতটা একই রকম দেখছে। বর্ষায় ছোট ছোট বুনো গাছ-গাছালিতে ক্ষেতটা ভরে যায়, আবার শীতকালে আপনা আপনি গাছগুলো শুকিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে যায়। ফাঁকা জায়গার এককোণায় থাকা ঘরটা নির্মালিরা দেখতে পায় না, দারোগার টিনের পাতের বেড়ায় আড়াল পড়েছে। নির্মালিদের বাড়ি থেকে ওই বাড়িটাতে সোজাসুজি যাওয়ার রাস্তাও নেই। যেতে হলে চৌরাস্তার মোড় ঘুরে ওই বাড়ির সামনে পৌঁছনো যায়, কেবল পিছনের ক্ষেত বা ফাঁকা জায়গাটা নির্মালিদের পিছন দিকে পড়ে। অনেক দিন আগে পনেরো বিশজন বাচ্ছা মেয়ে নিয়ে একটা বালিকা বিদ্যালয় বসেছিল। একদিন সব মেয়ে একই সঙ্গে কাছের দেবলাদেবী প্রাইমারি স্কুলে গিয়ে নাম লেখালো আর ঐ স্কুলের দিদিমনিও ওখানে একটা চাকরি পেয়ে গেল। মোটমাট দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়ে বেশিদিন টিকে থাকতে না পেরে বালিকা বিদ্যালয়টি আরেকটি স্কুলের মধ্যে বিলীন হল।

এরপর অনেক দিন খালি পড়ে থাকার পর ঘরটা নার্সদের কোয়ার্টার হল। প্রথম দু'দিন নির্মালি আর গৌরীপ্রভা ভেবেছিল অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু যখন দেখল ওই বাড়ির বাসিন্দা সবাই মহিলা, এমন কি রান্না করার জন্যও কোন লোক নেই, তখন দুজনেই একটু আশ্বস্ত হল। পাথরটার ওপর বসে রোদে চান করতে নির্মালির কোন অসুবিধা রইল না।

বরং মাঝে মাঝে সে বেড়ার কাছে যায়, ওদিক থেকেও দু-চারজন এসে দাঁড়ায়, বেড়ার ফাঁক দিয়ে দু'পক্ষের হাসিঠাট্টা চলে। পরের দিকে নার্সদের কথাবার্তার ধরণ নির্মালির ভাল লাগত না। কালো আর লম্বা, সামনের দাঁত দুটো উঁচু, চশমা পরা নার্সটি একদিন নির্মালির হাতে চিমটি কেটে বলেছিল, 'তোমার মত চেহারা আমাদের থাকলে না......।' অর্থাৎ নির্মালির মত চেহারা থাকলে উনি পৃথিবীটাতে একটা খেল্ দেখাতেন।

হঠাৎই একদিন মাঝরাতে নার্স কোয়ার্টার থেকে হৈ-হল্লা শোনা গেল। পরের দিন নানাজনের নানান কথা। কেউ বলে চোর ঢুকেছিল। কেউবা বলে চোর নয়, অন্য কিছু। বলতে মানুষের বাধে না। মোটের ওপর কদিন পরে নার্স কোয়ার্টার উঠে গেল। এরপর ওই বাড়িতে আর কেউ আসেনি। খোলা জায়গাটায় একটি জনপ্রাণীও কোনদিন কারো চোখে পড়েনি। পিছন দিকটায় এসে গায়ের কাপড় ঠিকঠাক আছে কিনা, এ ব্যাপারটা দেখার প্রয়োজন হয়নি নির্মালির কখনও।

কিন্তু আজকে চান করতে এসে লজ্জায় লাল-টাল হয়ে নির্মালি ভেতরে ঢুকে

গেল। ভেতরে গিয়ে সে কিছুক্ষণ ভাবল, কি করা যায়। তারপর মা'র দুটো ও তার একখানা, মোট তিনখানা চাদর নিয়ে আবার পিছনে এল। চট করে একবার দেখে নিল ছেলেটা ক্ষেতটা ঘুরে ঘুরে দেখছে। নির্মালি চাদর তিনটে তারের ওপর টান টান করে মেলে দিল। চান করার জায়গাটায় বেশ ভালই আব্রু হল। পাথরের পাটাটায় ছায়া পড়ল যদিও, সে তাতে খুব একটা ভ্রূক্ষেপ করল না।

পাথরটার ওপর বসে সে অন্যদিনের মত দেরি করল না। বসেই গায়ে জল ঢালতে শুরু করে দিল। কিন্তু যখন সমস্ত শরীরটা ভিজে জবজবে হল, চাদরটা শরীরের ভাঁজে-ভাঁজে লেপটে গেল, তখনই যেন বাতাসের চোখ খুলে গেল, কত জোরে বইতে হবে তার আন্দাজটা পবনদেব যেন তখনই পেলেন। তারে মেলে রাখা চাদরগুলো বাতাসে উড়তে শুরু করল। দুটো চাদরের মাঝখানে ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল। চাদর যেদিকে ওড়ে, সেদিকে শরীর দুলিয়ে নির্মালি নিজেকে লুকোতে চেষ্টা করল। চাদরের ফাঁক দিয়ে ঝট করে দেখতে পেল, ছেলেটা তাদের বাড়ির দিকেই তাকিয়ে আছে।

সাবান-টাবান দিয়ে চান করার ঝামেলা নির্মালির এমনিও নেই। বাড়িতে গায়ে মাখা সাবানের চল নেই বললেই চলে। কোন সময় সিটি বাসে চড়ে আগের সহপাঠিনী কোন মেয়ের কাছে যাওয়ার হলে, যে একটুকরো সাবান সে ব্যবহার করে তাই দিয়ে মা গৌরীপ্রভা হলুদ বেটে হাত ধোয়, বাবা ভোলানাথ পিয়ন পেঁয়াজ, লঙ্কা, বেগুনের পুলিতে মাটি চাপানোর পরে হাত ধোয়, নির্মালি নিজের ব্লাউজও ধোয়। কোথাও যাওয়ার থাকলে সেই সাবানের টুকরোটা চাদরের কোণায় ঘসে, সেই কোণাটা দিয়ে গলা, গলার পিছন অর্থাৎ কাঁধ এবং হাতের কনুই অবধি ঘষে নেয়, মানে কাপড়ের বাইরে যে অংশটুকু বেরিয়ে থাকে, সেটুকুই ঘষে। সিটি বাসে ওর পিছনে যদি কোন পুরুষ বসে তবে ওর বড় অস্বস্তি হয়। মনে হয় লোকটা ওর খোলা কাঁধটার দিকে চেয়ে আছে। তায় আবার কাঁধটা যদি পরিষ্কার না থাকে।

সব সময় সাবান মাখার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা কয়েকদিন পরেই সাবানটা বিস্কুটের মত পাতলা হয়ে মাঝখান দিয়ে ভেঙে দু'টুকরো হয়, এক টুকরো হারায়, আরেক টুকরো দেখতে না দেখতে শেষ হয়ে যায়। আরেকটা সাবান ঘরে আনতে ভোলানাথ অনেক দিন লাগিয়ে দেয়।

আজ সাবান মাখার কথাই নয়, বাতাস বইতে শুরু করার পর নির্মালি আর পাথরটার ওপর তিষ্ঠোতে পারল না। সে বিরক্তিতে চোখ কুঁচকে বাতাসে দুলতে থাকা গাছগুলোর মাথার দিকে এমন ভাবে তাকাল, যেন বাতাসের দেবতাটি ওই গাছের মগডালে বসে আছেন। পাটা থেকে নেমে কাপড় পাল্টাবার জন্য মেখেলা চাদর জোড়া হ্যাঁচকা টানে তার থেকে নিয়ে নির্মালি তড়িঘড়ি রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

কাপড়-টাপড় বদলে কিছুক্ষণ পব নির্মালি সাবধানে ভেজা কাপড়গুলো মেলতে

এল। ছেলেটা তখনও এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ক্ষেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গোটা দিনটা নির্মালির লজ্জায় লজ্জায় কাটল। মাঝে মাঝে অন্য কথার আড়ালে ভুলে যায়, কিন্তু হঠাৎ ঘটনাটি মনে পড়লেই কান-মাথা গরম হয়ে যায় তার। এ রকম লজ্জাজনক অবস্থায় সে কোন দিন পড়েনি। প্রফুল্লর সামনে যেতেও তার এ রকম লজ্জা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। এমন কি যেদিন প্রফুল্লর সঙ্গে ওর বিয়ের কথা শুনেছিল, তার পরদিনও ওর সামনে যেতে এত লজ্জা হয়নি।

প্রফুল্ল যখন প্রথম ওদের ঘরে আসে, তখন নির্মালি ভূগোলের বই আনতে সন্ধ্যার পর রত্নাদের বাড়ি গিয়ে নির্বিঘ্নে ঘুরে আসতে পারে, তাড়াহুড়োর সময় হাত ধুয়ে ফ্রকেই হাত মুছে নিতে পারে। প্রফুল্ল গৌরীপ্রভার কাছে নিজের কথা, গ্রামের কথা বলত, ও পাশে বসে শুনত।

প্রফুল্ল কোন্ এক গাঁয়ে থাকত, নিজের বলতে তার কেউ নেই। গাঁয়ের স্কুল থেকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল, ফেল করেছে। আরও একবার পরীক্ষা দিতে তার বড় আগ্রহ ছিল, কিন্তু উপায় ছিল না। কাজ খুঁজতে সে শহরে এসেছিল। ভেবেছিল একটা কাজ পেলে শহরে থেকে প্রাইভেটে পরীক্ষাটা দেবে। কাজও পেল চট করে, ডাকঘরে পিয়নের চাকরি। প্রথম অবস্থায় কাজ শেখার জন্য তাকে একজন অভিজ্ঞ পিয়নের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। অভিজ্ঞ পিয়ন ভোলানাথের সঙ্গে।

প্রফুল্ল খুব তাড়াতাড়ি কাজ ধরতে পারার জন্যই ভোলানাথের তাকে ভাল লেগেছিল এমন নয়। অল্প চালাক চতুর হলে অল্প দিনে পিয়নের কাজ শিখে নেওয়াটা এমন কোন বড় কথা নয়, অনেকেই শিখেছে, কিন্তু অনেক পিয়নই কাজের ব্যাপারে বড় বেশি চালাকি করে। ভোলানাথের প্রফুল্লকে ভাল লেগেছে অন্য কারণে। কাজের বাইরে ছেলেটা যেন অন্য কোন কিছু বোঝে না। কাজ করার পর একটু সময় যদি পায় তো কোণার টুলটার ওপর এমনভাবে বসে থাকে যেন কারও হুকুমের অপেক্ষায় আছে। একটাও অনাবশ্যক কথা কখনও ভোলানাথ তার মুখ থেকে শোনেনি। কখনও যদি ভোলানাথ অতি সাধারণ একটা ভুল ধরে তাকে শুধরে দিয়েছে তো লজ্জায় আর অনুতাপে সে মাথা হেঁট করে থেকেছে। অতি আপন মনে হওয়া আপনার জন বলতে কেউ না থাকা প্রফুল্লকে ভোলানাথ তাই মাঝে মধ্যে নিজের ঘরে এনে, হেসে দু-চারটে কথা বলার চেষ্টা করে, গৌরীপ্রভাকে এক পেয়ালা চায়ের কথা বলে।

এ অঞ্চলে চিঠি বিলোনোর ভার পড়লে চিঠি বিলিয়ে কখনও কখনও দুপুর বেলা প্রফুল্ল ভোলানাথের ঘরে আসে। ঘরে লেবু থাকলে গৌরীপ্রভা তাকে সরবৎ করে দেয়, নচেৎ এককাপ চা খেতে বলে। নির্মালি ওকে দাদা বলে ডাকে। ওর সামনে নির্মালি সংকোচ করার মত কোন কারণ খুঁজে পায়নি। কখনও-সখনও দোকান থেকে আধদিস্তে কাগজ, একটা রাবার — এ জাতীয় দু একটা জিনিস

আনার জন্য মা'র কাছ থেকে পয়সা নিয়ে তাকে দিত, প্রফুল্ল পরের দিন চিঠি বিলিয়ে ফেরার পথে জিনিসগুলো গৌরীপ্রভার হাতে দিয়ে যেত।

এরপর অনেক দিন কেটে গেছে। এই ফাঁকে প্রফুল্ল ভোলানাথের সংসারে অনেক কাছের মানুষ হয়ে গেছে। কখনও বিকেলে এক্সপ্রেস চিঠি আর টেলিগ্রাম বিলি করার জন্য ভোলানাথকে অফিসে থাকতে হলে প্রফুল্ল ভোলানাথের কাছ থেকে ব্যাগ আর গৌরীপ্রভার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে বাজারে যায়। গৌরীপ্রভা যদি বাজারের জন্য এক টাকা দেয় আর বাজার করতে গিয়ে যদি দেড় টাকা খরচ হয়ে যায়, তবে সেই আট আনা পয়সার হিসাব কেউই রাখে না, না প্রফুল্ল না গৌরীপ্রভা। অনেক সময় কাজের চাপে ভোলানাথ ঘরের দিকে তাকানোর সময়ই পায় না, এদিকে খড়ির অভাবে হয়তো গৌরীপ্রভার উনুন জ্বলছে না, কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে দিতে নাকের জলে চোখের জলে একাকার হচ্ছে, এই সময় প্রফুল্লই একগাড়ি কাঠ এনে ভোলানাথের পিছনের চাতালে নামিয়ে দেয়। ভোলানাথ বা গৌরীপ্রভা কাঠের দাম দিতে গেলে প্রফুল্ল লজ্জায় নিতে পারে না। প্রায়ই রাতের খাবারটা সে ভোলানাথের ওখানেই খায়। সে আধ মাইলটাক দূরে গাঁ থেকে আসা কিছু ছাত্রর সঙ্গে একটা ঝুপড়িতে থাকে। ভাত খেয়ে রাতে শোওয়ার জন্য সেখানে যায়। প্রথম দিন ভাত খেতে গিয়ে লজ্জায় সে মুখই তুলতে পারেনি, আজকাল ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেছে।

আজকাল স্কুল থেকে নির্মালি লজ্জায় লাল হয়ে ফেরে। অর্ধেক আসতেই বগলের নিচে ব্লাউজ ভিজে যায়, ঘরে এসে বই-পত্র রেখে, চাদরের আগাটুকু দিয়ে মুখ মুছে দু-তিনবার হাতপাখা চালানোর পর টের পায় পিঠটাও ঘামে ভিজে একসা।

রাস্তার পাশে পান-তাম্বুলের দোকান-ঘরটাও যেন হঠাৎই নির্মালির স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। হয়তো চালনি থেকে পড়া পিঠের গুঁড়োর মত ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে, রাস্তার কেউ সেদিকে গ্রাহ্য করছে না, পানদোকানী নির্মালিকে ডেকে বলে, 'বোনটি কেন ভিজছ? বৃষ্টি যতক্ষণ না থামে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে যাও।'

বই-খাতা, স্কুলের মাইনে — এইই একমাত্র খরচ নয়, গরীবের মেয়েকে পথেঘাটে অলিতে-গলিতে, সমাজে আরও অনেক খরচ মেনে নিতে হয়। সহজ সরল নিঃসঙ্গ গরীব পিয়ন ভোলানাথের এটা বোধগম্য হলেও, এত খরচ মেটানোর সামর্থ্য তার নেই। সে গৌরীপ্রভাকে বলে, 'যতটুকু হয়েছে ওতেই হবে, আর বেশি দিয়ে কি হবে?'

সাধারণত প্রয়োজনের থেকেও বেশিদিন স্কুলে না যেতে দেখে একদিন জর্জিনা রত্নারা নির্মালিকে নিতে এল। নির্মালি যায়নি, কিন্তু ওরা চলে যাওয়ার পর চোখের জল ফেলেছিল।

একদিন গৌরীপ্রভা ভোলানাথকে চাপা গলায় জানাল, 'ওর দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছ?'

ভোলানাথ চমকে উঠে জিগ্যেস করল, 'কি হয়েছে ওর?'

'কিছুই হয় নি'— গৌরীপ্রভা বলল, 'কিন্তু ও যে কি রকম বড়সড় হয়ে গেছে খেয়াল করেছ কি?'

এইবার ভোলানাথ বুঝল, 'ওহ্, ওর চেহারার কথা বলছ। না হওয়ার কি আছে? মাকে দেখতে হবে তো!' বলে হো হো করে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল।

এককালে গৌরীপ্রভারও দশজনের চোখে পড়ার মত চেহারা ছিল। ভ্রূ কুঁচকে চোখ বড় করে তাকাল গৌরীপ্রভা। 'কি যে ছাই বলে। মাথার ঠিক নেই লোকটার। ভীমরতিতে ধরেছে।' গজগজ করে ওঠে সে।

আকাশের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে ভোলানাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। তারপর যেন আপন মনেই বলে উঠল, 'ঠিক, যাদের খাওয়াবার সামর্থ্য আছে, পরানোর সামর্থ্য আছে, তাদের ঘরেই এ রকম চেহারা মানায়। ও রকম চেহারা নিয়ে ও আমার ঘরে জন্ম নিল, ওর লজ্জা আমি কি দিয়েই বা ঢাকি?'

গৌরীপ্রভার ইঙ্গিতটা নিয়ে ভোলানাথ দুদিন ভাবল, তারপর একদিন সংক্ষেপে প্রফুল্লর কথাটা পাড়ল।

এর পরবর্তী ঘটনা সংক্ষিপ্ত। গৌরীপ্রভার আপত্তি ছিল না। প্রফুল্লর কাছে কথাটা পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের যা চেহারা হল তা দেখার মত। দিন দুয়েক তো সে নির্মালিদের ঘরমুখোই হল না। বোধহয় পৃথিবীর প্রতিটি ঘরের সদর দরজাই ওর কাছে তখন নির্মালিদের ঘরের সদর দরজা বলে মনে হচ্ছিল; কিন্তু তার বোবা জীবনের অপার বিস্ময়, আকস্মিক বিহ্বলতা আর অচেনা অনভূতির সীমাহীন রহস্যের মাঝখানে প্রত্যেকটা বাড়ির প্রবেশপথ তার অক্ষম দৃষ্টির সামনে হারিয়ে গিয়েছিল। ডাকঘরে বসে মাথা নিচু করে সে নানা কথা ভাবল। তার একটা বাসস্থান অত্যন্ত জরুরি। গাঁয়ের জমিটা বেচে এখানে কোথাও একটা ঘর বানাতে পারলে সুবিধা হয়। একবছর, খুব বেশি দু'বছর এমন কোন বড় কথা নয়; ভোলানাথ মত দিল।

নির্মালিও কথাটা শুনল, শোনামাত্র বুকটা তার ধক করে উঠল। নানা অদ্ভুত চিন্তা তার মনে এল। এক নির্মালির ভেতর যেন অনেক নির্মালি জন্ম নিল। তারা কেউ হাসল, কেউ কাঁদল, একজন আরেকজনকে চিমটি কেটে সুড়সুড়ি দিয়ে ইয়ারকি মারল, একজন ভয় পেল, একজন কারও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে পরম শান্তিতে গভীর ঘুমে এমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল যে সে যেন আর জাগবেই না।

কিন্তু তারপর যেদিন প্রফুল্ল ওদের বাড়ি এল, নির্মালির খুব একটা লজ্জা লাগল না। এতদিন ধরে দেখে আসা, ধীরে ধীরে এ বাড়ির আত্মীয় হয়ে যাওয়া

লোকটার সামনে লজ্জা করার মত তার কিছু ছিল না। অতি সহজেই নির্মালির মুখের 'দাদা' ডাকটা হারিয়ে গেল।

কখনও কখনও নির্মালির একটু লজ্জা পেতে মন চায়। যখন ভোলানাথ ডাকঘরে যায়, খেয়ে দেয়ে উঠে দুপুরবেলা গৌরীপ্রভা পাটি পেতে শোয়, তখন নির্মালি পাখা হাতে নিয়ে বসে। বুকের কাপড়টা কোলের ওপর পড়ে থাকে। গ্রীষ্মের এই নির্জন দুপুরে ব্লাউজটা তার কাছে যেন নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে এই সময় নির্মালির হঠাৎই কেমন লজ্জা করে, এই শরীরটার প্রতি নিজেরই কেমন একটা অদ্ভুত লোভ জাগে তার। এই মুহূর্তে যদি প্রফুল্ল এসে পড়ে তবে সে বোধহয় দৌড়ে আড়ালে যাবে। না, তা নয়, প্রফুল্ল কখন এসেছে না জানার ভান করে সে কয়েকটা অসতর্ক মুহূর্ত কাটিয়ে দেবে, তারপর হঠাৎ ত্রস্ত হয়ে উঠবে, লজ্জায় লাল হয়ে যাবে এবং এরপর প্রশ্ন করলে প্রফুল্লও উত্তর দিতে গিয়ে থতমত খাবে। কি বলতে গিয়ে কি বলে বসবে।

কিন্তু সত্যিই যখন এ রকম সময়ে কখনও প্রফুল্ল এসে পড়ে, চোখের পলকে ঘুরে গিয়ে সে দরজার আড়ালে দাঁড়ায়। লজ্জায় প্রফুল্লর কান মাথা গরম হয়ে যায়। কি করবে ভেবে না পেয়ে শেষমেষ জোরে জোরে কয়েকটা গলা খাঁকারি দেয়। কাশির পরিষ্কার শব্দে প্রফুল্লর আসার সময় সম্পর্কে নির্মালির ভুল করার কোন উপায় থাকে না।

প্রফুল্লর সামনে লজ্জা করার কোন সুবিধা ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু লজ্জা পেল আজ। চান করতে গিয়ে লজ্জায় কোথায় লুকোবে ঠিক করতে পারেনি।

বিকেলে জিগ্যেস করবে কি করবে না ভেবে প্রশ্ন করল, 'নার্স কোয়ার্টারে কোন লোক এসেছে না কি মা?'

মা উত্তর দিল, 'হুঁ, হবে হয়তো। আমিও দেখেছি ক্ষেতটায় কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছিল।'

নির্মালি সোজাসুজি চান করার কথাটা বলল না কেবল বলল, 'আমাদের তো দেখছি অসুবিধা হল।'

'ঠিক বলেছিস, কিছু একটা করতে হবে,' গৌরীপ্রভা জানাল।

পরদিন সকালবেলা বড় বালতিটায় জল ভরার সময় নির্মালি দেখল ফাঁকা মাঠটায় কেউ নেই। কিন্তু রোদ চড়ার পর গা ধুতে গিয়ে দেখে ছেলেটা ক্ষেতে কোদাল চালাচ্ছে। সেই ছেলেটাই, নীল রঙের ডুরে পায়জামা আর সাদা শার্ট পরে কনুই অবধি জামার হাতা গুটিয়ে কোদাল চালাচ্ছে।

নির্মালি তারের ওপর তিনখানা চাদর ফেলে পাটার ওপর বসে চান করে চলে এল। ভেজা কাপড় দুটো মেলতে গিয়ে সে বুঝতে পারল ছেলেটা মাঝে মাঝে ওদের বাড়ির দিকে লক্ষ্য করে।

খেতে পরতে ভালবাসা উৎসাহী জোয়ান ছেলে, ঘরটা ভাড়া নিয়ে বোধহয় সে ঠিক করেছিল ফাঁকা জায়গাটা এমনি পড়ে থাকার চাইতে কাজে লাগালে কিছু শাকসব্জিও হবে, স্বাস্থ্যটাও ভাল থাকবে। ছেলেটা ক্ষেতটাকে পরিষ্কার করল। মাটি চাষ করল, আর যথেষ্ট দেরি হওয়া সত্ত্বেও কফির চারা লাগিয়ে দিল। তারপর একদিন পুলিগুলোকে কলাপাতা দিয়ে ঢেকে দিল। সকালে রোদ ওঠার পর সে ক্ষেতে আসে, কিছুক্ষণের জন্য চারার ওপর থেকে ঢাকনাগুলো সরিয়ে দেয়, গোড়ায় একটু একটু জল দেয়। এই হচ্ছে চারার ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার সময়, এখন পরিমাণ মত রোদ-জল পেলেই গাছ ভাল হবে।

কিন্তু এটা যে নির্মালিরও চান করার সময়। গৌরীপ্রভা ভোলানাথকে জানিয়েছিল যে ঘরটাতে জোয়ান বয়সের ছেলে আসাতে তাদের, বিশেষ করে নির্মালির বাড়ির পিছনে যাওয়া আসা, ধোয়া পাকলার অসুবিধে হচ্ছে। ভোলানাথ কিছু একটা করবে বলে সান্ত্বনা দিল। কিন্তু বেড়া একটা দিতে যাওয়া মানে পাঁচ-ছটা বাঁশ চাই, কয়েক আঁটি ইকরা* চাই। নেই নেই করে দশটি টাকা।

রান্নাঘরের আড়ায় শুকনো কাপড় জোড়া রেখে তিনখানা চাদরের আড়ালে চান করাটা নির্মালির রপ্ত হয়ে গেল। কখনও বাতাসে কাপড় ওড়ে, কখনও ওড়ে না। কাপড় বদলাতে কখনও রান্নাঘরের আড়ালে আসেই না, ঐ পাথরের পাটার ওপরই পাল্টে নেয়। একটা অদ্ভুত লজ্জা তাকে কিন্তু সর্বদাই সঙ্কুচিত করে রাখে।

একদিন চাদর তিনটে তারের ওপর টাঙাতে গিয়ে সে হঠাৎ লক্ষ্য করল, ছেলেটা ক্ষেতে নেই। এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে সে সরে এল। ভিতরের উঠোনে এমনিই কিছু সময় এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াল।

গৌরীপ্রভা ওকে চান করতে যেতে দেখেছিল। এখন উঠোনে ঘুরে বেড়াতে দেখে ভাবল, ক্ষেতে বোধ হয় কেউ আছে। তিনটে চাদরে গোটা ক্ষেতটা আড়াল করাও যায় না। তারও কয়েকদিন এ রকম হয়েছে।

খানিক বাদে আবার নির্মালি গিয়ে দেখল, ছেলেটা এসেছে। ধীরে ধীরে সে চাদর তিনটে মেলে দিল, তারপর পাথরের পাটার ওপর উঠে গায়ে গায়ে জল ঢালতে লাগল।

সেদিন সন্ধের পর ভোলানাথ রান্নাঘরের বারান্দায় আগুনে শীতে সিঁটিয়ে যাওয়া হাত পা সেঁকছিল, কাছেই প্রফুল্ল বসে ছিল।

গৌরীপ্রভা প্রসঙ্গের অবতারণা করল, 'পিছনের দিকটার কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছ না কেন? ক্ষেতটায় সারাদিন লোক কাজ করে, আমার যেমন তেমন, কিন্তু নির্মালির বড় অসুবিধা হচ্ছে যে।'

---

* ইকরা — নল-খাগড়ার মত দেখতে, কিন্তু ভিন্ন জাতের। এর বেড়া বানিয়ে দুদিকে মাটি বা সিমেন্ট লাগিয়ে অসমে বাড়িও তৈরি হয়।

ভোলানাথ এতদিন পরে যেন হঠাৎ সময় পেল। প্রশ্ন করল, 'অচেনা মানুষ এসেছে, তাই না?'

গৌরীপ্রভা বলল, 'কি জানি। আমি দেখার মধ্যে প্রফুল্লর মত একটা ছেলেকেই দেখেছি। ক্ষেতটাতে কফির চারা লাগাচ্ছিল মনে হল।'

প্রফুল্ল মাথা নিচু করে বসে ছিল। সে মাথা তুলে একবার গৌরীপ্রভার দিকে তাকাল।

পরের রোববারে রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে একগাড়ি ইকরা আর বাঁশ এনে প্রফুল্ল নির্মালিদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ভোলানাথ আর সে দুজনে মিলে সারাদিন পাথরের পাটার চারপাশ বেড়া দিয়ে ঘিরে দিল। ঢুকবার জন্য রান্নাঘরের দিক থেকে মাত্র একটা রাস্তা রাখল।

পরের দিন চান করতে যাওয়ার সময় নির্মালি ভুলে চাদর তিনটে হাতে নিয়েছিল। পরে মনে পড়াতে আবার রেখে দিল। পিছন দিক থেকে ঘেরার মাঝে ঢুকতেই বালতির জল খেতে আসা একটা কাক উড়ে পালাল। নির্মালি মেখেলা চাদরটা পাল্টানোর জন্য হাত বাড়িয়ে একটা বেড়ার ওপর রাখল। তারপর সে ক্ষেতটার দিকে দৃষ্টি চালাল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি যেন ভীষণ ভাবে আহত হয়ে ফিরে এল। তার চোখ থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরেই বেড়াটা। এক মুহূর্তের জন্য কি এক অব্যক্ত বেদনায় নির্মালির বুকটা মুচড়ে উঠল!

কয়েক পা এগিয়ে নির্মালি বেড়াটার কাছে গেল, দু' হাতের আঙুল দিয়ে ইকরাগুলো সরিয়ে ছোট্ট একটু ফাঁক করে তাতে চোখ রেখে ক্ষেতটার দিকে তাকাল। ছেলেটা আছে। ধীরে-সুস্থে সে চারাগুলো দেখে বেড়াচ্ছে। দুই হাত দিয়ে নির্মালি ইকরাগুলো আরেকটু টান করে ধরল, ফাঁকটা আরও সামান্য চওড়া হল, এবার সে ছেলেটাকে ভাল করে দেখল। ছেলেটা নির্মালিদের ঘরের দিকে দেখছে। কিন্তু সে তো নির্মালিকে দেখতে পাচ্ছে না! নির্মালি দু'হাতে আরও চাপ দিল— আরেকটু। না। ফাঁকটা যদিও একটু বাড়ল, আর বাড়বে না। কিন্তু ওর যে একটা ফাঁক দরকার, যাতে ফাঁকাটা থাকার জন্য চান করার সময় ওর লজ্জা লাগতে পারে। কিন্তু কোনও উপায় নেই, প্রফুল্ল বেড়াটার গিঁটগুলো বড় মজবুত করে দিয়ে গেছে।

পোড়োজমি

অনেক দিন ধরে দূর থেকে দেখে দেখে, পূজামণ্ডপের দুর্গা প্রতিমা সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হওয়ার পর একদিন হঠাৎই যেন চালচিত্র থেকে সমস্ত দেবদেবী নেমে এসে নন্দিনীকে ঘিরে ধরল। দুর্গা এলেন, সরস্বতী এলেন, লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ এলেন, সিংহ এল, সুন্দর ময়ূর এল, অস্বস্তিকর পেঁচাটা এল, শেষ পর্যন্ত ইঁদুরটাও এল; কলাগাছ, পদ্মফুল ইত্যাদি অবশিষ্ট জিনিসপত্র পাহারা দিতে কৈলাসের একদম মাথায় রয়ে গেলেন কেবল ভোলানাথ।

নন্দিনীর এক মুহূর্ত স্থির থাকার উপায় থাকল না। এতগুলো মানুষ কাছে-পিঠে ঘুরে বেড়ানোর ঘটনা সে জীবনে দেখেনি।

বাড়িতে মানুষ বলতে বাবা পরিতোষবাবু, মা সীতাদেবী, বোন মানসী আর ন'বছরের ভাই বুলবুল— ব্যস এই। কাছাকাছির মধ্যে ছোট দু' কামরার ঘরগুলোতে থাকে জগরু, তুযানীরা। ওরা থাকাতে নন্দিনীদের বন্ধু সংখ্যা বাড়েনি। লাভের মধ্যে হয়েছে সন্ধ্যার পর পাহাড়, পর্বত, জঙ্গল এবং দূর প্রান্ত থেকে নেমে আসা ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দকে ওরা বাধা দিয়ে রাখে। নন্দিনীদের চৌহদ্দিতে সজারু, সাপ এসে হাজির হলে ওরা হৈ হৈ করে চলে আসে। ইঁদারার দড়ি ছিঁড়ে বালতি পড়ে গেলে জগরুরা তুলে দেয়।

অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার পরিতোষবাবু নিজেই স্বীকার করেন, এত ছোট রেল স্টেশন পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে তিনি জানেন না। সারাদিনে একটি মাত্র আপ এবং একটি মাত্র ডাউন মোট এই দুটো ট্রেন স্টেশনটাতে দু'মিনিটের জন্য থামে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বোঝা মাথায় নিয়ে নামার মত চেহারা নিয়ে কখনও-সখনও দু-একজন প্যাসেঞ্জার নামে এবং পরিতোষবাবুর মুখোমুখি না এসে স্টেশনের উল্টোদিকের মাঠটায় নেমে যায়। কচু আর গমের বস্তা নিয়ে কোন সময় দু-একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে উঠতে আসে আর ওঠার আগে পরিতোষবাবুকে গোটা দুই ভাল পাঁচমুখী কচু আর এককুনকে গম দিয়ে যায়। কখনও মেল বা এক্সপ্রেসের

ক্রসিং থাকলে এক-আধটা মালগাড়ি অনেকক্ষণ ধরে স্টেশনে থাকে; সেই সময়টাতে পরিতোষবাবু গাড়িটার গার্ডের সঙ্গে বড় প্রাণ খুলে কথা বলেন।—'বিনোদবাবুকে আপনিও চেনেন নাকি? আরে বাপরে বাপ, বড় সাংঘাতিক লোক ছিল। অফিসের নিচুতলার কর্মচারীদের জীবন অতিষ্ঠ করে ছেড়েছিল। পরে লাভটা কি হল। প্রমোশন তো পেলই না, শেষের দু'বছর ইনক্রিমেন্টও কাটা গেল।'

অন্য একটি মালগাড়ির গার্ডবাবু হয়তো কাঁচড়াপাড়ার দীনদয়ালবাবুকে চেনে। কি? দীনদয়ালবাবু রিটায়ার করেছেন? ওই কাঁচা চুল, বত্রিশটা অরিজিনাল দাঁত নিয়ে মানুষটা রিটায়ার করেছে? ওঁর মেয়েদের বিয়ে দিলেন না, না? ওঁর তো ছয় মেয়ে। বড় তিনজনের দিয়েছেন? যাক, অন্তত কিছু করেছেন।

কথার মাঝখানে কখনও নন্দিনী একটা রেকাবিতে করে কলা আর বড় পাকা পেঁপের টুকরো একগ্লাস গরম জল সমেত রেখে যায়। কলা আর পেঁপে খেয়ে গার্ডবাবু দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু করেন, 'এই যদি হবার ছিল তাহলে জ্ঞান ঘোষ, পি সি সেন কি এমন খারাপ করেছিলেন? আপনিই বলুন।'

মেল এবং এক্সপ্রেসের আপ এবং ডাউন — এই চারটে ট্রেন এই স্টেশনটায় থামে না। ট্রেনগুলো পাস করার সময় পরিতোষবাবু নিচে যা-ই পরা থাক ওপরে অফিসের বেড়ার গজাল থেকে ঝোলানো ইউনিফর্ম গলিয়ে নিয়ে হাতে কলাপাতা রঙের পতাকাটা নিয়ে অফিসঘরের বারান্দায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রচণ্ড গতিতে লম্বা ট্রেনটা পার হয়ে যাওয়ার পর একটা খুরপি হাতে উনি ক্ষেতে আসেন—'নন্দিনী! বুলবুল! এই গাছ থেকে ফল ছিঁড়ল কে?'

খুরপি চালাতে চালাতে অনেক কথাই পরিতোষবাবুর মাথায় ঘুরতে থাকে। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে এভাবে পড়ে থাকলে তো তার সর্বনাশ হবে। কাছে-পিঠে কোন রকম সুবিধা না থাকায় মানসীকে কাকা-কাকিমার কাছে থেকে পড়তে পাঠিয়েছে। কিন্তু ওর পড়াশুনো হচ্ছে না। মাঝে মধ্যে বাড়িতে এলে মা'র কাছে কাঁদে, ঘরের কাজ করতেই ওর সমস্ত সময় চলে যায়। বাড়িতে কাকিমার গালি; স্কুলে মাস্টারমশায় দিদিমণিদের বকাঝকা।

'যাক এ বছরটা। প্রমোশন পাওয়াটাও বড় কথা।' ভেবে পরিতোষবাবু চোখ কান বুজে তিনটে বছর পার করে দিলেন।

তুফানী বুলবুলকে সাইকেলের পিছনে বসিয়ে পাঁচ মাইল দূরের একটা স্কুলে পড়াতে নিয়ে যায়, আবার নিয়ে আসে।

নন্দিনী বাড়িতেই থাকে। ত্রিশ মাইল দূরে কাকা-কাকিমার ওখানে ঝিয়ের মত গালমন্দ খেয়ে দিন কাটানো মানসীর চাইতে, বাড়িতে বসে নিশ্চিন্তে কলা আর পেঁপে ধ্বংস করে চলা নন্দিনীর জন্য তিনি বেশি চিন্তিত। তাঁর উপায় নেই। আপ ডাউন বহু মালগাড়ির গার্ডের মুখে তিনি বহু জায়গায় খবর পাঠিয়েছেন, কিন্তু সব

গার্ডই মাল নামিয়ে ফিরে আসা খালি বগির গার্ড হয়ে ফিরে এসেছে। তিনি ট্রান্সফারের জন্য দরখাস্ত এবং দু'মাস অন্তর একটা করে রিমাইন্ডার পাঠিয়ে চলেছেন, কিন্তু কোথাও কেউ তাঁর চিঠি পাচ্ছে কি না তার কোন খবর নেই। বড়ই অসুবিধার মধ্যে আছেন। কখনও কখনও নন্দিনী বাগানে গিয়ে বাবার কাজে হাত লাগাতে চায়, বাবা জোর করে ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দেন। নন্দিনী তার সঙ্গে খুরপি চালাবে! অসম্ভব।

নন্দিনীর কাজ বলতে প্রায় কিছুই নেই। কেবল চারটে কাজ আপনা আপনিই তার নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। সকাল সাতটায় আপ মেলটা পার হয়। বিশাল লম্বা ট্রেন। প্যাসেঞ্জার ঠেসে থাকে। রাতটা শুয়ে বসে কাটিয়ে আর একটা স্টেশন পরে খাবারের আশায় প্যাসেঞ্জাররা উদগ্রীব হয়ে থাকে; কেউ কেউ একেবারে খাই খাই মূর্তি ধরে থাকে। একটা বন্দী রাত কাটানোর পর উজ্জ্বল পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য প্রত্যেকেই জানলাগুলোকে নিজের দখলে আনতে চায়। এই ট্রেনটা পার হওয়ার সময় নন্দিনী মা'র স্নানের ভিজে কাপড় সামনের বেড়াটায় মেলে দিতে আসে। বেড়াটার গায়ে সকালবেলার সোনালি রোদ পড়ে। বেড়াটা থেকে পঞ্চাশ হাত দূর দিয়ে ট্রেনটা চলে যায়। নন্দিনীর দীর্ঘ চুলের গোছা তখন পিঠের ওপর ছড়িয়ে থাকে, রাতে শোওয়ার ফলে ভাঁজ পড়া শাড়িটা তার নিভাঁজ শরীরে দায়িত্বহীনতার প্রমাণ নিয়ে জড়িয়ে থাকে। হু হু করে মেলট্রেনটা পার হয়ে যায়। একটি চোখের দৃষ্টিও নন্দিনীর শরীরে ধাক্কা না খেয়ে ফেরে না। ওর দিকে তাকায় না এমন প্যাসেঞ্জার নন্দিনীর চোখেই পড়ে না। কিছু কিছু প্যাসেঞ্জার অদ্ভুত আওয়াজ করে, কেউ হাত নাড়িয়ে ডাকে, দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকা দু-একজন বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে। না দেখে পার হয়ে যাওয়া এক-আধজন হঠাৎই দেখতে পেয়ে সাঁত করে ঘুরে তাকায়, শরীরের অর্ধেকটা বার করে দেখে, কেউ দরজা থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখে।

ট্রেনটা পার হয়ে যাওয়ার পর মা'র কাছে যাওয়ার আগে নন্দিনী শাড়িটার দিকে তাকায়। তার আগে অবধি শাড়িটার কথা সে ভুলেই থাকে। গোলাপগঞ্জ স্টেশনে বাবা যখন টেলিগ্রাফে চাকরি করতেন, তখন জাহানারা নামে ওর এক বান্ধবী ওকে বলেছিল, চলন্ত রেলের প্যাসেঞ্জারদের সামনে কিসের লজ্জা? নিজে সম্পূর্ণ নিরাপদ থেকে যদি একদঙ্গল লোককে নাচাতে চাও তো তা হল চলন্ত রেলের প্যাসেঞ্জার। বড় সাংঘাতিক মেয়ে ছিল ঐ জাহানারা।

নটা নাগাদ উল্টোদিক থেকে ডাউন এক্সপ্রেসটা আসে। তখন নন্দিনীর নিজের গা-হাত-পা ধোয়া হয়ে যায়। চুল-টুল আঁচড়ে একটা ধোয়া শাড়ি পরে নন্দিনী বেশ ঝরঝরে হয়। ডাউন এক্সপ্রেস আসার সময় সে নিজের কাপড় মেলতে আসে। মায়ের কাপড় জামাগুলো এর মধ্যে অর্ধেক শুকিয়ে যায়। মা'র কাপড় একটু সরিয়ে

ও নিজের কাপড়ের জন্য জায়গা করে। ডাউন এক্সপ্রেসের লোকেরা আগের কোন এক স্টেশনে খেয়ে-দেয়ে বেশ সজীব হয়ে থাকে। এদের পেটটা শান্ত থাকে, কিন্তু মনটা বড় বেশি দৌড়োদৌড়ি করে। ন'টার রোদ আরও উজ্জ্বল থাকে, মানুষের দৃষ্টি আরও উজ্জ্বল হয়, সেই রোদ আর দৃষ্টিতে নন্দিনী দ্বিতীয়বার স্নান করে।

তিনটের পর বেড়ায় মেলে দেওয়া কাপড়গুলো শুকোয়। কাপড়গুলো তোলার সময় হয়। এর ঘণ্টা খানেক আগে নন্দিনীর দুপুরের ঘুম ভাঙে। এরপর পিছন দিকে পা ছড়িয়ে বসে, আধঘণ্টা ধরে কলাপাতায় করে কাঁচা লঙ্কা নুন দিয়ে কামরাঙা খাবে। তারপর কাপড় তুলতে সামনের দাওয়ায় এসে বসে। খানিক পরেই দুরে ডাউন মেলটার শব্দ শোনা যায়। সেই একই রকম — বড় দীর্ঘ ট্রেন।

চারটে বাজলে নন্দিনী একটু সাজগোজ করে। ওর কোথাও যাওয়ার নেই। তবুও একটা দিনকে বিদায় দিতে তো হবে, বোধহয় সেই কারণেই। কোন দিনকেই অপরিচ্ছন্ন হয়ে বিদায় দিতে নেই। গোলাপগঞ্জে থাকতে রোজ বিকেলে সেজেগুজে বেড়াতে বেরোত। জাহানারা বলত, যাওয়ার বেলায় দিনটাকে ভাল করে দেখে নিতে হয়। বাবার ফরমাশে কোন এক মালগাড়ির গার্ডবাবুর এনে দেওয়া প্রসাধন সামগ্রী দিয়ে নন্দিনী নিজেকে সযত্নে সাজায়। একটা ভাল শাড়ি পরে। এর মধ্যে বুলবুল স্কুল থেকে ফেরে। বুলবুলকে সঙ্গে করে নন্দিনী বাড়ি আর স্টেশনের মাঝের খালি জায়গাটায় রেললাইনের পার ধরে বেড়ায়। বেড়ায় বলতে দৌড়ঝাঁপ করে খেলেই বলা চলে। ও না খেললে বুলবুলের বড় অসুবিধা হয়। বেড়িয়ে বা খেলে যখন নন্দিনীর মুখ-চোখ লাল হয়ে যায়, তখন আপ এক্সপ্রেসটা আসে। বিকেলের ট্রেন। পার্বত্য জায়গাটায় শান্ত সুন্দর বিষণ্ণ বিকেল। নন্দিনীর মুখের কোথাও যদি রাঙা হতে বাকি থেকে থাকে ঐ ট্রেনটা সেটুকুও রাঙিয়ে দিয়ে যায়। বুলবুল প্রশ্ন করে, লোকগুলো কি বলেরে দিদি?

পরম তৃপ্তির সঙ্গে নন্দিনী জানায়, ওদের মাথা আর মুণ্ডু। তারপর সন্ধ্যা নামে। সীতাদেবী ঠাকুরঘরে যান। তাঁর দেহমনের সমস্ত শক্তি দিয়ে শঙ্খে ফুঁ দেন, সঙ্গে সঙ্গে নন্দিনীও বেড়ায় টাঙানো শিবের ছবিটার দিকে তাকিয়ে একটা ছোট্ট প্রণাম করে।

এরপর চারদিকের পাহাড়, জঙ্গল আর দূরতর প্রান্তরের ভয়াবহ নৈঃশব্দ নেমে আসে এই ছোট স্টেশনটাতে। নন্দিনীদের বাগানে দু-চারটে ফেউ-বনবিড়াল এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। তুফানী দূরে একই সুরে চিৎকার করে গান গাইতে থাকে। তার গানের মূল বিষয় স্নেহ-প্রীতি-প্রেম। যদি তুমি কাউকে ভালবাস বলে কথা দাও তবে তোমার সেই ভালবাসার কথা চিরদিন তোমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে ধরে রেখো—তুমি আর আমি দুজনেই পরবাসী, তবে আর আমাদের দুঃখ কিসের। — হে সখী, কি আর করিব আমি, এখনও আসেনি মোর প্রিয় ইত্যাদি।

ভাত হওয়ার আগেই নন্দিনী আর বুলবুল শুয়ে পড়ে। শবজি কেটে দেওয়ার

পর রান্নাঘরে নন্দিনীর আর কাজ থাকে না।

সেই নন্দিনী আজ মানুষ দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। সীতাদেবী গতকাল গেছেন মানসীকে দেখতে, আগামী কাল ফিরবেন।

দু' রাতের জন্য নন্দিনী সংসার চালানোর দায়িত্ব নিয়েছিল। এই স্টেশন আর এর পরের স্টেশনের মাঝখানে একটা দীর্ঘ সেতু আছে। কোন দুর্বৃত্ত ঐ সেতুতে একটি বোমা ফাটিয়েছে। রেললাইনের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, কিন্তু সেতুটার অল্প ক্ষতি হয়েছে। একটা দু'বগির এমারজেন্সী ট্রেন ঘটনা ঘটার একটু পরেই এইদিক দিয়েই গেছে। যাওয়ার পথে একজন ওপরওয়ালা পরিতোষবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন। এর একটু পরই ডাউন এক্সপ্রেসটা এই স্টেশনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। শয়ে শয়ে লোক। ট্রেনটা কখন এখান থেকে ছাড়বে তার কোনও ঠিক নেই।

নন্দিনীর প্রথমে বড় আনন্দ হয়েছিল। কেমন যেন পূজো পূজো মনে হচ্ছিল। বুলবুলকে সঙ্গে নিয়ে সে একবার বেড়াটার কাছে এগিয়ে এল। ওর মনে হল গার্ডের কামরা থেকে ইঞ্জিন পর্যন্ত ট্রেনটার এ মাথা থেকে ও মাথা সে একবার ঘুরে আসে। কিন্তু তার যাওয়া হল না। ওদের ঘরের সোজাসুজি যে বগিটা দাঁড়িয়েছিল, তাতে একদল তরুণ ছিল। অনেক দূরের যাত্রী বলেই সম্ভবত ওরা একেবারে ঘরোয়া পোশাকে ছিল। দু-একজনের কাপড়-জামা দেখে মনে হয় ওরা মিলিটারি। নন্দিনী বেড়াটার ধারে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওরা একেবারে খাই খাই চোখে ওর দিকে তাকাল। গোটা দশেক লোক এর মধ্যে মাটিতে নেমে পড়েছিল। নন্দিনী দাঁড়ানো মাত্র আরও জনাদশেক লাফিয়ে লাফিয়ে কামরাটা থেকে নামল।

দুরন্ত গতিতে যেতে থাকা প্যাসেঞ্জারের সামনে শাড়ির আঁচলটার কথা অর্ধেক ভুলে থাকা যায়, কিন্তু একগাদা লোকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা? নন্দিনী পড়ি-মড়ি করে ভেতরে চলে গেল।

বুলবুল কিন্তু দু'পা এগোল। ওর খুব ফুর্তি হচ্ছিল। একজন লোক ওকে ডাকল, 'খোকা এদিকে শোনো তো!'

অল্প সময়ের মধ্যে ডাউন ট্রেনের শ' শ' যাত্রী স্টেশনটায় ছড়িয়ে পড়ল। সময় পার হতে লাগল। আগের স্টেশনের খাবার ওদের পেটে হজম হয়ে গেছে। অনেকের পিপাসা পেল।

সবার প্রথমে নন্দিনীদের ঘরের মুখোমুখি কামরাটার একজন বুলবুলকে বলল, 'বুলবুল, দিদিকে গিয়ে বল একগ্লাস জল দিতে।'

নন্দিনী সযত্নে চকচকে পেতলের গ্লাসে একগ্লাস জল পাঠিয়ে বেড়ার ফুটো দিয়ে উঁকি দিল। একটি সুন্দর তরুণ বুলবুলের হাত থেকে গ্লাস নিয়ে জল খেল। খালি গ্লাসটা ফেরৎ দিয়ে বুলবুলকে কিছু একটা বলছে।

বেশ কিছু লোক এর মধ্যে বুলবুলকে ঘিরে ওদের বাড়ির সবার খবর জেনে

নিয়েছে। শূন্য গ্লাসটা নিয়ে বুলবুল দৌড়ে ঘরে এল। হাসতে হাসতে দিদিকে বলল, 'দিদি, লোকটার আরও একগ্লাস জল চাই। এবার তোকে নিয়ে যেতে বলেছে, তুই দিলে জলটা খেতে আরও ভাল লাগবে, তোকে একথা বলতে বলেছে।'

'ছিঃ তুই ভারি দুষ্টু হয়েছিস'— বলে নন্দিনী এক অদ্ভুত সুরে বুলবুলকে ধমকে দিল।

নন্দিনীর গলায় এই সুর আর বেশিক্ষণ টিকল না। যাত্রীদের প্রায় সকলেই আস্তে আস্তে পিপাসার্ত হয়ে উঠল, কিন্তু এই পাণ্ডববর্জিত স্টেশনে খাওয়ার জলের ব্যবস্থা নেই। কি করে এরা খবর পেল এ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টারের বাড়িতে একটা ইঁদারা আছে। প্রথমে একজন দুজন, ক্রমে দলে দলে লোক নন্দিনীদের ঘরের পিছন দিকে চলে এল। প্রথমটায় তুফানী বালতিতে করে জল তুলে দিচ্ছিল, ওর হাত ব্যথা হতে জগরু কাজটা করতে লাগল, পরের দিকে যাত্রীরা নিজেরাই দড়ি দিয়ে জল তুলতে আরম্ভ করল। এক শক্ত সমর্থ পৈতাধারী যাত্রী নিজের ঘটিতে করে এক ঘটি এক ঘটি করে জল নিয়ে পরিতোষবাবুর রোয়া পুদিনা গাছের ক্ষেতের কাছে দাঁড়িয়ে চানটাও সেরে নিল।

এক সময় যাত্রীদের ক্ষিদে পেল। জল খেতে আসা একটি লোক খেতে কেমন এমনি পরীক্ষা করার ছলে একটা ফল চিবিয়ে দেখল, তার একটু পর পরই গাদা গাদা লোক বাগানের পেঁপে থেকে খাদ্যযোগ্য যা কিছু ছিল সব একদিক থেকে শেষ করতে লাগল। প্রথম অবস্থায় জগরু, তুফানী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মানুষগুলোর অসুর মূর্তি দেখে ওরা চুপ করে গেল।

নন্দিনী ঘরের ভিতরে দরজা বন্ধ করে বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে এ সমস্ত কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করছিল। কিন্তু কয়েকজন মহিলাকে আসতে দেখে বেরিয়ে এল। মহিলা কজন ইঁদারার দিকে না গিয়ে নন্দিনীর কাছে এল। প্রথমে নন্দিনীদের সবার খোঁজ খবর নিয়ে তারপর জল খেতে চাইল। এতগুলো লোককে ইঁদারার পাড়ে হুলস্থুল করতে দেখে একজন ভদ্রমহিলা আজকালকার লোকেদের উদ্ধত প্রকৃতির ওপর একটি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ঝাড়লেন।

নন্দিনী বাগানের জিনিস নষ্ট হওয়ার নালিশ জানাল। নন্দিনী কথাগুলো বলে শেষ করতে না করতে এক বয়স্কা মহিলার রাগে চুল খাড়া হয়ে গেল। কেউ কিছু বলার আগেই উনি ইঁদারার পারে হাজির হয়ে লোকগুলোর উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গালমন্দ শুরু করলেন, 'তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান নেই? লজ্জাশরম কিছুই নেই? এই বিপদের সময় একটু জল খেতে পাচ্ছ-সেটাই যথেষ্ট নয়? তার ওপর তোমরা বাগানটাকে শুদ্ধু নষ্ট করছ?'

মহিলার রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখেই সম্ভবত বাগানের চারদিকে দাপিয়ে বেড়ানো লোকগুলো কেটে পড়ল। বেশির ভাগ লোক ভদ্রমহিলাকে বাড়ির গৃহিণী বলে ভুল

করল। একটা ভুঁড়িওয়ালা লোক হাতির মত শুঁড় তোলার ভঙ্গীতে হাত তুলে নন্দিনীর চারদিকে ঘিরে থাকা মহিলাদের দলটিকে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার আর্শীবাদ করে চলে গেল।

রুদ্রমূর্তি ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোদের জল খাওয়া হয়েছে? যা এখন কম্পার্টমেন্টে বসে থাকগে। আমি এখানে আছি। বিদেশে বিভূঁয়ে পড়ে আছে আমাদেরই তো লোক, যতক্ষণ ট্রেন না ছাড়ে ততক্ষণ আমি এখানেই থাকব। একলা মেয়েটা, হঠাৎ কোন বিপদ আপদ হতে কতক্ষণ?'

তারপর হঠাৎই তিনি নন্দিনীর দিকে শাসিয়ে উঠলেন, 'আর তুইই বা কেমনধারা মেয়ে শুনি? মা বাড়িতে নেই বাবাকে তুই যেতে দিলি কি বলে? এ বয়সের একটা সোমত্ত মেয়ে কখনও ঘরে একলা থাকতে আছে? দেখি, চাটাই-টাটাই কিছু থাকলে নিয়ে আয়, পেতে নিয়ে একটু পা-টা ছড়াই। তোরা এখনও বসে আছিস কি করতে?'

বাকি মেয়েগুলো সুড়সুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নন্দিনী মন্ত্রমুগ্ধের মত মাঝের ঘরে পাটিটা পেতে দিল। পাটিটা পেতে দাঁড়িয়েছে, ঠিক এই সময় বুলবুল দৌড়ে এসে নন্দিনীর হাতে একটা চকোলেট গুঁজে দিয়ে বলল, 'এটা তোকে দিয়েছে। আর লোকটা তোকে কি বলতে বলেছে জানিস? বলেছে—'

'চুপ', বলে নন্দিনী ওর মুখ বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ রাঙা হয়ে উঠল। মোটা ভদ্রমহিলাটি মহা আরামে পাটির ওপর জমিয়ে বসলেন। 'ওই হট্টগোলের মধ্যে থাকার চাইতে এখানে একটু আরাম করে নিই' বলে তিনি বড় করে হাঁপ ছাড়লেন। এরপর তিনি নিজেদের বৃত্তান্ত শোনাতে লাগলেন। ওরা সবাই সমাজ কল্যাণের কাজে দল বেঁধে এসেছেন। উনি দলনেত্রী, দলের বাকি মেয়েদের উনিই নিজে বেছে নিয়ে এসেছেন। এরা প্রত্যেকেই খুব লক্ষ্মী মেয়ে, তবে কথা হল গিয়ে ওদের একটু কড়া নজরে রাখতে হয় এই যা। নারী কল্যাণের প্রতি ভদ্রমহিলার এতই উৎসাহ যে এই যে ছোট্ট স্টেশনে একলা নন্দিনীর কোন অসুবিধা হতে পারে এটাও তাঁর সহ্য নয়। তাছাড়া এক জায়গার লোকও তো বটে।

সারাটা দিন গড়িয়ে গেল, কিন্তু ট্রেন ছাড়ার নাম নেই। পরিতোষ বাবুও আসেননি। নন্দিনী বুলবুলকে একবার জোর করে ধরে ভাত খাইয়ে দিয়েছে। ও ঘরে থাকতেই চাইছে না। হঠাৎ একবার দৌড়ে এসে 'দিদি' বলে ডাক দিয়ে কিছু একটা বলতে আসে, নন্দিনী সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকিয়ে ওকে চুপ করতে বলে। ওর যে দিদিকে বলার জন্য কত কথা জমে আছে।

ভদ্রমহিলাও সারাদিন নন্দিনীর কাছেই থাকলেন। এক থালা পাকা পেঁপে আর চারটে কলা খেয়ে তিনি নারীর সংযম, ধর্ম সম্পর্কে নন্দিনীকে অনেক কথা শোনালেন। অনেক উপদেশ দিলেন। মধ্যে একবার দ্বিতীয়বারের জন্য নন্দিনীদের

কলা আর পেঁপের প্রশংসা করলেন। আগে থেকে পাড়া ভেতরে আরও দুটো পেঁপে ছিল। নন্দিনী তার থেকে বড় পেঁপেটা ওঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিল। ভদ্রমহিলা 'ইস এটা আবার কেন দিলি'? বলে আপত্তির ভঙ্গীতে পেঁপেটা নিলেন এবং নন্দিনী বড় লক্ষ্মী মেয়ে বলে আদর করলেন।

সন্ধ্যা হল। আজ আর নন্দিনীর ভাল করে খাওয়া হল না। শরীরটাও খারাপ লাগছিল। কিন্তু ওর এও মনে হচ্ছিল যে ট্রেনটার শত শত যাত্রীর আজ হয়তো কিছুই খাওয়া হয়নি।

বাড়িটার আশপাশে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে দেখে ওর একটু ভয় ভয় করছিল। কিছু আগে ওই কামরার সবাই হাততালি দিয়ে সমস্বরে গাইছিল — হৃদয়ের বিনিময়ে বেদনাকে বরণ করে নিলাম।

বুলবুল বোধহয় সেই লোকটার সঙ্গেই আছে। অকস্মাৎ খবর এল ট্রেন ছাড়বে, ছাড়বে মানে চাকা ঘুরল বলে। মহিলাকে নিতে দুটি মেয়ে এল। ভদ্রমহিলা নন্দিনীকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমো খেলেন। নন্দিনীর শরীরটা শিরশির করে উঠল।

এই সময় দু'কামরার ট্রেনটা ফিরে এল। তার থেকে পরিতোষবাবু নেমে এলেন। এরপরেই ডাউন এক্সপ্রেসের চাকা ঘুরল। আধো অন্ধকারে বুলবুলের কাঁধে নির্জীব একটা হাত রেখে নন্দিনী বেড়াটার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। কামরাটার মানুষদের অনেক গলার আওয়াজ তার কানে এল, কিন্তু সে কারও মুখই ঠাহর করতে পারল না।

এরপর স্টেশনটাতে যে নিস্তব্ধতা নেমে এল তা যেন আরও ভয়ঙ্কর। আজ আর তুফানী গান গাইল না।

রাত্রে তাড়াতাড়ি ভাত-টাত খেয়ে, ক্লান্ত বিমর্ষ পরিতোষবাবু টর্চ হাতে বাগানে ঢুকলেন। বিছানায় বালিশে মাথা রেখে বুলবুলের মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে পরম স্নেহে নন্দিনী খুব আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করল, 'লোকটা তোকে কি কি বলেছে রে? বল দেখি। সব বলবি কিন্তু।'

সারা দিন দৌড়ঝাঁপ করার ফলে বুলবুল খুব ক্লান্ত ছিল। ঘুমে তার শরীর ছেড়ে দিয়েছিল। 'লোকটা তোকে —' বলে সে শিবঠাকুরের ছবি থাকা বেড়াটার দিকে পাশ ফিরল। তার ঘুম এল।

'আমাকে? আমাকে কি?'—নন্দিনী অনেকক্ষণ ধরে জেগে রইল।

শেকল

বঁড়শিতে ঢোঁড়া সাপ গেঁথে গেলে মৎস্য শিকারীর যে রকম উত্তেজনা হয়, কালিদাসের মুখোমুখি পড়ে গেলে অম্বিকারও তেমনি এক ধরনের উত্তেজনা হয়। অবাঞ্ছিত, অখাদ্য, ভীতিপ্রদ অথচ নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ, রাগে বিরক্তিতে হলেও সুতো টানাটানি করে একটু ফুর্তি পাওয়া যায়, পাশাপাশি সাপটাকে বঁড়শি থেকে ছাড়ানোর চিন্তায় খানিকটা উদ্বেগও হয়।

নুড়ি ফেলা রাস্তাটা দিয়ে এসে পাকা রাস্তায় পা দিয়েই অম্বিকা একবার দূরের বাজারটার দিকে দেখে নিয়েছে। তারপর একমনে কিছুটা এগিয়েছে, এমন সময়ে কালিদাস ডাক দিল, 'কে গা? অম্বিকা নাকি? ওব্বাবা এ যে দেখি পায়রা। কোথায় পেলি? নিয়ে যাস কোথায়?'

অম্বিকার মনে হল, কালিদাস ওর পিছন পিছন আসছিল, শেষটুকু বেতস বনের ভেতর চোরাপথ দিয়ে রাস্তাটা কমিয়েছে। না হলে হঠাৎ করে এখানটায় কি করে উদয় হবে।

'তাই তো? কোথায় পেলি পায়রা কটা? তোরা তো বাড়িতে পায়রা পুষিস না। ' কথাগুলো বলতে বলতে কালিদাস অম্বিকার সঙ্গে এগোল।

কাল থেকে এই পায়রা কটার কথা বলে বলে অম্বিকার বিরক্তি ধরে গেছে। ও আসছিল জগন্নাথদের বাড়ি থেকে। জগন্নাথের ক'দিন যাবৎ বাড়ির সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকার মতই, আর কবে যে সম্পর্ক হবে তারও কোন ঠিক নেই। তিনি এখন মিটিং নিয়ে ব্যস্ত। বিরাট জনসভার আয়োজনের কাজ। বেশ ক'দিন আগে মিলে ধান দিয়ে এসেছিলেন জগন্নাথ। কিন্তু চাল আনার সময়ই হচ্ছে না। এদিকে ঘরে চাল নেই, ফলে জগন্নাথের স্ত্রী অম্বিকাকে ডেকে পাঠিয়েছিল কয়েক ধামা চাল ঢেঁকিতে কুটে দিতে। পরশু পুরো দিনটা আর কালকের একবেলা ধানকোটার কাজ শেষ করে অম্বিকা বেতের ঝুড়িতে দু'সের-টাক চাল ডালায় ঢেকে নিয়ে ঘরে ফিরছিল। সেই সময়টায় দূরের মাঠটাতে জনসভা শুরু হয়েছে। এক মানুষের

চেয়েও উঁচু মঞ্চটার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে অম্বিকা চিনতে পারছিল। এই জনসভার কথা অম্বিকা অ্যাদ্দিন ধরে শুনে আসছে, কিন্তু সেই তুলনায় উপচে পড়া ভীড় হয়নি। অবশ্য আসল সভা হবে ওবেলায়। সে সময় অনেক মানুষ আসবে। আরেকটা কথা, জগন্নাথের স্ত্রী ঢেঁকিশালে বসে স্বামীর গল্প শোনাতে শোনাতে জানাল, আসলে এই সভায় এই মৌজার সমস্ত গাঁয়ের মানুষদের আসার কথা ছিল। কিন্তু পরে কি একটা কথাকে কেন্দ্র করে চন্দ্রপুর সমেত রেল লাইনের ওপারের দশখানা গ্রাম আলাদা হয়ে গেল। এরাও নাকি চন্দ্রপুরের মাঠে আলাদা সভা করবে। অবশ্য টাউনের একেবারে সীমানায় হওয়ায় এই সভাতেই সবচেয়ে বেশি লোক হবে, জগন্নাথের বৌ বুক বাজিয়ে এ কথা জানিয়েছে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে অম্বিকা এগোচ্ছিল, এমন সময় ওর কানে সভাস্থল থেকে ঢোল ভোরতাল*, শঙ্খ, উলুধ্বনি, হাততালির শব্দ এল। হাঁটা বন্ধ রেখে অম্বিকা মঞ্চের দিকে তাকিয়ে রইল। ও দেখল মঞ্চের ওপরের মানুষজনের মধ্যে থেকে একঝাঁক পাখি আকাশে উড়ে গেল। পাখি এলো কোত্থেকে? অম্বিকার চোখ মঞ্চের মানুষজন ছেড়ে এবার পাখিদের অনুসরণ করতে লগাল। ঢোল ভোরতালের শব্দে পাখিগুলো খানিকটা সময় হকচকিয়ে গিয়ে এদিক ওদিক উড়তে থাকল। লোকজনের হাততালি আর চিৎকারে ওরা ঘন ঘন গতিপথ পাল্টাতে লাগল, একসময় ওদের একটা অংশ লোকজনের মাথার ওপর ওড়া বন্ধ করে গাঁয়ের দিকে চলে এল। একটু সময় উল্টোপাল্টা ঘুরপাক খেয়ে এবার অম্বিকার দিকেই উড়ে আসতে লাগল। ওরা নিচেও নেমে এল।

অম্বিকা দেখল, ওগুলো পায়রা। দেখতে দেখতে ওরা আরও নিচে নেমে এল, আর ওদের মধ্যে একটা অম্বিকার থেকে একটু দুরে লোকসান খাওয়া এক দোকানদারের ছেড়ে যাওয়া চালাটার ওপর এসে বসল। তার পর আরেকটা এবং তারপর পুরো দলটাই। বসার পর ওরা সচকিতে ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। অম্বিকার উপস্থিতিতে ওরা আবার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। অম্বিকা একটু সময় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ও ধামাটা থেকে এক মুঠো চাল নিয়ে ছড়িয়ে দিল। এবার পায়রাগুলো উদগ্রীব হয়ে এদিক ওদিক তাকানো বন্ধ করল। তারপর এক এক করে চাল ছিটোনো জায়গাটায় নেমে এল এবং খেতে শুরু করল। শেষে চাল ছিটোতে ছিটোতে এগিয়ে আসা অম্বিকাকেও আর গ্রাহ্য করল না। এই সময় অম্বিকা গায়ের চাদর ডালা আর হাত দিয়ে ওদের কয়েকটাকে জাপটে ধরল। মুহূর্তে বাকি পায়রাগুলো যেদিকে পারল সেদিকে উড়ে গেল। অম্বিকার ডালা চাদরের এবং হাতের মধ্যে বন্দী হল চারটে পায়রা। চালের সঙ্গে ধামায় ভরে ডালা

---

* করতালের চেয়ে অনেক বড়, ঝাঁঝের মত দেখতে।

দিয়ে ঢেকে অম্বিকা ওদের নিয়ে ঘরে ফিরল।

ওর আসার পর থেকেই ঘরের মধ্যে একটা হুলুস্থুল চলছে। ওর পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে ঘরে যে দুজন উপস্থিত ছিল তারাই প্রথমে পায়রা কোথায় পেলি বলে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। আরেকটা বড় ভাঙাচোরা ধামা দিয়ে মেঝেতে পায়রাগুলোকে ঢেকে রেখে— 'চেঁচামেচি করবি না, ধামায় হাত দিবি না, দেখিস উড়ে না যায়—' ইত্যাদি শাসনমূলক কিছু কথার বাইরে অম্বিকা আর কিছু বলল না। অম্বিকার ঘরের উঠোনের ওই পারে দয়ারাম বুড়োর ঘর। সামনের চালাটার নিচে বসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পিটপিট করে পৃথিবীর চাল-চলন লক্ষ্য করে যায়, আর একমাত্র হাতের লড়ি বুড়ির জ্বালিয়ে দেওয়া তামাকের ছিলিমে সংসারের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা ধোঁয়া করে বার করে দেয়। হুলুস্থুল শুনে বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে অম্বিকা, আবার কোথায় কি পেলি?'

'কোথায় আবার কি পেলাম শুনি? কিছু পাইনি।' অম্বিকা ভেতর থেকে চেঁচাল।

'কিছু পাইনি বললেই হল? কথা লুকোস কেন? পায়রাগুলো কোথায় পেলি?' নির্বিকার কণ্ঠে বুড়ো জানায়।

'এই— মিছিমিছি কথা বাড়াস না তো, চুপচাপ থাক।' বলে অম্বিকা মুখ ঝামটা দিল।

পরের কথাগুলো বুড়ো যেন বাতাসকে উদ্দেশ করে বলল, 'ঠিক আছে, এখন চুপ থাকলাম। তবে ভাবিস না আমি খবর না নিয়ে থাকব। কোথাকার পায়রা কোথায় এল, কার ঘরের পায়রা পাওয়া যাচ্ছে না, তুই কি ভেবেছিস এ খবর আমি না নিয়ে ছাড়ব? গোটা গাঁয়ের খবর নেওয়াব। ভাল মনে একটা কথা জিগ্যেস করলে জবাব দিস না। নিশ্চয় কিছু একটা আছে তাই লুকোচ্ছিস।'

হুলস্থুলটা আরও বাড়ল অম্বিকার বড় ছেলেমেয়ে তিনটে জনসভা থেকে ফেরার পর। সকাল থেকে বিকেল অবধি না খেয়ে না দেয়ে সভার চারপাশে ঘুরে বেড়িয়ে শুকিয়ে যাওয়া মুখগুলো পায়রার কথা শুনেই ঝলমল করে উঠল। এতক্ষণ ছোট দুটো মেঝেতে কান ঠেকিয়ে ধামার কানা আর মেঝের ফাঁকটা দিয়ে পায়রাগুলোকে দেখছিল; একদম ছোটটা একটা ঝাঁটার কাঠি এনে পায়রা কটাকে খুঁচিয়ে ওর মতই চঞ্চল করে তুলতে চাইছিল। কিন্তু বড় ছেলেটা এসেই ঝুড়িটার একদিক তুলে নিচে উঁকি দিল। পাছে পায়রা কটা বেরিয়ে যায় বলে অম্বিকা হৈ হৈ করে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে বড়টাও চেঁচাল, 'এ তো দেখছি মিটিংয়ে ওড়ানো পায়রা। আমরা একেবারে কাছ থেকে দেখেছি যে। তুই কোথায় পেলি মা? কি করে পেলি? মিটিংয়ে গিয়েছিলি নাকি? ধরলি কি করে?' ওর প্রশ্নর ঠেলায় মায়ের কথার খেই হারিয়ে গেল।

কথা বলল ওদিককার বারান্দা থেকে বুড়ো দয়ারাম। 'সে কথাটা বলবি তো? মিটিংয়ের পায়রা, যা তাড়াতাড়ি সেখানে যেখানে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হয় দিয়ে আয়।'

'কোথায় ফিরিয়ে দেব? আমি কি মিটিং থেকে ধরে এনেছি নাকি?' প্রত্যেক কথায় কথা বলার জন্য বুড়োর ওপর এবার অম্বিকা সত্যিই রেগে গেল।

বুড়োরও জীবনে কাজের মধ্যে এই একটাই আছে। উত্তর দিল, 'ধরে আনিসনি? পায়রা কটা উড়ে এসে তোর ঝুড়িতে পড়েছে!'

'পড়েছেই তো।' বলে অম্বিকা খিঁচিয়ে উঠলেও মনে মনে ভয় পেল। বুড়ো যদি সত্যিই ও মিটিংয়ের পায়রা ধরেছে বলে সারা গাঁয়ে রাষ্ট্র করে দেয়! মিটিংয়ের লোকেরা যদি ওর উঠোনে এসে হাজির হয়। ভয় পেলেও আপাতত ও কি করবে ভেবে পেল না। কেবল ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচি করতে বারণ করল।

ছেলেমেয়েগুলো যতক্ষণ জেগে ছিল পায়রার চিন্তাতেই অস্থির। বড় ছেলেটা মাকে খোঁচাতে লাগল, 'ও মা, অনেক দিন মাংস খাই না। আজকে পায়রার মাংস রান্না কর।'

বড় মেয়েটা প্রশ্ন করল, 'মা, পায়রাগুলো দিয়ে কি করবি? একটা আমায় দিবি, পুষব।' শুনে ছোট মেয়েটা চেঁচাতে লাগল, 'আমারও একটা চাই —।'

একটা পায়রা পায়ে দড়ি বেঁধে ওই দড়িটা ওর হাতে দিতে হবে বলে অনেকক্ষণ বায়না ধরে শেষে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল ছোটটা। বড় ছেলে দুটো ওবেলা আবার মিটিংয়ে গিয়েছিল। রাতে সভা থেকে ঘরমুখো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের পায়রার মাংস দিয়ে ভাত খাওয়ার কথা মনে পড়তেই ওরা পা চালিয়ে ঘরে ফিরল। ঘরে ফিরে ওরা কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল তারপর মুখে কোন শব্দ না করে শুধু ভাত কটা খেয়ে বিছানায় গেল। ঝুড়িটার ওপর একটা শিলনোড়া চাপা দিয়ে অম্বিকা যখন শুতে এল, তখন ওকেও ক্লান্তি আর বিরক্তিতে চেপে ধরেছে। ঘুমের চেষ্টা করতে গিয়ে তার কানে দয়ারাম বুড়োর ঘর থেকে গুনগুন আওয়াজ এল, বুড়ো এখনও পায়রাগুলোর কথাই চালিয়ে যাচ্ছে নাকি? বুড়ি ছাড়াও বুড়োর ঘরে আরও কেউ আছে নাকি? একবার উঠোনে বেরিয়ে গিয়ে, কি কথা বলছে, চুপচাপ শুনে আসবে নাকি?

কিন্তু অল্প পরেই বুড়োর ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তার কতক পরে, অম্বিকা ঠিক আন্দাজ করতে পারল না, অন্য ঘরটাতে প্রথমে খরক খরক করে তারপর ঘটর করে একটা শব্দ হল। একলাফে বিছানা থেকে উঠে অম্বিকা কুপিটা হাতে নিয়ে অন্য ঘরে দৌড় লাগাল, ও শুধু এক ঝলক দেখতে পেল বেড়ার ওপরের ফাঁকটা দিয়ে একটা কুচকুচে কালো খটাশ বেরিয়ে গেল। ঝুড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল এরই মধ্যে খটাশটা শিল নোড়া ফেলে দিয়েছে। এইবার কাঠের চেয়ারটাকে সুদ্ধ

ঝুড়িটার ওপর চাপা দিল।

সারারাত অম্বিকার অনেকবার ঘুম ভাঙল। খিরিক-খারাক, খুটুক-খটাক শব্দে বার বার সন্ত্রস্ত হল।

অন্যদিন শেয়ালগুলো বাঁশঝাড়টার কাছে ডাকাডাকি করে, আজ একটা একেবারে দাওয়ার কাছে এসে হাজির। ওদের কর্কশ চিৎকারে বড় ছেলেটার ঘুম ভেঙে গেল। ও চোখ না খুলেই জিগ্যেস করল, 'শিয়ালগুলো এত কাছে কেন এসেছে মা?'

'কি জানি, পায়রা খেতে এসেছে হয়তো। আর কি করতে আসবে;' অম্বিকা বিরক্ত কণ্ঠে জবাব দিল।

'খেলেই ভাল হবে। আমাদের খেতে দিলি না তো।' বলে পাশ ফিরে শুল এবং আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে রাখল অম্বিকা, তারপর সেও নিঃশব্দে পাশ ফিরল। বাকি রাতটুকুতে ঘুমোনোর আর কোন আশা দেখল না ও।

পারে না। কিছুতেই পারে না। পায়রা কটা পোষাও সম্ভব নয়, ছেলে, খটাশ, শিয়াল কাউকে খেতে দেওয়াও সম্ভব নয়। মানুষে খায় এমন জিনিস খেয়ে বেঁচে থাকা আর একটি প্রাণীকেও তার পক্ষে পোষা সম্ভব নয়। আবার মাংস খেয়ে পায়রা কটার অপচয় করার ক্ষমতাও তার নেই। কি বলছিল ও? অনেক দিন মাংস খায় না? অনেক দিন মানে খেয়েছিলিটা কবে? বাপ বেঁচে থাকতে, এহ্ অত দিনের কথা মনে রাখতে নেই রে বাপ।

পায়রাগুলো আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসার পরমুহূর্তে অম্বিকার মনে হয়েছিল অন্তত কয়েকটা টাকা; জগন্নাথের বৌ আরও তিনসের চাল দেবে, চালের সঙ্গে এই টাকা কটা, অন্তত দু'দিনের ভাত এবং মাসের তেল নুনের ব্যবস্থা। ছেলেমেয়েদের উৎপাতে সারাদিনে কয়েকবারই চিন্তাটা ওর মাথায় ঘুরপাক খেয়েছে —বেচবে? নাই বা বেচল? একটাকে রাঁধবে না কি? ছেলে দুটো বড় আশা করে আছে। না সবগুলোকে উড়িয়ে দেবে। বুড়ো দয়ারামই বা কি কাণ্ড করে। কিন্তু শেষ রাতে ও সবরকম উটকো চিন্তা ঝেড়ে ফেলল। টাকাটাই আসল।

সকালে অম্বিকা বড় ছেলেটাকে একটা কাঁচা বাঁশ কেটে আনতে বলল। বাঁশ আনার পর অম্বিকা জিগ্যেস করল, 'কাঠি চেঁছে একটা খাঁচা বানাতে পারবি?'

চালাটার নিচে থেকে বুড়ো দয়ারাম বলে উঠল, 'অত দেমাক নাই দেখালি রে অম্বিকা। ও কাঠি চেঁছে খাঁচা তৈরি করার লোক? আমাকে খাঁচাটা বানিয়ে দেওয়ার কথা বলতে তোর মুখখানা ক্ষয়ে যাবে না কি? দেখি, অ্যাই! বাঁশটা নিয়ে আয়। যা ভেতর থেকে লম্বা হাতলের কাটারিটা নিয়ে আয়। হ্যাঁ রে, পায়রা কটা?'

ছেলেটা না-বলি না-বলি করেও মুখ গোঁজ করে বলল, 'চারটে'।

একটা খাঁচার বদলে বুড়ো ছোট ছোট দুটো খাঁচা বানিয়ে দিল। কাজটা করার ফাঁকে একা একাই বলতে থাকল, 'চারটে পায়রা একজন যদি নেয় তো ভালই। কিন্তু ধর কেউ যদি দুটো পায়রা কেনে? সে যদি পায়রা দুটো নেওয়ার জন্য খাঁচাটাও চায়? তাহলে তো তুই মুশকিলে পড়বি! বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত অন্য দুটো পায়রা তুই রাখবি কোথায়।'

অম্বিকা খাঁচা দুটোয় দুটো-দুটো করে পায়রা ভরল। আর দুপুরে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ভাবল দু'মাইল দূরের শহরের বাজারে যেতে হবে। যাওয়ার সময় ছোট ছেলেমেয়ে দুটো কান্না জুড়ল, বড় ছেলেটা কোন কথা না বলে মায়ের সামনে দিয়ে উল্টোমুখে বেরিয়ে গেল। মাঝের দুটো কিছুই হয়নি এমন মুখ করে দাওয়ায় বসে থাকল। কেঁদে চলা ছোটটাকে কোলে নিয়ে, 'ভোলাতে পারিস না' বলে মেজটাকে বকতে গিয়েও অম্বিকা কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল। ওদের সবারই মন খারাপ, এই সময় বকাবকি না করাই ভাল।

একমনে হাঁটতে হাঁটতে অম্বিকা দেড়মাইলটাক গেছে, বড় রাস্তায় পড়ার পর দূরের বাজারটা নজরে আসছে, এমন সময়ে হুস করে যে সামনে উদয় হল সে কালিদাস। পায়রা কটা কাল থেকে এই অল্প আগে সদর দরজা পেরিয়ে আসা অবধি ওকে যত বকিয়েছে তাই যথেষ্ট; অতএব কালিদাসের প্রশ্নের উত্তর দিতে অম্বিকার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছে হল না। তায় আবার কালিদাসের প্রশ্ন।

একটু দূরে গিয়ে কালিদাস একটা বিচিত্র হাসি দিল, তারপর বলল, 'জানি জানি, তুই না বললেও আমি জানি। এগুলো কালকের মিটিঙে ওড়ানো পায়রা, ঠিক কি না?'

অম্বিকা ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ বড় করে কালিদাসের দিকে তাকাল। কালিদাস বলে চলল, 'আমি কাল বুড়োর ওখানে গিয়েছিলাম তো। তোরা তখন শুয়েই পড়েছিলিস বোধ হয়। তখন বুড়োই পায়রার কথা বলল। বলল, ও তো পায়রাগুলো বেচবে। বাজারে যেতে গিয়ে গাঁয়ের কেউ হয়তো চোখ রাঙিয়ে ওগুলোকে মিটিঙের পায়রা বলে ওকে দিগদারি দিতে পারে, সেইজন্য তুই একটু চোখ রাখিস। পারলে বাজার অবধি তুইও যাবি। ওখানেও গাঁয়ের মানুষ ঘুরঘুর করে বেড়ায়; কেউ যদি কোন ছুতো ধরে তুই বুদ্ধি করে ব্যাপারটা সামাল দিতে পারবি। আমি বুড়োর কথায় হুঁ বলে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছি, কিন্তু আজ বাজারে আসব কি আসব না সেই কথা ভাবতে ভাবতেই অন্য একটা কাজে এদিকে আসছিলাম। তা তোর সঙ্গে যখন দেখা হয়েই গেল—চল যাই।'

অম্বিকা সামনের দিকে হাঁটতে লাগল, বিরক্তি আর রাগে তার কপালে ভাঁজ পড়ল। কিছু পরে কালিদাস বলল, 'তুই দেখি কথাই বলছিস না?'

বুড়োর তোকে এত কথা বলার দরকারটা কি ছিল শুনি?' ও খিঁচিয়ে উঠল।

'তুই বুড়োর ওপর রাগ দেখাচ্ছিস কেন? তোর ভালর জন্যই তো বলেছে।'

ইস, কত আমার ভাল রে। অম্বিকা মনে মনে গজরাল। ওর চলার ভঙ্গীতে আরও বিরক্তি ঝরে পড়তে থাকল। কালিদাস বলল,'বুড়ো যা বলেছে ভালই বলেছে, তা আমি এসেছি বলে তুই যদি রাগ করে থাকিস তো বল আমি ফিরে যাচ্ছি।'

এর উত্তরে অম্বিকা কিছু বলল না। সঙ্গে সঙ্গে তার কালিদাসকে ফিরে যেতে বলতেও ভয় হল। পায়রাগুলোকে নিয়ে কি জানি গণ্ডগোল হতেও তো পারে। তার ওপর বুড়োটা কি জন্য কালিদাসকে বারে বারে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় এই চিন্তাটা ওর মাথায় ঘুরতে থাকল।

কালিদাস ওদের গ্রামেরই লোক। নীলকান্ত আর ও একই লোকের ক্ষেত আধিতে নিয়েছিল। ওদের দুজনের খুব ভাব ছিল, বিয়ের পর নীলকান্ত মাঝে মাঝে অম্বিকাকে কথাটা বলত। কালিদাসের মুখেই নীলকান্ত প্রথমে অম্বিকার পরিচয় পেয়েছিল। মা বাপ মরা মেয়ে, মামার ঘরে খেটে খেয়ে বড় হয়েছে, বড় ভাই দুজন ওর খবর যত কম পায় ততই তাদের পক্ষে ভাল। কি করে যেন ভাল লেগে গেল, নীলকান্ত একদিন ওকে বিয়ে করে বসল। বিয়ে মানে দশ পনেরোজন লোককে চা মিষ্টি খাইয়ে নীলকান্ত ওকে নিয়ে গেল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই নীলকান্তকে নিজের ঘর ছাড়তে হল। অম্বিকাদের গ্রামটা ওর পছন্দ হল। দয়ারাম বুড়োকে ও একটু জমির কথা বলতেই সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো জমির সাথে বাগানের বাঁশ, খুঁটির জন্য দুটো সোনারু গাছ আর যা যা দরকার নীলকান্তকে নিতে বলল। অল্পদিনের মধ্যে বুড়ো দয়ারামের উঠোনে ঘর উঠল, সেই ঘরে নীলকান্তদের সংসার বসল। পাঁচটা সন্তানে সেই সংসার ভরে উঠল, তারপর একদিন নীলকান্তর মৃত্যু হল আর সংসারটা অম্বিকার কাছে শূন্য হয়ে গেল।

অম্বিকার বিয়ের আগে কালিদাসের কি একটা কঠিন অসুখ করেছিল। অসুখ সেরে যাওয়ার পরও লোকেরা বলাবলি করত, ওর নাকি মাথার দোষ থেকে গেছে। নীলকান্তর মতে ওর মাথার দোষ-টোষ কিছুই ছিল না, দাদাটা সম্পত্তির লোভে এই সব গুজব ছড়িয়ে একটা ষড়যন্ত্র করেছে। কিছুদিন পর কি হল কে জানে, কালিদাস গাঁ ছেড়ে চলে গেল। একবার খবর এল অনেক দূরের কোন্ এক জায়গায় ও কাঁসা-পেতলের ব্যবসা করে অনেক পয়সা করেছে। এই সময় তাকে জানানো হল তার দাদার সংসার ছারখার হয়ে গেছে। সে এসে এখন ভিটেমাটিটা সামলাক। কালিদাস তখন আসেনি। বছর তিনেক আগে ও গ্রামে ফিরে এল। না, সঙ্গে কেউ ছিল না। বিয়ে-টিয়ে করার সময়ই নাকি পায়নি ও। ওর সময় ছিল কেবল টাকা কামানোর, আর সঙ্গে নাকি এনেও ছিল গুচ্ছের টাকা।

দয়ারাম বুড়োর কাছে বসে সে তার গত বারো বছরের বীরত্বের কাহিনী ফলাও করে বলে। একদিন মনটা বেশ হাল্কা থাকায় অম্বিকা ফট করে বলে

বসেছিল, 'তা তুই যখন এতই বীরপুরুষ তো একটা মেয়ে ধরে আনতে কি হয়েছিল?'

'ও মেয়ে আনতে হলে বুঝি বীর হতে হয়?' কালিদাস যেন খুব আশ্চর্য হল, 'শুনলে খুড়ো ওর কথা? ঘরকুনো লোকগুলোই মেয়েমানুষ ঘরে আনে। বীরেরা অজানা অচেনা ঠাঁই ঘুরে যুদ্ধ বিগ্রহ করে বেড়ায়। কি বল খুড়ো?'

'ও তাহলে বীরপুরুষ এখন ঘরে সেঁধিয়েছে?' হাসতে হাসতে অম্বিকা বলে।

কিন্তু কয়েকদিন পর অম্বিকার হাসি আর রইল না। কালিদাস সেদিন ওর ঘরে বসে গল্প করছিল। ছেলেমেয়েগুলো বিছানায় দাপাচ্ছিল। কুপির নরম আলোয় অম্বিকার মুখখানা বেশ শান্ত আর কোমল দেখাচ্ছিল। ও যেমনই হোক না কেন, মাটি লেপা ঘরের বেড়ায় পড়া ওর ছায়াটা এক সুঠাম যুবতীর ছায়া বলে মনে হচ্ছিল। কালিদাস খানিকক্ষণ ঐ ছায়াটার দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর হাল্কা সুরে হাসতে হাসতে বলেছিল, 'একটা কথা কি তুই জানিস অম্বিকা? আমার মা একদিন আমার জন্য তোকে দেখতে এসেছিল! কিন্তু তুই কি টের পেয়েছিলি না পাসনি?'

কাছাকাছি কোথাও একটা বিকট শব্দ হলে গাছের পাখি যেমন থমকে থাকে, স্তব্ধ হয়ে যেমন ভাবে শব্দটার প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করে, অম্বিকাও ঠিক তেমনি স্থির হয়ে গেল, স্তব্ধ হয়ে কালিদাসের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কালিদাস বোকার মত হেসে যাচ্ছিল। অম্বিকার দৃষ্টিতে ঐ বোকা হাসিটাও এক মুহূর্তের বেশি সহ্য হয়নি। তাম্বুলের খোসা ছাড়ানোর অছিলায় চট করে মুখটা আলোর থেকে ফিরিয়ে নিয়েছিল।

আবার জিগ্যেস করেছিল কালিদাস, 'তুই টের পেয়েছিলি?'

কুপির উল্টোমুখে চেয়ে থেকে উত্তর দিয়েছিল অম্বিকা, 'কি জানি! আমি অত শত জানি না!'

কালিদাস এবার হো হো করে হেসে উঠল, 'তাহলে তুই জানতেই পারিসনি। আসলে মা আমাকেও পাঠিয়েছিল, বুঝলি? যা গে, তুইও দেখে আয়, মা'রও খুব পছন্দ হয়েছিল। তা কি আর করা যাবে, নীলকান্ত সে সময় বলল, অম্বিকাকে আমি বিয়ে করতে চাই! চাই মানে মনে মনে তখন সে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তখন আমি বললাম, ঠিক আছে তাহলে কর বিয়ে।' তারপর কালিদাস হেঁ হেঁ করে একটু হাসল। 'তোকে এসব কথা নীলকান্ত বলেনি বুঝি? ঠিকই তো। বলবেই বা কেন? বলার মত কথা হলে তবেই না বলবে।'

অম্বিকা বলার মত কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। অন্যদিন এ রকম সময় ও কালিদাসকে 'তুই এখন যা, রাত অনেক হল, দেখগে যা ভাত বোধহয় এতক্ষণে কড়কড়ে হয়ে গেছে' সোজাসুজি বলতে পারত; কিন্তু সেদিন ওর পক্ষে কালিদাসকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলার শক্তি লোপ পেল। বিছানায় দাপাদাপি করতে থাকা

ছেলেমেয়েদের লক্ষ্য করে জড়তানম্র কণ্ঠে জিগ্যেস করল, 'তোরা এ রকম চেঁচামেচি করতেই থাকবি না ভাত খাবি?'

ওদের দুজন মা'র প্রশ্নটাকে খেলার অঙ্গ হিসেবে নিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাত খাব ভাত খাব।'

দুজন যা বলে বাকি দুজন তার বিপরীতে কিছু না বললে খেলা জমে না। অতএব বাকি দুজন চেচাঁল, 'খাব না খাব না, চেঁচাব!'

একটু সময় দু'পক্ষের কাদের গলার জোর কত বেশি, কে কত কর্কশ আওয়াজে কথাগুলো বলতে পারে তার পরীক্ষা চলল। এই হট্টগোলের ছুতো ধরে অম্বিকা কালিদাসের কাছ থেকে সরে পড়ল। ও রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল।

অম্বিকার মুখে কথা হারিয়ে যাওয়াটাই যেন সেদিন কালিদাসের কাছে পরম তৃপ্তির কারণ হল। 'এই ছেলেমেয়ের দল, কি এত গণ্ডগোল করছিস? যা যা, চুপচাপ ভাত খেয়ে শুয়ে পড়গে যা।' বলে ও উঠোনে নেমে এসেছিল।

সেই রাতে অম্বিকা পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা শঙ্কিত পাখির মত ছেলেমেয়েদের মাঝে লুকিয়ে কুঁকড়ে শুয়ে রইল।

এরপর বেশ কিছুদিন পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে কালিদাসের সঙ্গে অনেক কথা বলেছে। কিন্তু কোনদিনই কালিদাসের সামনে মন খুলে সহজ হতে পারল না। অনেক দিন ও ভেবেছে, কালিদাসের কথায় কোন প্যাঁচ নেই, ও ওর সামনে আবার সহজ ভাবে দাঁড়াবে, কিন্তু এ রকম ভাবতে না ভাবতেই হঠাৎ কালিদাস এমন একেকটা কথা বলে বসে যে ও বোবা হয়ে যায়। হয়তো বলে বসল, 'দেখ দেখি, আমি একা মানুষ; মাঝরাত্তির অবধি তোর সঙ্গে হাসি মস্করা করি, খুনসুটি করতে থাকি, তুই একদিনের জন্য হলেও বলতে তো পারিস, এই যে ডঙুরা* বাকি দু'পরের জন্য আর ঘরে গিয়ে কাজটা কি? তুই তো বলিসই না, কিন্তু আমি ঘরে গিয়ে কি ভাবি বল তো? ভাবি, ও না হয় নাই বলল, আমিও তো বলতে পারি। বলি, অম্বিকা, আজ আর কি করতেই বা ঘরে যাব? একটা চট দে এখানেই পড়ে থাকি।'

কালিদাস থাকাকালীন বড় ছেলে দুটো ঘুমোতেই চায় না। ওইটুকু সময়কে ও টানতে টানতে রাত্রি দু'প্রহর করে ফেলে। এমন তার কথার তোড়; অম্বিকা দাঁত কামড়ে থাকে, কখনও মনে হয় কাঠ কাঠ দুটো কথা শুনিয়ে ওর মুখ বন্ধ করে দেয়, কিন্তু অধিকাংশ সময় ও লজ্জা ভয়ের তাড়নায় চুপচাপ বসে থাকে।

কখনও অম্বিকার মনে হয়, ওকে একবার জিগ্যেস করব না কি— তুই পরে অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করলি না কেন? কিন্তু চিন্তাটা মাথায় আসার পরমুহূর্তে

---

* 'ডঙ্গুরা' শব্দের অর্থ অবিবাহিত পুরুষ, প্রতিশব্দ হিসাবে 'আইবুড়ো' মানায় না। 'অকৃতদার' অতিরিক্ত সাধু প্রয়োগ বিচারে শব্দটি অপরিবর্তিত রাখা হ'ল।

অম্বিকা জিভকে সংযত করে। না না, এ কথা ওকে জিগ্যেস করা যাবে না। কোথাকার কথা কোথায় নিয়ে যাবে, কথার টানে ওকে নিয়ে কোন্ গাড্ডায় ফেলবে তার ঠিক নেই। যখনই অম্বিকার মনে এ ধরনের সরস হাল্কা চিন্তার উদয় হয়েছে, তখনই দ্বিগুণ সতর্ক হয়ে ও নিজেকে সামলেছে আর ভেবেছে, ও নিজে তো অদরকারি কথার রাস্তা মাড়াবেই না, বরং কালিদাসকে একটু উড়ু উড়ু দেখলে ও ওর পাখাটাও কেটে দেবে। কখনও ও ভাবে একদিন চুটিয়ে গালাগালি করে ওকে সোজা করে দেবে নাকি! কিন্তু ওই কাজটা করতে ওর মন চায় না। অত মুখনাড়া দিয়ে ঝাড়ার মত বিষই নেই লোকটার।

কিন্তু একদিন অম্বিকা মনে মুখে দুয়েতেই কড়া হতে বাধ্য হল। সেদিন বুড়ো দয়ারাম তাকে চালাটার নিচে ডেকে নিয়ে খুব নরম সুরে জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা অম্বিকা, ঐ কালিদাসটা একসন্ধ্যা তোর হাতে খাওয়ার জন্য কি হাঁকপাঁকটাই না করে, তা একদিন ডেকে একটু রেঁধে বেচারিকে খাওয়াতে পারিস না?'

অম্বিকার ধাঁ করে রাগ চড়ে গেল। বলে উঠল, 'নিজেরই আধাপেটা খেয়ে দিন কাটছে, তা খাওয়াব কোন্ গোলা থেকে এনে?'

'কি যে বলিস। জিনিসের জন্য আটকাবে না। লাগ বলতেই মাছ-মাংস ঘি যত যা লাগবে ও-ই এনে হাজির করবে।'

'অ—' । অম্বিকা মুহূর্তে অনেক কথা বুঝে নিল। ভেতরে ভেতরে তাহলে ও অনেক দূর এগিয়েছে। দয়াবুড়োকেও তাহলে অনেক কথা বলা হয়ে গেছে। কি কি যে বলেছে কে জানে।

না না। এ কেবল কথার কথা নয়। অম্বিকা মুখ খুলবে বলেই খুলল, 'এসব কথার মধ্যে তোর থাকার কি দরকার। ওর টাকা আছে, পয়সা আছে, মাছ খাক, মাংস খাক, রাজভোগ খাক, টাউনের হোটেল থেকে খেয়ে আসে না কেন?'

'নাহ্, তুই কথাটা বুঝিসনি', বুড়ো বোঝাতে চায়, 'ও তো হোটেলের রাজভোগ খেতে চায়নি, ও তোর হাতের— '

অম্বিকা বুড়োকে কথা শেষ করতে দিল না। 'ও বুঝুক না বুঝুক তোর তো লজ্জা-শরমের ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল। এখন বুঝতে পারছি তুই-ই লাই দিয়ে দিয়ে ওকে আমার ঘরে ঢুকিয়েছিস। সোজাসুজি আমার ঘরে ঢোকার সাহস ওর হবেই না; এসে তোর ওখানে ঢুকবে, তোর থেকে মন্ত্রণা নেবে নিয়ে কোন একটা ছুতো ধরে সুড়ুৎ করে উঠোন পার হয়ে ভেতরে ঢোকে। তোকে আজ আমি বলে রাখছি, ও এলে ওকেও বলব, আজ থেকে উঠোন পেরিয়ে আমার ঘরের দোরে ও যেন পা না রাখে।'

'শোন শোন, এত রাগিস কেন?' দয়ারাম একটা নিরীহ, শান্ত, মৃদু হাসি দিয়ে কথা কটা বলে।

অম্বিকা আরও গলা চড়িয়ে জিগ্যেস করে, 'ওর হয়ে তোরই বা এত ওকালতি করার দরকারটা কি? আমি একা মেয়েছেলে, আজ ও আমার সঙ্গে মেলামেশা করবে, কাল আমার হাতে এক সাঁঝ ভাত খাবে, পরশু এককোণে একটা চট পেতে শোবে, তারপর চারদিনের মাথায় আমার বুকে এসে—।' উত্তেজনায় কিছুক্ষণের জন্য অম্বিকার গলা বুজে এল। তারপর কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'তারপর আমি এই গ্রামে আর থাকতে পারব?'

খানিকক্ষণ বুড়ো আর অম্বিকা দুজনেই স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর নিচু গলায় ধীরে ধীরে বুড়ো বলতে লাগল, 'অম্বিকা, ওর হয়ে আমার ওকালতি করার কথাটা সত্যি। কেন করি জানিস? তুই তো এতদিন আমার সামনাসামনি থেকে দেখেছিস, আমার টাকা পয়সা ধান চালের অভাব নেই, কিন্তু এর বাইরে আমার আর কিছুই নেই। আমার দিন তো শেষ হয়ে এল, আর শেষমেশ সংসারটা শূন্য হয়েই রইল। সেইজন্য এই পৃথিবীতে যে যা চায় তাকে তা পেতে দেখলে আমার বড় ভাল লাগে। নীলকান্ত এক টুকরো জমি চেয়েছিল, আমি জমির সঙ্গে বাড়িও দিয়েছিলাম। হোক, সংসার একটা হোক। যত দিন যাচ্ছে, যে যা চায়, তাকে তা পেতে দেখলে আজকাল আমার বড় ভাল লাগে। নাহলে আমি আর কি দেখে সুখ পাব? এই কালিদাসটা, এটাও একদিন আমার মত নিঃস্ব রিক্ত হয়ে যাবে। একদিন তোর হাতে একসন্ধ্যা ভাত খেতে চেয়েছে। কি এমন বড় কথা। তুই একটু পেটে ভাতে থাকার জন্য হাবুডুবু খাচ্ছিস, তোর এ কষ্ট যদি দূর হয়, তো দূর হোক, কিন্তু তা আমার চোখের সামনে হোক তবেই আমি সুখী হব।'

একটু থেমে উদাস কণ্ঠে বলতে থাকল, 'আর তুই এই গাঁয়ে থাকার কথা বলছিস? তোকে মনে হয় গ্রামের মানুষ মাথায় করে রেখেছে? না তুই গরীব বলে তোকে দূর ছাই দূর ছাই 'না' করে থাকে? মানুষের একটা গ্রাম চাই, থাকার জন্য জীবনভর কষ্ট ভোগের জন্য নয়।'

অম্বিকা সেদিন আরও ভড়কে গেল। বুড়োর তর্জন গর্জনের বদলে মিঠে সুরের কথাগুলো ওকে আরও সঙ্কুচিত করে তুলল। ওর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল কালিদাসের ওপর। ওর ছায়ার কথা ভেবেও ভয় ধরে গেল অম্বিকার। প্রকারান্তরে ও কালিদাসকে বুঝিয়ে দিল ও যেন অম্বিকার বাড়ির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে।

কালিদাস অম্বিকার ইচ্ছানুযায়ী ওর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করার ভান করল। কিন্তু অম্বিকা একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে খুব মজা পেল। ওর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধের ঘটনাটাকে কালিদাস যেন আরও ভাল একটা খেলা বলেই ধরে নিয়েছে। ওকে না ডেকে বুড়োর ঘরে চলে যাওয়ার কি রসালো ভঙ্গী ওর। কথা বলে না, কিন্তু অম্বিকার চোখে চোখ পড়ে গেলে এমন একখানা হাসি দেয়। অম্বিকা হাসবে না কাঁদবে ঠিক করতে পারে না। একদিন কি ভেবে রেগে জিগ্যেস করল, 'তুই ও

রকম মুখ টিপে টিপে হাসিস কোন্ কম্মে?'

কালিদাস উত্তর দিল, 'তুই আর মন খুলে হাসতে দিস না বলে।' বলেই হো হো করে হেসে উঠল।

এই হল কালিদাস। বঁড়শিতে বেঁধা ঢোঁড়া সাপ। বাজারে যাওয়ার বাকি রাস্তাটুকু কালিদাস অম্বিকার পাশাপাশি হাঁটল, কিন্তু দুজনের মধ্যে কথাবার্তার আদান প্রদান খুব একটা হল না। মাঝে একবার আঁচলটা ঠিক করে নিতে অম্বিকা দুটো খাঁচা একহাতে ধরেছিল, তখন কালিদাস ব্যস্তসমস্ত ভাবে বলেছিল, 'যদি অসুবিধে হয় দে খাঁচা দুটো আমি নিচ্ছি।' অম্বিকা জানাল তার দরকার হবে না।

বাজারে পৌঁছনো মাত্র কালিদাসই আগে-ভাগে কথাবার্তা শুরু করল। এই বাজারে অম্বিকা এর আগেও এসেছে, কিন্তু সে আসে ঢেঁকি, পদিনা, সজনা ডাঁটা, পাকা তাম্বুল, ভতুয়া (রথুয়া) শাক বেচতে, পায়রা বেচতে আসেনি কখনও।

'এই দিকে চলে আয়' বলে কালিদাস বাজারের একটা বিশেষ অঞ্চলের দিকে এগোল। এই দিকটাতে মাছ, পাঁঠা-খাসির মাংস, হাঁস-মুরগি, পায়রা, কাছিম— মোট কথা বিভিন্ন ধরনের মাছ মাংসের বেচাকেনা চলে। কালিদাস চট করে একবার এমাথা থেকে ওমাথা অবধি দেখে নিল।

'আজ তো দেখছি পায়রা আর বসেইনি রে?' কালিদাস বলে। তারপর গলা উঁচিয়ে বারদুয়েক এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার বলল, 'তাহলে আমরা এখানেই বসি।' মুরগির পাশে হাঁস-পায়রা বেচার জায়গা। ওখানে একটা খালি জায়গা দেখে ও অম্বিকাকে কাছে ডাকল।

পাশের শক্তসমর্থ, গোঁফওয়ালা, লুঙ্গি পরা লোকটা আড়চোখে অম্বিকা আর কালিদাসকে বার বার লক্ষ্য করছিল। লোকটা বড় ব্যাপারী। ওর দোকানের একটা চালা আছে। লোকটা নিজে একটা কাঠের চৌকিতে বসে আছে। তার চৌকির চারপাশে ছড়িয়ে আছে অনেকগুলো বড় বড় খাঁচা। কিছু খালি, কিন্তু বেশির ভাগই নানা রঙের, আকৃতির মুরগিতে বোঝাই। কেবল একটা খাঁচায় একটা হাঁস পেট চেপে বসে সম্ভবত ঘুমোচ্ছিল। কালিদাস নতুন জায়গাটা দখল করে নিয়ে পরিচিতের ভঙ্গীতে লোকটাকে বলল, 'তোমার কাছে মনে হচ্ছে পায়রা নেই?'

লোকটা উত্তর দিল, 'না আজ নেই, পরশু এক-কুড়ি পাঁচটা পায়রা, সবটা ধরেই নিয়ে গেল। রোববারে হাটে গিয়ে আবার আনব।'

কালিদাস জিগ্যেস করে, 'এককুড়ি পাঁচটা পায়রা কে নিয়ে গেল হে?'

'ওই কালকের মিটিঙের জন্য ভলান্টিয়াররা। মিটিঙে বলে অনেক পায়রা চাই ওড়ানোর জন্য। আমার কাছে থাকলে আরও নিত।'

'কি দরে বেচলে?' কালিদাস একটুও সময় অপব্যয় না করে মানুষটার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে ব্যস্ত হল। অম্বিকা ভয়ে ভয়ে একবার লোকটার দিকে তাকিয়ে মাথা

নিচু করল। ও পায়রা চারটের সঙ্গে যেন আরেকটা পায়রা সেজে গুটিসুটি হয়ে বসে রইল। গাঁয়ের লোক, ছেলেমেয়ে, খটাশ, শেয়াল সব কিছু পার করে শেষ পর্যন্ত কিনা এই লোকটার কাছে।

'এহ্ দাম পেলাম না— অত বড় বড় পায়রা— এই— এইগুলোর মতই হবে— ওর'ম পায়রা আমরা জোড়া তিন টাকা বেচি। কিন্তু ভলান্টিয়াররা আড়াই টাকা হিসাবে নিল। জোরজার করে ধরল—জনগণের কাজ, মিটিঙের ব্যাপার— দিয়ে দিলাম।'

'আমরাও তাহলে জোড়া আড়াই টাকার নিচে দিচ্ছি না, কি বল?' কালিদাস মাটিতে অম্বিকার পাশে বসে আত্মীয়তার সুরে প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা মহাজন, এট্টা কথা বল তো, মিটিঙে এই পায়রা ওড়ায় কি করতে ?'

ভলান্টিয়াররা যে সব কথা বলে পায়রার দাম কমানোর চেষ্টা করেছিল, মহাজনটি সে কথাগুলোই বিজ্ঞের মত কালিদাসকে আউড়ে গেল। পায়রা বড় ঠাণ্ডা মেজাজের পাখি। এদের থেকে মানুষের খুব মঙ্গল হয়। শান্তি লাভ হয়। দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য শান্তির জন্য এই পায়রা উড়িয়ে দেওয়া হয়। পুজোয় ফুল প্রসাদ বলি ইত্যাদি দিলে যেমন দেবী তুষ্ট হন, তেমনই মিটিং-এ পায়রা ওড়ালে লোকের শান্তি আসে, মানুষের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

ভলান্টিয়াররা আরও অনেক কিছু বলেছিল। যে জায়গার ওপর দিয়ে এই পায়রা উড়ে যাবে সে জায়গার অবস্থা ফিরে যাবে। তোমার দোকানের ওপর দিয়ে যদি কোন রকমে একটা পায়রা উড়ে যায় ব্যস— তাহলে আর দেখতে হবে না— তোমাকে আর পায় কে।

অম্বিকার দিকে মুখটা ফিরিয়ে খাটো গলায় কালিদাস বলল, 'শুনলি? ওপর দিয়ে উড়ে গেলেই নিচে মানুষের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়, শান্তি হয়, মঙ্গল হয়। আর ওরা তো ধরা দিল! এবার তোর সুখ হওয়া উচিত, মনের ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া উচিত। তোরই বা মনোবাঞ্ছা কি ছিল?'

অনেকক্ষণ জবুথবু, নির্বাক বসে থেকে অম্বিকার ভারি অস্বস্তি হচ্ছিল। এই বেলা দু-চারটে কথা বলে হাল্কা হতে ইচ্ছে করল। সে নীরস কণ্ঠে বলল, 'আমার আবার কি মনোবাঞ্ছা থাকবে! ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে দুবেলা দুমুঠো পেট পুরে খেতে পারলেই হল।'

'দুবেলা দুমুঠো খাওয়ার চিন্তা তোর যে কেন আসে আমি সেটাই বুঝতে পারি না।' কথাগুলো বলে কালিদাস অম্বিকার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। সেই চাউনিতে অম্বিকার মনটা চঞ্চল হয়।

আস্তে আস্তে বাজারটাতে জনসমাগম বাড়তে থাকে। গাঁয়ের কোন চেনা মানুষ এদিকে আসছে কি না কালিদাস সেদিকে লক্ষ্য রাখে। পাশের মহাজনের কানের

কাছে কেউ যদি পায়রাগুলো নিয়ে কালিদাস বা অম্বিকার সঙ্গে আলাপ করে তাহলে বিপদ আছে। নাহ্, সে রকম লোক কেউ আসেনি। সবই অচেনা লোক। লোকগুলো পাঁঠা-খাসির দোকান থেকে এন্তার মাংস কিনছে। কালিদাস যখন এসেছিল, তখন তিনটে খাসি আস্ত অটুট ঝুলছিল। দেখতে দেখতে তাদের একটা হাওয়া হয়ে গেল। তার বদলে শুধু একটুকরো দড়ি ঝুলছে। মাংস কিনে নিয়েই লোকগুলো সামনের দোকানগুলো থেকে আলু কিনছে, পেঁয়াজ কিনছে, সম্ভবত গরম মশলাও কিনছে। তমাল* দিয়ে বেঁধে একটা বড় রুই মাছ ঝুলিয়ে নিয়ে একজন লোক মহাজনের সঙ্গে মুরগি দর করছে। কিছুক্ষণ এ সমস্ত কাণ্ডকারখানার দিকে তাকিয়ে থেকে কালিদাস অম্বিকাকে জিজ্ঞেস করে, 'কি অম্বিকা, তোর জিভের জল গড়াচ্ছে নাকি?'

অম্বিকা প্রথম দিকে কোনও উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কালিদাস আবার বলে, 'মুখ লুকিয়ে থুতু গিলছিস না কি?'

অম্বিকা এবার জবাব দিল, 'জিভের জল থাকলে তো পড়বে। ও কবে শুকিয়ে গেছে!'

'মিছে কথা বলিসনে, দামড়া দুধ ছাড়লে গরুর দুধ বেরোয় না। তা বলে কি গরুর দুধ সত্যিই শুকিয়ে যায় বলবি। আবার একটা দামড়া—আবার দুধ। আজ তুই জুত করে এক সন্ধ্যা মাংসভাত খেয়ে দেখ, দেখবি কাল মাংসের নামে তোর জিভ দিয়ে সরসরিয়ে জল গড়াবে। এ শুকিয়ে যাওয়ার জিনিস নয় রে, এ শরীরের মধ্যে পথ চেয়ে বসে থাকা জিনিস। বুইচিস?'

অম্বিকা বোঝা না বোঝার কোন লক্ষণ দেখাল না, কেবল গায়ের ওপর চাদরের আঁচলটা আরও ভাল করে টেনেটুনে ঠিক করে নিল।

কয়েকজন মিলিটারি, মহাজনের দোকানে মুরগি কিনতে এসে হুলুস্থুল শুরু করে দিল। খাঁচার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ওরা মুরগিগুলোর বুকের পেটের বেড় মাংসের পরিমাণ আন্দাজ করার চেষ্টা করল। দরদাম নিয়ে হৈ হল্লা করল। বাটখারার বদলে পাথর দেখে বাছাই মোরগগুলো ওজন করার সময় একপ্রস্থ তর্ক করল। ওদের থেকে দুজন আবার অম্বিকাদের সামনে এসে খাঁচা দুটো তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পায়রাগুলোকে দেখতে লাগল।

'যা বলতে হয় তুইই বলবি' বলে অম্বিকা অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। কালিদাসকেও অবশ্য কিছু বলে দিতে হল না। একটু পরে খাঁচা দুটো আগের জায়গায় নামিয়ে রেখে ওরা চলে গেল। কালিদাস চাপাস্বরে বলে ওঠে, 'ওরা পায়রা কিনতে এসেছিল না ছাই। ওরা তোকে দেখতে এসেছিল।'

"তমাল" বাঁশ ছুলে সরু সরু দড়ির মত ব্যবহার করা হয়।

অম্বিকার কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। কালিদাস হেঁ হেঁ করে হাসে। লজ্জায় লাল হয়ে যাওয়া মুখটা কালিদাসের দিকে ফিরিয়ে অম্বিকা যেন জোর করেই শব্দ কটা উচ্চারণ করল, 'আমার মধ্যে কি এমন দেখার আছে?'

'তোর মধ্যে দেখার কি আছে সেটা তুই জানিস বা না জানিস কিংবা জেনেও না জানার ভান করে থাকিস কি না সেটা তোর কথা। কিন্তু আমরা যেটা জানি, তা জানিই। আর আমাদের জানাটাই খাঁটি সত্যি।' কালিদাস অম্বিকার চোখের দিকে তাকাল। ওর চোখ দুটো চঞ্চল হয়ে উঠল। অম্বিকা যেন ওর সমস্ত দেহমনে কালিদাসের দৃষ্টির সেই উত্তাপ অনুভব করতে পারল।

সময় বয়ে চলল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে এল। যে দোকানদারদের হ্যাজাক আছে, তাদের কেউ কেউ এখানে ওখানে লাইট জ্বালাতে বসে গেল। যে বাতি আর কিছুক্ষণ পর স্থির আলোতে উজ্জ্বল হবে তাতে আপাতত ছেঁড়া কাপড় স্পিরিটের সাহায্যে দপদপ করে ক্ষীণ আগুন হয়ে জ্বলছে।

অম্বিকা চিন্তিত হচ্ছিল। কিছু খদ্দের জোড়া দু'টাকা করে দিতে চেয়েছিল, তাদের কাছে পায়রাগুলো বেচে দিলেই ভাল ছিল। মহাজনের কথা শুনে কালিদাসই আড়াই টাকা দাম ধরে বসে আছে। কিন্তু এদিকে যে সন্ধ্যা হয়ে গেল। একজোড়া পায়রা রাগে গরগর করে খাঁচাটার ভেতর ঘুরতে ঘুরতে চাঞ্চল্য প্রকাশ করল। দেখতে পেয়ে অম্বিকা বলল, 'ওদেরও ক্ষিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে।'

কালিদাসের জিভে যেন আজ রস ভর করেছে। বলে উঠল, 'ক্ষিদে নয় রে। তুই দেখিসনি বোধহয়, ওই খাঁচার পায়রা জোড়া মাদী। এই খাঁচাটার একটা মর্দা, একটা মাদী। খাঁচার ভেতরেই থাক আর বাজারেই থাক ওরা এ দুজনকে চিনতে পেরেছে।'

অম্বিকা একবার জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিয়ে বলল, 'এত বেলা হল, এ কটাকে বেচতে না পারলে তো মুশকিলই হবে।'

'বেচা যাবে না কেন? খুব যাবে। পায়রার মাংসের মহিমা বোঝা খদ্দের আসবেই দু-একজন। তুই একটা কথা জানিস অম্বিকা?'

কালিদাস অম্বিকার চোখে চোখ রাখল। 'পায়রার মাংস খুব গরম জিনিস।' তারপর একমুহূর্ত থেমে কালিদাস গলায় একটা বিচিত্র সুর ফুটিয়ে বলল, 'পায়রার মাংস খেয়ে তার ধক একা সহ্য করাই মুশকিল।'

অম্বিকার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোল না। কি যেন ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। ওর সমস্ত দেহে ও এক আশ্চর্য ধরনের শিহরণ, চাঞ্চল্য বোধ করতে লাগল। সাপে পেঁচিয়ে ধরলে এ রকম হয় নাকি? কিন্তু কই?' ওর তো তেমন ভয় লাগছে না। সাপের শিরশিরে ঠাণ্ডা স্পর্শে তো ওর শরীর শিউরে উঠছে না। বরঞ্চ ও তার বদলে একটা উষ্ণ উত্তাপ টের পাচ্ছে। পায়রার মাংসর উত্তাপের কথা শুনেই কি ওর এমনটা হল?

খানিক চুপ থেকে কালিদাস বলে, 'আমি একটা কথা ভাবছি অম্বিকা। পায়রাগুলো আমিই কিনি। আলু, পেঁয়াজ, গরম মশলা যা যত লাগে তাও কিনি। তোর বাড়িতে আজ একসন্ধ্যা ভাল করে খাইয়ে দে।'

এমন সময় বাজারটার মাছ-মাংস বিক্রির ওখানে বুকে রঙিন ব্যাজধারী কয়েকটি তরুণ বয়সের ছেলেমেয়ে হাজির হল। উচ্ছ্বসিত আনন্দে চেঁচামেচি করতে করতে ওরা মাছ কিনল সব্জি কিনল, তারপর পাঁঠার মাংসের দোকানে দল বেঁধে হাজির হল। ওদের দেখে কালিদাসের খুব কৌতূহল হল। সে একবার উঠে ওদের কাছে গিয়ে আবার ফিরে এল। ও যে খবরটা নিয়ে এল তার মর্মার্থ— ছেলেমেয়েগুলো সব গত মিটিঙের ভলান্টিয়ার। মিটিঙের পর ওরা আজ মহানন্দে খাওয়া দাওয়া করবে। খাওয়া দাওয়া করে গায়ে শক্তি বাড়িয়ে কালকে চন্দ্রপুরের লোকেরা কি ভাবে মিটিং করে দেখে নেবে।

নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় খবরটা দিয়ে ও খাটো গলায় প্রশ্ন করল, 'তুই কি ঠিক করলি অম্বিকা? চল, খাই একবেলা। এত মুরগি এত পাঁঠা খাসি এত মাছ বাজারটার সব শেষ হয়ে গেল। এত লোক ভোজ খায়, আমাদের কি একটা দিনও ভোজ খাওয়ার ক্ষমতা নেই? বল খাই, কি রে? অম্বিকা! চল খাই। স্বাদটা চেখে দ্যাখ।'

ইতিমধ্যে দোকানে দোকানে বাতি জ্বলেছে। দূর থেকে প্রদীপগুলো মিটমিট করছে। অম্বিকাদের আশেপাশের কুপিগুলো হাল্কা বাতাসে অস্থির হয়ে কাঁপছিল। মুরগির দোকানের মহাজনের হ্যাজাকের আলোয় কালিদাসের মুখটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তার চোখ দুটোও চকচক করছিল। পায়রাগুলো একটা আরেকটার গায়ে লেগে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। অম্বিকার মুখে ভাল করে আলো পড়েনি। ওর কপাল গলা ঘাড় ঘেমে চলছিল।

'তাহলে এ কথাই রইল। তুই একটু বোস। আমি এখুনি আসছি' বলে কালিদাস আলু, পেঁয়াজ, গরম মশলা আনতে চলে গেল। যাওয়ার সময় সে খাঁচা দুটো উঠিয়ে নিয়ে অম্বিকার পিছনে রেখে গেল।

মুখটা আর ঘাড়টা চাদরের কোণা দিয়ে মুছে নিয়ে অম্বিকা একটু নড়েচড়ে বসার চেষ্টা করল। নড়াচড়া করতেই অম্বিকার দেহের বিভিন্ন অংশে অনেকটা করে মাংস যেন নড়েচড়ে উঠল। অর্ধেকের বেশি জল ভর্তি কলসীকে নাড়ালে যেমন হয়, ওর শরীরেও তেমনি এক রকমের ঝাঁকুনি লাগল যেন। ওর শরীরে এত মাংস আছে ও যেন এতদিন খেয়ালই করেনি।

একটু আগে যেখানে পায়রাগুলো রাখা ছিল ও সেই জায়গাটার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল। তবে তাই হোক। হুঁ? হোক। শঙ্খ-ঘণ্টা-উলুধ্বনির মাঝে আকাশ থেকে নেমে আসা পায়রা কটা যদি একটু সুখ দিতে পারে— ।

ঠিক এই সময় চারটে তরুণ ছেলে উর্ধ্বশ্বাসে ওখানে উপস্থিত হল।

পায়রা! পায়রা কোথায়? কি? নেই পায়রা? সর্বনাশ! পায়রা না হলে তো চলবেই না। পঁচিশটা না হয় অন্তত কুড়িটা, পনের দশ যাহোক। কটা আছে এখানে? চারটে? ওরা মিটিঙের ভলান্টিয়ার। এদের বুকের ব্যাজের রং আলাদা। এরা চন্দ্রপুরের মিটিঙের ভলান্টিয়ার। আগামী কাল মিটিং। মিটিঙে ওড়ানোর জন্য পায়রা চাই।

'এই চারটে নিই, তারপর ওই বাজারে গিয়ে দেখি, না পেলে এই চারটে দিয়েই কাজ চালাতে হবে।'— ওদের একজন বলল।

অম্বিকা ঘন ঘন থুতু গিলল। ও অসহায় দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে অনেকগুলো চিন্তার সঙ্গে ও যুদ্ধ করল। তারপর কুণ্ঠিত স্বরে বলে উঠল, 'একজন লোক এই পায়রাগুলো কিনবে বলে রেখে গেছে। আপনারা গ্রামে খুঁজে দেখলেই পায়রা পেয়ে যাবেন।'

'এহ্ কক্ষনো না; গ্রামের যে ঘর থেকে পায়রা আনবে মিটিঙের পর পায়রা আবার ঐ বাড়িতেই ফিরে যাবে। ওরকম পায়রায় আমাদের দরকার নেই। দাও। কত নেবে বল। যে লোকটা তোমাকে কিনবে বলে বলে গেছে তাকে বুঝিয়ে বোলো—পায়রা কটা মিটিঙের কাজে লাগবে, জনগণের কাজে লাগবে, শান্তির জন্য, মানুষের মঙ্গলের জন্য লাগবে। বোঝালেই সে বুঝবে।'

দেহের সমস্ত রক্ত যেন অম্বিকার মাথায় উঠে এল। তার ঘাড়-মুখ আবার ঘেমে উঠল। দেহমনের সমস্ত শক্তি নিয়ে সে যেন কোন এক অশরীরী শক্তির সঙ্গে প্রবল বাক-বিতণ্ডায় রত হল।

'বল কত দেব?'

অম্বিকা কাতর দৃষ্টিতে ছেলেটার মুখের দিকে চাইল।

'হুঁ? কত দেব?'

অম্বিকা একবার থুথু গিলে অস্ফুট কণ্ঠে জানাল, 'জোড়া দু'টাকা'। চাদরের কোণাটা দিয়ে ও আরেকবার ঘাড়-মুখ মুছে নিল।

মুক্তিস্নান

বিয়ের পরে এই মেখলাটা চন্দ্রা পরেইনি; আজ বিকেলে বাক্স খুলে হঠাৎ ওটাতেই হাত পড়ল। তাই দু ঘণ্টার জন্য ওটা পরে ফেলেছিল। ধুতেও হয় না, ইস্ত্রিও করতে হয় না, কেবল আগের ভাঁজে ভাঁজে গুটিয়ে রাখলেই হল।

আলনাটার সামনে দাঁড়িয়ে চন্দ্রা সাবধানে কোণায় কোণায় মিলিয়ে মেখলাটা ভাঁজ করছিল। কাছাকাছি দু-একটা পূজো দেখে আসি বলে, ফিরে আসতে যে দেরি হয়েছে সেটা ও চৌকাঠে পা দিয়ে ধুনোর গন্ধ পেয়েই বুঝতে পেয়েছিল। কাজের ছোকরা নন্দী, কেউ না বলে দিলে সন্ধেবেলায় উপযাচক হয়ে ধুনো দেবে না, এটা জানা কথা। কাজটা হয় তিলক নিজে করছে, নয়তো হুকুম দিয়ে নন্দীকে দিয়ে করাচ্ছে। আর চন্দ্রার ভাগের কাজ তিলকের করাটা ভেতরে ভেতরে রেগে থাকার চিহ্ন। এই জন্য চন্দ্রা আর কোথাও দাঁড়ালই না; দরজা থেকে সোজা আলনার কাছে হাজির হল। রাঁধা-বাড়ার উপযোগী কি না, না ভেবেই সামনে যে কাপড়টা পেল তাই পরে নিল। ব্লাউজটা খুলে রাখতে হয় তাই রাখল। খুলে রাখা চাদরটা আলনার ওপরের থাকে রেখে দিল। যদিও একটা কোণ মাটিতে পড়ে থাকল। কেবল মেখলাটার ভাঁজটা সযত্নে মেলাতে লাগল। বিয়ের পর আজই এই মেখলাটা পরেছিল, তাও মাত্র দু ঘণ্টার জন্য।

ধুনো তিলক নিজেই জ্বালিয়েছিল। এর মধ্যে মালসাটায় ও দুবার আংরা দিয়েছে এবং পাঁচবার নতুন করে ধুনো দিয়েছে, গোটা বাড়িটা বার তিনেক পাক দিয়েছে। তবুও মশার গুনগুনানি আর কমেই না। মশা থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা প্রতিটি জায়গায় সে ধুঁয়ো দিল। হাঁটু গেড়ে খাটের নিচে ঢুকল, টুলের ওপরে উঠে বাবার ফটোটার পিছনে ধুনুচিটা গুঁজে দিল, টাঙিয়ে রাখা ক্যালেন্ডার কটা বাঁহাত দিয়ে নাড়িয়ে দিল। তারপর আলনার কাপড়গুলোর ভেতর মশা থাকে ভেবে যখন সে ভেতরের ঘরে এলো, তখন চন্দ্রা মেখলাটা পাট করছে।

চন্দ্রার দিকে একবার তাকিয়ে ঝুলে থাকা কোটটার নিচে ধুনুচিটাকে ধরে

নিয়ে জিগ্যেস করল, 'অনেক দূর গিয়েছিলে নাকি?'

নিমেষে চন্দ্রার বুকটা হাল্কা হয়ে গেল। ও যেমন ভেবেছিল তিলকের কণ্ঠস্বরে সেই গাম্ভীর্য একটুও ছিল না। মনটা তার এমন হাল্কা লাগল যে উত্তর দিতে গিয়ে কথা হারিয়ে গেল। বলল, 'এতদূরে যাবার কথা আমি ভাবিইনি। পরে এটা ওটা দেখতে দেখতে একেবারে মারোয়াড়ি পূজোর ওখানে পৌঁছে গেলাম।'

তিলক বলল, 'আমি আগেই জানতাম। যাদের সঙ্গে গিয়েছ।' লাবণ্যর বৌদি, রীণা— এরা বেড়াতে পেলে এদের আর কিছু লাগে না বলে তিলকের ধারণা।

চন্দ্রা হাসল। হেসেই বলল, 'না লাবণ্যদের জন্য দেরি হয়নি। আমিই এক জায়গায় দেরি করে ফেললাম। ও, আমি আজ একটা কি কাণ্ড করেছি জানেন? লাবণ্যরা তো তাই নিয়ে আমাকে সারা রাস্তা ঠাট্টা করতে করতে এল।'

তিলক একটা কৌতুকের ইঙ্গিত পেল। জিগ্যেস করল, 'আমাকে বাড়িতে চৌকিদার করে রেখে গিয়েছ বলেছ না কি!'

'না না শুনুন না, কথাটা হল কি, বারে বারে জিগ্যেস করা সত্ত্বেও আমি আপনার নাম কিছুতেই মুখে আনতে পারলাম না।'

তিলক এবার হেসে ফেলল। প্রশ্ন করল, 'কেন? আমার নামটা মুখে আনার ব্যাপার এল কি করে? কেউ জিগ্যেস করেছিল না কি?'

'মানে হল কি, আমি মারোয়াড়ি মন্দিরে ঠাকুর প্রণাম করে উঠেছি, তেমন সময় মনটা কেমন থাকে না বলুন। আমাদের মত কত লোক প্রণাম করছে, কারো কারো স্বামীরাও তাদের সঙ্গে প্রণাম করছে। মনটা কি যে ভাল লাগে। সে সময় দেবীর সামনে আপনার নামটা মুখে আনতে খারাপ লাগল, বুঝলেন?'

একদমে না থেমে কলকল করে কথা বলে যাওয়া চন্দ্রার অভ্যাস। একটুও চেষ্টা না করে ও শ্রুতিমধুর কথা বলতে পারে। তৃপ্তিতে তিলকের সমস্ত মুখে ছেয়ে থাকা হাসিটা এবার প্রকট হল। হাসির রেশটা ঠোঁটের কোণে লেগে রইল। ও-ই যেন মেয়ে, লজ্জা যেন ও-ই পেলো।

এক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে ও আবার জিগ্যেস করল, 'কে জিগ্যেস করেছিল আমার কথা?'

চন্দ্রা মেখলাটাকে গুটিয়ে গুটিয়ে এক বিঘৎ চওড়া তিন হাত লম্বা করে ফেলেছিল। তারই এক মাথা থুতনি দিয়ে চেপে ধরে বুকের ওপর দুটো হাত বুলিয়ে ও মেখলাটাকে পাট করছিল। মাথা নিচু করেই বলল, 'প্রভাতদা জিগ্যেস করেছিল। বহুদিন বাদে আজ ওর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। আমার খবর কিছুই জানেন না। জিগ্যেস করলেন; বললাম। আপনার নামটা কিন্তু বলিনি, বলতে পারলাম না।'

'কোন্ প্রভাতদা?' তিলক জানতে চায়।

'আপনি চিনবেন না। প্রভাত কাকতী। আমাদের বাড়ির কাছে থেকে কলেজে

পড়তেন। বড় ভাল ছিলেন। আমার পরীক্ষার সময় নোট-টোট দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। নোটগুলো না দিলে কি জানি আমি হয়তো পাসই করতে পারতাম না। আমাদের ভাইবোনদের সবাইকে খুব ভালবাসতেন। বেশ কয়েক বছর আগে উনি ওখান থেকে চলে এসেছেন। তারপর আর কোন খবরই ছিল না। আজ হঠাৎ করেই দেখা হল। আমার বিয়ের কথা শুনে প্রভাতদার কি হাসি! আপনার নাম আর বাড়ির ঠিকানা খুব জানতে চাইছিলেন। তাই নিয়ে লাবণ্যরা সারাটা রাস্তা ঠাট্টা করল, বলে 'এত ভক্তি না কি?' চন্দ্রা যেন বলতেই থাকবে। সরল উচ্ছ্বাসের মুহূর্তে ও প্রায়ই বাচ্ছা মেয়ের মত হয়ে যায়। কিন্তু তিলকের চাপা কণ্ঠের প্রশ্নে ওর হাসি, উচ্ছ্বাস— সব এক লহমায় শেষ হয়ে গেল। লম্বালম্বি করে দুভাঁজ করার জন্য তলপেটের ওপর হাত রেখে থুতনি থেকে মেখলাটা ছেড়ে দিল। ওপর দিকের ভাঁজগুলো একটু খুলে গেল।

তিলক কিছুক্ষণ আগেই মালসাটার আংরাতে ফুঁ দেওয়া বন্ধ করেছিল। ফুঁ দেওয়ার জন্য ধুনুচিটা মুখের যতটা কাছে আনা দরকার ছিল, ফুঁ বন্ধ করার পরেও অজ্ঞাতসারে ততটা উপরেই ধরেছিল। সে অতি উৎসুক হয়ে চন্দ্রার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, 'কোন্ প্রভাত কাকতী? বাড়িটা কোথায় বল তো?'

তিলকের চোখের দিকে চাইতেই চন্দ্রার বুকটা ঢিবঢিব করে উঠল। চেষ্টা করেও ও ওর কিছুক্ষণ আগের উজ্জ্বলতাটা ফিরিয়ে আনতে পারল না। ও বলল, 'ডিব্রুগড়ে, কেন?'

'ডিব্রুগড়ে?' তিলক সঙ্গে সঙ্গে চাপাস্বরে গর্জে উঠল। মুহূর্তের জন্য ঘরের মধ্যে দুটো প্রাণী কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর কোন মতে আংরা সামলে ধুনুচিটা নিয়ে তিলক নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

তিলকের হ্যাঁটাটাই যেন চন্দ্রার সম্বিৎ ফেরাল, তিলক যখন দরজার কাছে, তখন সে প্রশ্ন করল, 'কেন কি হয়েছে বলুন তো?'

ও ঘর থেকে একটা জড়তাগ্রস্ত গোঙানি শোনা গেল, 'না না, কিছু হয়নি।'

অনেক কিছুই ঘটল। চন্দ্রার চিন্তার খেই হারিয়ে গেল। কি যে হল সে কিছুই বুঝতে পারল না। প্রথমবার ঢিবঢিব করার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে যে খিঁচটা লেগেছিল তার কোনও নিরসন হল না। নন্দী ইতিমধ্যে বারদুয়েক দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করেছে, 'দিদিমণি, ক'বাটি চাল নেব?' চন্দ্রার খেয়ালই নেই। তিন বারের বার কথাটা তার কানে গেল এবং তার উত্তর শুনে নন্দী ঘাবড়ে গেল।

'সব সময় যা নিস তাই নে। কি অত জিগ্যেস করছিস?'

জিগ্যেস করার ব্যাপারে নন্দীর দোষ নেই। মেঝেতে তেল পড়া, বাঁ হাতের তালু চুলকোনো, নির্দিষ্ট সংখ্যক শালিক পাখি দেখা ইত্যাদি চন্দ্রার এমন কিছু লক্ষণ আছে যার থেকে সে আগাম অতিথি আগমনের খবর পায়, ফলে নন্দীকে একবাটি

চাল বেশি নিতে বলে আর প্রায়ই 'তার অনুমানের হাতে-নাতে ফল' বলে দাবি জানায়। লক্ষণ দেখে আগে থেকেই অতিথির জন্য ভাত রেঁধে রাখার অভ্যাসের জন্যই নন্দী রোজ ক'বাটি নেবে জিগ্যেস করে থাকে। আজ অপরাধীর মত মুখ নিয়ে সরে পড়ল। কিছুই বুঝতে পারল না।

তিলকের মনের অবস্থা বোঝা-না বোঝার বাইরে চলে গেল। ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর তার শরীরের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেল; মাথাটা যেন পাক খাচ্ছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্ধকার ঘুপচিতে সামনের বারান্দার আরামকেদারটায় বসে পড়ল।

কিছুদিন আগে আমলাপট্টির মোড়ে সে প্রভাতের দেখা পেয়েছিল। অনেক দিন বাদে দেখা। কলেজের প্রথম দুটো বছর যে ক'জন 'ওস্তাদ' ছেলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল প্রভাত তাদেরই একজন। সেই বয়সে প্রভাতরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা দিত, সে রকম দুঃসাহসিক ঘটনাবলীর কথা তিলকদের চিন্তার চার-দেয়ালের বাইরে, কিন্তু ওরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করত, শুনতে ভাল লাগত। কিন্তু বন্ধু হিসাবে প্রভাত তিলকদের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল। অনেক দিন পর তিলক প্রভাতকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'কি প্রভাত, কি খবর, কোত্থেকে, আজকাল কোথায় থাকিস, কি করিস?' ইত্যাদি গুচ্ছের প্রশ্নে সে তাকে ঢেকে দিল। প্রথমে ওর ডান হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে পরে ওর কাঁধে হাত রাখল।

প্রভাতও যথেষ্ট আনন্দিত হয়েছিল। ও একটা একটা করে তিলকের প্রশ্নের উত্তর দিল। কোনমতে ডিগ্রিটা নিয়েছে। বাবা জোর করে একটা বাগানের কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, ভাল না লাগায় একরকম ছেড়েই দিয়েছে। একটা সাহেবি কোম্পানিতে চাকরি হওয়ার একটু আশা আছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টারের সঙ্গে বাগানের ম্যানেজারের মারফত দেখা করেছে; এখন কলকাতার ইন্টারভিউটা ভাল হলেই হয়। এই জন্যই সে এখন কলকাতার পথে। সেই আগের প্রভাত, পেটে কোন কথা থাকে না, গলগলা।

কথা বলতে বলতে ওরা অনেকটা দূর এগিয়ে গেছে। একবার তিলক একটু হেসে জিগ্যেস করল, 'অনেক জায়গা তো ঘুরলি, এক্সপেরিয়েন্স বেড়েছে কি? একটু ফুর্তি টুর্তি— '

'অনেক অনেক, আমাকে তো তোরা জানিসই, এনজয় করার তালেই থাকি, আর করিও। আমার ওসব ভণ্ডামি নেই। তবে জোরহাটে গিয়ে আমি লোকটা চেঞ্জড্ হয়ে গিয়েছিলাম, বুঝলি। আমার মত হৃদয়ের লোক কখনো সেন্টিমেন্টাল হতে পারে তোরা ভাবতে পারিস?'

পারে না। সেইজন্য তিলক তার কথা শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করল। তায় আবার জোরহাটের কথা, ব্যক্তিগত আগ্রহও আছে। প্রভাত যে সুরে শুরু করেছে

তাতে একটা রসালো কাহিনী শোনার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আর প্রভাতের যা স্বভাব তাতে করে সংক্ষেপে কিছু বলবে, আশা করা যায় না। একটা তাম্বুল খেয়ে নেওয়া ভাল। তিলক দুটো তাম্বুল কিনল।

দুজনেই এগোচ্ছে। প্রভাত বলে চলেছে। জোরহাটে একজনের বাড়ির এলাকার মধ্যে থাকা একটা ছোট্ট ঘরে থেকে প্রভাত বি.এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। ঘরটা আগে কোন এক বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের কার্যালয় ছিল। কার্যালয় উঠিয়ে দিয়ে মালিক প্রভাতকে ঘরটা দিল। একাচোরা কলেজের ছাত্র, কোন চেঁচামেচি হৈ চৈ নেই, ভাড়া দু' পয়সা কম হয় সেও ভাল। প্রথম কদিন ওর নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গেল। সে ছোট ঘরটায় তার নিজের মত থাকে, দুটো ভলি কোর্টের মাপের খোলা মাঠ পার করে মালিকের প্রকাণ্ড বাড়ি, সেখানে বাড়ির মালিক তার মত থাকে। কিন্তু বাড়ির গৃহিণী তাকে একদিন ডেকে নিয়ে বারান্দায় বসিয়ে চা খাওয়ালেন।

পানের পিক ফেলতে তিলক একবার রাস্তার পাশের ড্রেনের কাছে গিয়ে আবার ফিরে এল। এটা প্রভাতের কপালের দোষ না গুণ সে বলতে পারে না, কিন্তু যে জন্য ও হস্টেলে থেকে পাশ করতে পারল না; আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে থেকেও যে কারণে পরীক্ষা দিতে রাজি হল না, ওকে হস্টেলে খাওয়া, ঝুপড়িতে থাকা, ঘর ঝাঁট দেওয়া পর্যন্ত করতে হল, সেই কারণটাই ওর পিছু ছাড়ল না। প্রথম দিন বারান্দায় বসে চা খেতে গিয়েই ও বাড়িওলার মেয়েকে খোলা দরজা দিয়ে এদিক থেকে ওদিক যেতে দেখল।

একান্তভাবে নারীকে কাছে পাওয়ার সঙ্গে সমাজ, চরিত্র, নৈতিকতার কি সম্বন্ধ আছে তা ভেবে দেখার কোন অভ্যাস প্রভাতের ছিল না, কিন্তু পরীক্ষাটা পাশ করার জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকারের কথাটা সে কিছুদিন ধরে ভেবে চলেছিল। সেই জন্যই বোধ করি চা খেয়ে নিজের ঘরে এসে সে এদিক থেকে ওদিক পার হতে দেখা মেয়েটার কথা ভাবল— বেশ দেখতে ! — কিন্তু — 'না না, এ সমস্ত বাদ' ভেবে সেদিন সে পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে এই প্রতিজ্ঞায় আরও দৃঢ়বদ্ধ হল।

'কিন্তু বুঝলি তিলক', প্রভাত বলে গেল, 'মেয়ে জাতটার ওপর আমার ধারণা খুব সস্তা টাইপের। আমার স্বাস্থ্য এবং চেহারা আমাকে কতটা সাহায্য করে আমি বলতে পারব না। কিন্তু আমি কোথাও হার মানিনি। কোথাও হয়তো দশটা সিনেমার টিকিটের পয়সা খসেছে, কোথাও খুব কষ্ট করে সাহিত্য-সঙ্গীত-আর্ট-পলিটিক্সের আলোচনা করতে হয়েছে; কিন্তু তাই বলে কোথাও আমি হেরে যাইনি'।

তিলক হো হো করে হেসে উঠল। ওর মুখ থেকে তাম্বুলের টুকরো ছিটকে পড়ল।

'তুই হাসছিস? হাস। দিনে আঠারো ঘণ্টা পড়া বুদ্ধু— তুই কি বুঝবি?

একেকটা মেয়ের সঙ্গে আমি যত সহজে অন্তরঙ্গ হয়েছি, তত সহজেই তাদের কাছ থেকে সরেও এসেছি। 'কি করলে তুমি প্রভাতদা, আমার কি হবে'; বলে ফুঁপিয়ে কাঁদা মেয়েকেও দু'মাস পরে রাস্তায় দেখা পেয়ে 'ভুলেই গেছেন, তাই না?' বলে নীরব নিমন্ত্রণ পাঠাতে আমি দেখেছি। —আচ্ছা এ সব বাদ দে। কিন্তু সেই বাড়ির মালিকের মেয়ের আদব-কায়দা লক্ষ্য করলাম, একেবারেই ভিন্ন, বুঝলি! চতুঃসীমার মধ্যে যে আমি নামক মানুষটা আছি, তাতে ওর কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। বারান্দার সিঁড়িতে পা রেখে আমি খবর কাগজখানা চাই, ভেতরে গিয়ে ও কাজের ছেলেটার হাত দিয়ে কাগজটা পাঠিয়ে দেয়। রাস্তার দিকে তাকিয়ে একলাটি চেয়ারে বসে থাকে। আমি জামার বোতাম আটকাতে আটকাতে সামনের সবুজ মাঠটায় বেরিয়ে এলেই এমন ভাবে ভেতরে চলে যায়, যেন অনেকক্ষণ আগে উনুনে বসিয়ে আসা দুধের কথা মনে পড়ে গেছে। প্রথম দিকে ভারি আশ্চর্য হতাম, বুঝলি। ঠিক আছে দাঁড়া, কত গভীর জলের মাছ দেখব। পরীক্ষাটা আগে দিয়ে নিই। পুরো একমাস পড়লাম। পড়তে কেন জানি না— বেশ উৎসাহ পেলাম। পরীক্ষাও ভাল হল।'

তিলক আবার একবার হাসল। ওর দিকে তাকিয়ে প্রভাত জিগ্যেস করল, 'হাসলি কেন? ও, একমাস পড়ে পরীক্ষা ভাল হওয়ার কথা শুনে? তোদের মত ভেবেছিস নাকি? সে সময় হস্টেলে আমি পড়াশুনো করিনি বলেই— তুই, ভবেশ, রত্ন— সবকটা বাহাদুরি দেখাতে পারলি। আমি যদি পড়তাম একটাও পাত্তা পেতিস না। বাদ দে। পরীক্ষার পর বাড়ি গেলাম না। মেয়েটার ভাবভঙ্গী আমার জেদ বাড়িয়ে দিল। কোন মেয়ের ব্যাপারে কখনও ফেল মারতে হয়নি, এবার মারলাম। তোকে তো বলেইছি, আমি পিছু হটে আসার বান্দা নই। এবারও এলাম না।'

তিলক উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে প্রভাতের মুখের দিকে তাকাল, একান্ত মনে ওর কথাবার্তা শুনতে থাকল, যেন রেডিওর খবরে ওর রেজাল্ট জানাচ্ছে।

প্রভাত বলে চলল, 'একদিন দুপুরবেলা বাড়ির গিন্নি ক্যারম খেলার জন্য ডেকে পাঠালেন। পরদিন মেয়েটির সঙ্গে চা, লুচি আর আলুভাজা বাজি রেখে ক্যারম খেললাম। বেস্ট অব থ্রি। স্ট্রেট সেটে জিতলাম।'

কথার সাথে প্রভাত একটা তুড়ি মারল। যে রকম চাপা গলায় ও এতক্ষণ কথা বলছিল তা পাল্টে ফেলল। একটা লম্বা শ্বাস টেনে নিয়ে আবার ছাড়ল। যেন অনেক আঁকাবাঁকা সরু গলি পেরিয়ে দীর্ঘ প্রশস্ত মুক্ত রাজপথে এসে পড়ল।

'তারপরটুকু খুব সহজ, বুঝলি? অবশ্য আমার করার কথা নয় এমন কিছু কাজ আমায় করতে হল। আই. এ. পরীক্ষার ইম্পরট্যান্ট কোয়েশ্চন বেছে দিতে হল; এখান সেখান থেকে খুঁজে পেতে বই জোগাড় করে ইন্টারমিডিয়েটের উত্তর লিখে দিতে হল। রাত বারোটা একটা অবধি মেয়েটা পড়াশুনা করতে লাগল। আমার অ্যালার্ম দেওয়া ঘড়িটাও নিয়ে গেল। আমি একা একা বিছানায় পড়ে থাকি,

ওর পড়ার গুনগুন স্বর আমায় ঘুমোতে দেয় না। তারপর কোন এক রাতে বারোটার পর, যখন চাঁদ ডুবে গেছে, পড়ার টেবিল ছেড়ে মেয়েটি উঠে এল সামনের সবুজ মাঠটায়। প্রথমে ওর খুব ভয় লাগছে বলে বলেছিল, আমি অভয় দিলাম।'

'ডেনজারাস!' তিলক আঁতকে উঠে একলাফে সরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ওপরে তাকাল। ওপরতলা থেকে কেউ একটা ভাঙা বোতল রাস্তায় ছুড়ে ফেলেছে। এবং ফেলে দিয়েই কেটে পড়েছে। তিলকরা কাউকেই দেখতে পেল না।

'লোকগুলোর কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি?' তিলক ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'ভাগ্যে আমার কিছু হল না, কিন্তু এই টুকরোগুলো এভাবে এখানে পড়ে থাকলে কত লোকের কত কি হতে পারে।' ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে তিলক দাঁড়িয়ে পড়ল।

প্রভাত ঘটনাটাকে কোন পাত্তা দিল না। 'আরে আরে, নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁটলেই হল'। তিলক কিছু না বলে হাঁটতে লাগল।

প্রভাত আরম্ভ করল, 'শোন, সেই রাতে সেই অহঙ্কারী মেয়েটিকে আমি আগের দেখা দশটা মেয়ের সাথে এক করে দিলাম। কিন্তু কি হল জানিস? কেন জানি না, আমার কাছে অন্য মেয়েদের থেকে এই মেয়েটির একটা পার্থক্য থেকেই গেল। ওকে কাছে পেতে আমায় একটু বেশি কষ্ট করতে হয়েছিল বলেই হয়তো ওকে আমি আর দশটা মেয়ের মত উড়িয়ে দিতে পারলাম না। ওর প্রেমে কেমন একটা অভিনবত্ব ছিল। অনেক দিন পর একবার ওদের ওদিকে গিয়েছিলাম। ওদের বাড়িতে ঢুকিনি। রাস্তা থেকেই দেখলাম আমি যে ঘরটাতে থাকতাম, সেই ঘরটাও নেই আর আমাদের সেই মনের মত সবুজ মাঠটাও নেই, নতুন বাড়ি উঠেছে। জীবনে প্রথমবারের জন্য আমার মনটা নরম হয়ে গিয়েছিল। —আরে দুলাল, তুই এখানে?'

মেয়েটির নাম কি, এখন তার কি অবস্থা, তিলক এসব জিগ্যেস করার আগেই ওদিক থেকে আসা কলেজ জীবনের আরেক বন্ধু দুলালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আলোচনটা ওখানেই বন্ধ হল। দুলালের সঙ্গে ওদের সম্পর্কটা অত অন্তরঙ্গ নয়।

আটটা নাগাদ প্রভাত তিলকের কাছ থেকে বিদায় নিল। যাওয়ার সময় বলে গেল, 'চাকরিটা যদি পাই তাহলে আমাকে এ সব টাউনেই ঘুরে বেড়াতে হবে, নিশ্চয় তখন দেখা করব। আচ্ছা— ' প্রভাত উড়োজাহাজের দরজায় দাঁড়িয়ে সম্ভাষণের ভঙ্গিতে বিদায় নিল।

সেই প্রভাতই এই প্রভাত। ডিব্রুগড়ে বাড়ি। জোরহাটে একটি বাড়িতে থেকে পড়েছিল। সেই বাড়ির মেয়েটিকে 'এখান সেখান থেকে খুঁজে পেতে বই জোগাড় করে এনে ইন্টারমিডিয়েটের উত্তর লিখে দিতে হয়েছিল' আর 'তিনি নোটগুলো না

যদি দিতেন—' মেয়েটি 'কি জানি পাশই করতে পারত না।' এই প্রভাতই সেই প্রভাত কি না কথাটা ভাবার জন্য তিলক শক্তি সঞ্চয় করতে পারল না। আরামকেদারাটায় ও ধপ করে বসে পড়ল। চেয়ারটার সামনের কাপড়টা একটু ফেটেছে; অন্য দিন সে সাবধানে বসে, সাবধানে ওঠে, আজ ফড়াৎ করে আরও আধইঞ্চিটাক ফেঁসে গেল; ও ভ্রূক্ষেপই করল না। তার বুকটায় এমন টান ধরেছিল যেন মনে হচ্ছিল আর শ্বাস নিতে পারবে না।

খানিকটা সময় ধরে তার এমন মনে হচ্ছিল যেন সে চিৎকার করে উঠবে, 'এ আমার কি হল? এ আমি কি শুনলাম?' মাঝে মাঝে সে বাঁহাতে কপালটা টিপে ধরছিল যেন তার মাথা ধরেছে— যন্ত্রণায় সে অধীর হয়ে পড়ল। মাথার চুলের মধ্যে অজ্ঞাতে আঙুল চালিয়ে বারবার খামচে ধরতে লাগল।

ভেতরে চন্দ্রা সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল। বুকের ধুকপুকুনি ছাড়া ওর মধ্যে জীবনের আর কোন লক্ষণ ছিল না। একবার যন্ত্রচালিতের মত ও হাতের মেখলাটাকে আলনার ওপর রেখে দিল। ভাঁজে ভাঁজে মুড়িয়ে রাখতে চাওয়া মেখলাটার সব কটা ভাঁজই খুলে গেল। কিছুক্ষণ পর ওর যেন চেতনা ফিরে এল। ওর মাথার মধ্যে যেন চিন্তার ঘূর্ণিঝড় বইতে থাকল। কি হল তিলকের? অনেক দিন পর প্রভাতকে দেখে ও হতভম্ব হয়নি। কিন্তু তিলক আঁতকে উঠল। কেন? প্রভাতের নাম শুনে? ও নিচের ঠোঁটটা কামড়ে মাটির দিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবতে থাকল— একটু আগে ও প্রভাতের বিষয়ে কি কি বলেছে। না বলার মত কোন কথা কোন ভাবে বেরিয়ে পড়েনি তো? কোথায় ? ও তো তেমন কিছু বলেনি! কেবল বলেছিল প্রভাতদা খুব ভাল। ও রকম 'খুব ভাল' ও তিলককে কত জনের সম্পর্কেই তো বলেছে। আর তিলককে ও চেনে, স্ত্রী 'খুব ভাল' বলে কারো প্রশংসা করলে অন্তরে কোথাও ঘা লাগার মত স্বামী তিলক নয়। তাহলে তিলক কি আগে থেকেই কিছু জানে নাকি? কেমন করে জানবে? ওর দৃঢ় বিশ্বাস, জীবনে ফেলে আসা উচ্ছৃঙ্খল কয়েকটা দিনের ঘটনা কেবল দুটো প্রাণীর মধ্যেই আবদ্ধ। ও স্বপ্নেও কোন দিন কারও কাছে প্রকাশ করেছে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় প্রাণী প্রভাত। কিন্তু প্রভাতকে তিলক চিনবে কি করে? আর যদি কোন ভাবে চেনেও, প্রভাত বুঝি ওসব কথা বলতে যাবে? না না, কখনও না। প্রভাত তাকে প্রথম দিনই অভয় দিয়েছিল। অন্তত একজন সুস্থ, শিক্ষিত মানুষ দু-একটা কথার মারফত একটি মেয়ের জীবন ধ্বংস করে দেবে বলে মনে হয় না। তাহলে? হয়তো তিলকের এই আঁতকে ওঠার মূলে প্রভাতের কোন সম্পর্কই নেই। অন্য কোন কারণেও বিমূঢ় হতে পারে, ও-ই হয়তো নোংরা কথাগুলো ভাবছে। হতেও পারে। ও তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তিলককে জিগ্যেস করবে কেন ও অমন করে আঁতকে উঠল।

দরজার চৌকাঠের কাছে এসে সে থমকে দাঁড়াল। ওর স্পষ্ট মনে পড়ে গেল,

প্রভাত কাকতী বলে তিলক চাপা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠেছিল। তার অল্প হাঁফছাড়া বুকটা আবার ভার হয়ে উঠল। তিলক প্রভাতকে চেনে, ওর সম্পর্কে হয়তো কিছু জানে! কি কি জানে? চন্দ্রার সঙ্গে প্রভাতের কোন একদিনের সম্পর্কের কথা? না—না—না—না। চন্দ্রা আপন মনে মাথা নাড়ল। ওসব কথা তিলক জানে বলে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করাটা এবং সামনে দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনে প্রবেশ করাটা তার কাছে এক কথা। এত দ্রুত এ রকম একটা মর্মান্তিক সিদ্ধান্তে আসার মত সাহস তার কোন মতেই হল না। জোর করে সে মনকে প্রবোধ দিল, হয়তো তিলকের সঙ্গে প্রভাতের কোন কালের একটা শত্রুতা আছে যার জন্য প্রভাতের নাম শুনে তিলক অত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। যদি তাই হয় তাহলে তিলককে অতি সহজেই জিজ্ঞাসা করতে পারে, 'আপনি প্রভাতদাকে চেনেন না কি? কি হয়েছে বলুন তো?' তখন হয়তো তিলক বলবে, 'চিনি মানে? ও অমুক তমুক, আমার সঙ্গে একবার এমন ব্যবহার করেছে যে আমি জীবনে কখন ভুলতে পারব না...' ইত্যাদি।

তখন চন্দ্রা বলবে, 'এ রাম, এমন লোক বলে তো জানতাম না। দেখতে তো খুবই ভদ্রলোক বলে মনে হয়। এরপর আর রাস্তায় দেখলে কথা বলব না। এত সাংঘাতিক!'— আর সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রার বুক থেকে, অপরাধবোধ জনিত দোষের অমূলক ভাবনাটা নেমে যাবে।

চন্দ্রা আরও এক পা এগিয়ে গেল। কিন্তু প্রায় তৎক্ষণাৎ ও পাশের খুঁটিটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল। প্রভাতের নামটা তিলকের সামনে দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করার কথা ভাবতেই ও শিউরে উঠল। যদি কোন কারণে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোয়! তার চাইতে ও ধরে নেবে, তিলক এ সব কথা কিছুই জানে না, ঘুণাক্ষরেও জানে না। কি কারণে তিলক ওভাবে চমকে উঠল তা জানার চেষ্টাও করবে না। ওর সামনে প্রভাতের নাম কখনও উচ্চারণ করবে না। আজ না হোক এক মাস পর, এক বছর পর, কোন দুর্বল মুহূর্তে নয়তো বা কোন মধুর মুহূর্তে, অতি সাবধানে, সুকৌশলে ও তিলকের কাছ থেকে বার করে নিতে পারবে আজকের এই চমকে ওঠার কারণ কি। কিন্তু এখন এভাবে থাকলে চলবে না। তিলকের কিছু একটা হয়েছে। ওর সামনের দিকের চেয়ারে বসার শব্দটা ও শুনেছে। ও-ও যদি ভেতরে এভাবে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তিলক কি ভাববে? যদি তিলক কোন বাজে ঘটনার ইঙ্গিত পেয়েই থাকে, তবে তার এই নির্বাক নিস্পন্দতা ঘটনার জটিলতা আরও বাড়াবে; নিশ্চয় কিছু একটা আছে বলে ভাবতে তিলককে উসকে দেওয়া হবে। এ জন্য এই মুহূর্তে তার সহজ-সরল ভাবে চলা দরকার। তিলকের যদি কিছু হয়েই থাকে সে বলতে পারবে না, কিন্তু তার কিছুই হয়নি; তার মনে কোন চিন্তাই নেই। হাসি ঠাট্টা করতে করতে

পুজো দেখতে গিয়েছিল, প্রভাত নামে একটা লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ঘরে ফিরে এসেছে, এখন আবার সেই আগের মানুষ, এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই।

চাদরটা ও ঠিক করে দিল এবং মুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে উঠল, যেন কাপড় বদলাতে তার অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি করে ও মাঝের ঘরটায় এলো। গলা সামান্যতম না কাঁপিয়ে, একটুও জড়তা না রেখে ও উঁচু গলায় জিগ্যেস করল, 'কোথায় গেলেন? ল্যাম্পটা এত কমিয়ে রেখেছেন কেন? ইস, দেখেছ! একদিন সন্ধেবেলায় বাতি জ্বালাতে পেরে তেলের খরচ কমানোর কথা মনে পড়ে গেল!'

ল্যাম্পটার পলতে ওঠানোর কলটায় ও একটা পাক মেরে দিল, সাধারণত যতটা জ্বলে ল্যাম্পটা তার থেকেও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল।

চন্দ্রার সাবলীল রসিকতায় অন্ধকারের মধ্যে তিলক দ্বিতীয়বার আশ্চর্য হল। চন্দ্রা কি বলছে তা ও ধর্তব্যের মধ্যেই আনল না; সে কেবল ভাবল, এই বুঝি ও তার কাছে এসে হাজির হয়। সে মনের সবটুকু ইচ্ছা একত্রিত করে ভাবল ও যেন এখন তার কাছে না আসে। এই মুহূর্তে চন্দ্রাকে কাছাকাছি সহ্য করাটা মায়ের কাছে হত্যাকারী ছেলের ফাঁসির খবর আনা খবরের কাগজখানা টেবিলের ওপর পেতে দেওয়ার মত। ওর মনে হল, ওই জায়গায় বসে থেকে থেকেই ও যদি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারত, চন্দ্রা যাতে তাকে খুঁজে না পায়, তাকে কোন প্রশ্ন করতে না পারে। ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ও কোন্ কথার কি উত্তর দিয়ে দেবে ও জানে না।

চন্দ্রা এল। প্রথমে ও দরজার পর্দাটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে দাঁড়াল, ভেতরের ল্যাম্পের আলো ছিটকে বারান্দায় পড়ল, সেই আলোয় ও দেখল তিলক বসে আছে। একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বুকে খানিকটা সাহস টেনে নিয়ে ও এগোল, বলল, 'ও মা দেখেছ এই অন্ধকার ঘুপচিতে কেমন করে বসে আছে! ল্যাম্পটা এনে দেব নাকি?'

'না না, লাগবে না।' তিলক সন্ত্রস্ত চিৎকার করে উঠল। যেন নায়ক নায়িকা ঠিক জায়গায় দাঁড়ানোর আগেই কেউ ড্রপসিন তুলে দিতে চেয়েছে।

'তাহলে অন্ধকারে কি করছেন?' চন্দ্রা জানতে চায়। তিলক নীরব থাকে।

ওর চুলের মধ্যে বাঁ হাতের আঙুল কটা চালিয়ে দিয়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চন্দ্রা প্রশ্ন করে, 'শুনছেন? কি হল আপনার?'

চুলের মধ্যে চন্দ্রার আঙুল তিলকের অসহ্য বোধ হচ্ছিল। ওর কথা ও শুনতেই চাইছিল না। কেবল বলল, 'কিছু হয়নি।' যেন কোন গুরুতর পরীক্ষা দিতে যাওয়া কোন পরীক্ষার্থীকে কেউ 'গুড লাক' দিতে এসে বিরক্ত করছে এবং তার উত্তরে সে কেবল কৃত্রিম হেসে বলছে, 'থ্যাঙ্ক, য়্যু।' ওর কথার সুরে চন্দ্রা পলকের জন্য থমকে গেল, তারপর আস্তে করে চুলটা ছেড়ে দিয়ে বলল, 'ও, আমি বেড়াতে গিয়ে দেরি করাতে রাগ হয়েছে, না?' চন্দ্রা নিজেই টের পেল ও জোর করে কিছু নিতান্ত অবান্তর কথা বলে চলেছে।

'আমি রিকোয়েস্ট করছি, কাইন্ডলি আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।' তিলক ঝাঁজিয়ে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে না হলেও সামান্য দাঁড়িয়ে থেকে চন্দ্রা চলে এল। আসার সময় অবশ্য খুব সহজভাবে বলে এল, 'কেমন যেন করেন। থাকুন, অন্ধকার ঘুপচিতে দার্শনিক হয়ে বসে, আমরা রাঁধুনি খানসামা, রান্নাঘরে লেগে পড়িগে যাই।'

রান্নাঘরে লাগা অর্থে চন্দ্রা হাঁটুর ওপর থুতনি দিয়ে আধঘণ্টা ধরে কয়েকটা আলু কাটল, তারপর সেভাবেই বসে রইল, এক সময় নন্দী সামনে থেকে বঁটিটা আর শবজির ঝুড়িটা সরিয়ে নিয়ে গেল।

কাউকে ভাত খেতে ডাকার সুযোগ না দিয়ে তিলক নিজেই আগে থেকে ভাতের পাতে বসেছিল। অনবরত টক খেতে চাওয়া রোগীকে ডাক্তারের পরামর্শানুযায়ী একগাদা সাগু সেদ্ধ করে দিলে যেমন হয়, তিলক সেভাবেই দু'গ্রাস মত মুখে দিল, তারপর উঠে গেল।

চন্দ্রা জিগ্যেস করল, 'কি হল? উঠলেন কেন?'

তিলক বলল, 'খেতে ইচ্ছা করছে না।'

ভাত খাওয়ার কথা চন্দ্রারও যেন মনে ছিল না। নন্দীর তাগাদায় চন্দ্রা তিলকের থালাতে বসে পড়ে স্তূপাকৃতি ভাত গোটা থালায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে; একটু সময় আঁকিবুকি কেটে উঠে গেল।

নন্দী একবার মনে মনে ভাবল, দুজনের হল কি? কোথাও যদি কিছু খেয়ে এসে থাকে তাহলে আগে বলল না কেন? কিছুক্ষণ ও গজগজ করতে লাগল, এত ভাত ও এখন কি করে? এতটা পান্তাভাত কালকে কে খাবে? অনেকক্ষণ ভাত সামনে নিয়ে ও বসে রইল, তারপর খাওয়া শুরু করল। একা একা ওর খুব খারাপ লাগল। দিদিমণির হাত পড়েনি বলেই কি না কে জানে তরকারি-টরকারির কোন স্বাদই নেই।

'ইস দেখ না, একেবারে বাচ্চা ছেলে যেন, চাদরটাও ভাল করে নিয়ে শুতে পারে না।' ইত্যাদি কোনও কথা যাতে চন্দ্রার কাছ থেকে শুনতে না হয়, তার জন্য আগে থেকেই ভাল করে চাদর-টাদর মুড়ে তিলক শুয়ে পড়ল, চন্দ্রা শোওয়ার ঘরে ঢোকার আগেই। চন্দ্রা ঘরে এসে অনেকবার ওর হাত ধরে টানাটানি করল, বেশ কয়েকবার গা থেকে চাদর সরিয়ে দিল, বারবার জানতে চাইল, 'কি হয়েছে বলুন দেখি।' এক উত্তর তিলকের, 'কিছু হয়নি।'

যখন সে, 'আহ্, শোও তো বিরক্ত করো না' বলে চেঁচিয়ে উঠল, তখন চন্দ্রা যেন কাঠ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ বিছানায় বসে থেকে ও বালিশে মাথা রাখল।

কয়েক মিনিট তন্দ্রার মত আসে, আবার জেগে যায় তিলক, এমনি বার বার সারারাত। ঠিক জেগে যাওয়া নয়, ইঞ্জিনের বয়লারের দরজাটা কেউ যেন বার বার

খুলে দেয়, আর চড় চড় করে ওর বুকে জ্বালা ধরে। ও কেবল ভাবতে থাকে, এ ওর কি হল, এ ও কি শুনল!

পরদিন কটায় অফিসে আসা দরকার আর কটায় ও এল তার কোন হিসাব রাখল না। ছাত্র-ছাত্রীরা কত বই ফেরৎ দিল, কত বই 'ইস্যু' করা হল তা খেয়ালই করল না। চেয়ারে বসে কখনও বাইরের দিকে তাকিয়ে কখনও দুই হাত মুঠো করে টেবিলে রেখে তার ওপর কপাল ঠেকিয়ে নিঃসাড়ে পড়ে থাকল, কখনও বা কলমটা তুলে নিয়ে সামনের কাগজটা অজস্র হিজিবিজি অক্ষরে ভরিয়ে তুলল, যেন ওর মনের যন্ত্রণাটা কাগজটাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। তিলকের মনে হচ্ছিল, আরম্ভ না হতেই ওর জীবনটা ক্ষয়ে গেল। যে কটা দিন ও জীবনে অমৃতের স্বাদ পেয়েছিল, তার প্রতিটি দিনই ভুয়ো। এ জাতীয় কটা দিনের তার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কোন এক বেকার যেন ইলেকট্রিক জেনারেটার খারাপ হওয়া কালীন পাখা টানার কাজ করল এবং যে কটা পয়সা পেল তার থেকে বহুগুণ তীব্র গাঁটের ব্যথা নিয়ে জেনারেটার ভাল হওয়ার দিন চলে গেল।

চন্দ্রা তাকে কেন এমন করে ঠকাল? ও তো এই প্রতারণা প্রবঞ্চনার মধ্যে থাকার লোক ছিল না! কেন এল চন্দ্রা ওর জীবনে? তিলক তো ওর সঙ্গে প্রেম করেনি, কোন দশমীর মেলায় সাক্ষাত পেয়ে খুঁজে খুঁজে ওর বাড়ি বার করে বাবা-মা'র কাছে মিষ্টি মিষ্টি কথার সাহায্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রশংসাও করেনি। সামাজিক প্রথায় কথাবার্তা আরম্ভ হয়েছে, তাকে মেয়ের ফটো দেখানো হয়েছে, মেয়ের বাবা তার কোষ্ঠি চেয়ে নিয়েছেন, বিয়ের খরচের জন্য তাকে দস্তুরমত টাকা ধার করতে হয়েছে। ছ' আনা সোনার আংটি পরিয়ে বিয়ের দিন ধার্য করেছে, তার পরিবারের সতের আঠারো জন বৃদ্ধ যজ্ঞের বেদীর পাশে সারারাত নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়ে গেছেন।

এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, সময় থাকা সত্ত্বেও ও আপত্তি করল না কেন? ও যদি ওর দেহমন কাউকে উৎসর্গ করেই ছিল, তবে একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে বিয়ের প্রশ্নে প্রথম দিনই ও কেন ঘোর অসম্মতি প্রকাশ করল না? মেয়েমানুষ বাবা-মা'র অধীন, দুর্বল, মুখ খুলে একটা কথা বলার সামর্থ্য বা স্বাধীনতা ওদের নেই; যে বাবা-মা'র আদরে স্নেহে লালনে পালনে বেড়ে উঠেছে, তাদের মনে কষ্ট দিতে, তাদের মতের বিরুদ্ধে যেতে সাহস কিংবা মনোবল নেই; ভাল কথা, তিলকও বিশ্বাস করে; কিন্তু যদি এত দুর্বলই হয়ে থাকো, তাহলে সবার অলক্ষ্যে, গোপনে, লোককে প্রশ্রয় দাও কেন? যে মুখের ভাষা হারিয়ে যায়, যে হৃদয় দুর্বল, যে হৃদয় পিতামাতার মনোরঞ্জনের জন্য কাতর হয়ে ওঠে, সেই মুখে গোপনে প্রিয়জনের সামনে নির্জন পরিবেশে অনর্গল মিষ্টি মিষ্টি কথা বেরোয় কি ভাবে? গোপন প্রেমের অভিসার চালাতে সেই হৃদয়ে এত সাহস জোটে কোত্থেকে?

শেষ সংগ্রামে লড়ার মত সম্বল জুটিয়ে নিতে পারবে কি পারবে না, তা চিন্তা না করেই তিলে তিলে মানুষকে কেন ঘনিষ্ঠ করে তোল, ঘনিষ্ঠ হও?

কাঁচা মনের ছেলেমেয়েদের বইয়ের মাধ্যমে চিঠি দেওয়া-নেওয়া করতে গিয়ে ধরা পড়ে বাবার হাতে মার খেয়ে প্রেমকে নমস্কার জানানোর সঙ্গে তোমাদের কি পার্থক্য রইল? প্রভাতকে আমি চিনি, তুমি তো চেনো না। প্রভাত তার জীবনের সঙ্গিনী আর দশটা মেয়ের মত হয়তো তোমার কথাও একবারও ভাবে না। তোমাকে কেউ বিয়ে করে নিয়ে যাওয়ার দিন হয়তো সে ১৯৫৬ সালে প্রোডাকশন কেন কমল সেই বিষয়ে কলকাতার কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেকটারের সঙ্গে আলোচনায় রত। তুমি তো প্রভাত নামে মানুষটাকে চেনো না। কিন্তু সে যদি প্রভাত না হয়ে অন্য কোন ছেলে হতো, যে কাউকে কথা দিয়ে চিরদিন প্রতি বিন্দু রক্ত দিয়ে তাকে রক্ষা করে, আর সে কথা রাখতে না পারলে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, তাহলে তুমি কি করতে? আমাকে বিয়ে করে, আমার বুকে আশ্রয় নিয়ে তুমি শান্তি পাবে, কিছুদিন পর একটি তুলতুলে শিশুকে বুকে করে একজন পরিপূর্ণ নারী হয়ে সব ভুলে যাবে? কিন্তু ঐ বিধ্বস্ত জীবনটির জন্য সামান্য অশ্রুপাত করার জন্য কাকে রেখে আসতে? না কি তেমন অন্তর দিয়ে ভালবাসার মত মানুষ নেই বলে ভেবেছ? না কি তুমি সেই দলের যারা যে কোন সক্ষম পুরুষের বাহুপাশে নিজেকে সর্বতোভাবে বিলিয়ে দেওয়াকে প্রেম বলে মনে করে।

তিলক হঠাৎ সোজা হয়ে বসল, ও কপালটা আঙুল দিয়ে টিপতে থাকল। সামান্য দূরে বসা অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান জিগ্যেস করল, 'কি হল?' তিলক মাথা নাড়ল। কিছু হয়নি। সে জীবনে কাউকে কথা দেয়নি, কারো সঙ্গে কখনও ঘনিষ্ঠ হয়নি। হয়নি তার অর্থ এই নয় যে সে তপোবনে থেকে বেদ-বেদান্ত চর্চা করে দিন কাটিয়েছে। সেও কলেজে পড়েছে, সেও সমাজের মধ্যেই বাস করেছে, সেও শক্ত-সমর্থ সুন্দর যুবক ছিল, কামনা তাকেও উদ্বেল করেছিল। আনন্দঘন কিছু মুহূর্তকে আঁকড়ে ধরার জন্য সে-ও পা বাড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু যে আনন্দের শেষ পরিণতিতে তার অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধুর জীবনে জটিলতা এসেছে, যে আনন্দ শেষে অনেক বন্ধুকে কাঁদিয়ে ছেড়েছে, তেমন আমোদে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে ঝাঁপ না দেওয়ার মত স্থৈর্য তার ছিল। বন্ধুর মুখে কোন এক সন্ধ্যার প্রেমমুখরিত কাহিনী শুনে, 'তোদেরই দিন ভাই' বলে সেও অনেক রাত আক্ষেপ করেছে। কিন্তু সেই বন্ধুকেই কয়েক তলা উঁচু থেকে লাফ দিয়ে মরার হাত থেকে বাঁচিয়ে সে শিউরে উঠেছে, 'চাই না, চাই না, এ রকম আনন্দ আমার চাই না' — বলে নিজের নির্ঝঞ্ঝাট জীবনটাকে প্রশংসার চোখে দেখেছে। একটি মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে তবেই প্রেম করব, এমনতরো মনীষী হওয়ার পরিকল্পনা তার ছিল না, কিন্তু তার

দ্বারা যাতে কারও অপকার না হয়, কেউ যেন তার কাজে প্রতারিত না হয়, তার কামনার আগুনে ডানা পুড়িয়ে কেউ যাতে জীবনে পঙ্গু না হয়, তার জন্য যেটুকু সংযম প্রয়োজন, সেটুকু তার ছিল। কেবলমাত্র এক নারীতে দেহমন অর্পণ করাটা মহামানবের নির্দশন, না মান্ধাতা আমলের অন্ধ নীতিবোধ, সে সব আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসার প্রয়োজন তার ছিল না, কিন্তু নিজে সাত ঘাটের ঘোলাজল খেয়ে, লোকের কাছে গঙ্গাজল চাওয়ার ভণ্ডামিকে সে ঘৃণা করত। সে প্রভাতের মত হয় নি। হতে যে চায়নি, একথা সে জোর দিয়ে বলতে পারে না। প্রভাত যে পরিবেশে ছিল, তেমন পরিবেশে না পড়ার জন্যই হোক বা তার স্বভাবের দৃঢ়তার জন্যই হোক, সে হতে পারেনি। দুর্বল মুহূর্তগুলোকে সে সশরীরে পাশ কাটিয়েছে। কামনা বাসনাকে মানুষ ফাঁকি দিতে পারে না, প্রভাত ফাঁকি দেয়ওনি, কিন্তু তিলকের মত লোকও তো আছে যে সরে আসতে পারে। চন্দ্রাকে কে শেখাল যে কোন এক মধ্যরাতে অতি আপন করে নেওয়া মানুষটার কোন খবর না নিয়ে, যজ্ঞের আগুনের সামনে অন্য এক পুরুষের হাতে হাত রাখার মধ্যে কোন তারতম্য নেই? কে তাকে ভরসা দিল, 'চিন্তা কোরো না যে কোন পুরুষের বুকে আশ্রয় পাবে, প্রভাত কি একটা নাকি, হাজার হাজার, প্রত্যেকেই...।' পূজামণ্ডপের কোলাহলের মধ্যে দেখা হওয়া একজন লোকের খবর, সন্ধ্যায় ধুনো জ্বালানো একটি লোককে, ঘরে আগুন লাগা দেখে এসে বাচ্চা ছেলের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ার জন্য যে সাহস দরকার তা চন্দ্রা কোত্থেকে পেল?

নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে তিলক। জিগ্যেস করবে চন্দ্রাকে, আজই, সে সোজাসুজি জিগ্যেস করবে, দুটো মানুষের সংসার করা বলতে সে কি বোঝে? বিবাহিত জীবনটাকে বৈচিত্রহীন ভাবে নাকি সে? অতীতের বৈচিত্র্যময় জীবনে শেখা লুকোচুরি খেলা দিয়ে এখনও জীবনটাকে সতেজ রাখার প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করে নাকি?

জিগ্যেস করবে আজকে তাকে। তিলক উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

পিয়ন নীলকান্ত জিগ্যেস করল, 'স্যার চা খেলেন না যে? ঠাণ্ডা হয়ে গেল তো!'

চায়ের কাপটার দিকে তাকিয়ে 'অঃ' বলে সে কাপের দিকে হাত বাড়াল। নীলকান্ত বলল, 'দাঁড়ান, গরম করে আনি।'

তিলক এক চুমুকে কাপটা শেষ করে রেখে দিল। নীলকান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে ও দেখল, সে হাসছে। তার মনে হল সেও যদি ওর সঙ্গে একটু হাসতে পারত তাহলে ভাল হতো।

নাহ্, সে মরে গেলেও চন্দ্রাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারবে না, এত সাহস তার নেই। নিতান্ত অসাবধানতাবশত চোখের সামনে সাত-সাতটা নতুন বইয়ের ওপর এক দোয়াত কালি ফেলে নোংরা করে দেওয়া সত্ত্বেও সে পিয়নটাকে একটা

কড়া কথা বলতে পারেনি। কেউ কারও পকেট থেকে টাকার ব্যাগ বার করে নিচ্ছে দেখলে ভয় তারই হয়, যদি ধরা পড়ে তবে পকেটমারটার কি গতি হবে।

মুখে-টুখে বল লাগতে পারে ভেবে ফুটবল মাঠে ভয়ে প্রথম সারিতে না বসার মত ভীতু দর্শক সে নয়, কিন্তু যেখানে অন্তরের লজ্জা, কষ্টের প্রশ্ন আছে, সেখানে সে নিতান্ত লাজুক, অত্যন্ত কাতর স্বভাবের। চন্দ্রাকে এ সব কথা জিজ্ঞাসা করার প্রশ্নই ওঠে না, তার চোখের দিকে তাকাতেই আজ তিলকের লজ্জা লাগবে, সাহস হবে না।

চন্দ্রার সামনে সে কোন কথাই বলতে পারল না। যতক্ষণ সে ঘরে থাকল দূরে দূরে রইল। বেশির ভাগ সময় রাস্তার দিকের বারান্দাটায় বসে কাটাল। যাতে রাস্তার লোকেরা ওকে দেখতে পায়। ভেতরে যখন থাকল অধিকাংশ সময় নন্দীকে কাছাকাছি রাখল, যাতে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে বলা যায় না এমন কথা ওঠার সুযোগ না হয়। দু'দিনেই তার চেহারা পাল্টে গেল, মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল।

তিলক যখন থাকে না চন্দ্রা কখনও এ ঘর থেকে ওঘরে এমনিই যাওয়া আসা করে। কোথাও একটু ঠাঁই পেলেই সেখানে মাথা রেখে ভাবতে বসে, যেন নতুন বউ খুব একটা দামি নেকলেস কোথাও রেখে ভুলে গেছে, মনে করতে পারছে না, অথচ কাউকে বলতেও পারছে না। তিলক বাড়িতে ফেরার সাথে সাথে ও প্রাণপণ সহজ হওয়ার চেষ্টা করে; তিলককে একটার পর একটা প্রশ্ন করে।

মামলা মকদ্দমা ঘৃণা করা সত্ত্বেও পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষার খাতিরে উকিলের সামনে দাঁড়ানো লোকের মত চন্দ্রার প্রশ্নের সামনে তিলক দারুণ অস্বস্তি বোধ করে। ও কেবল একটি সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করতে চায়, ওর কিছু হয়নি।

চন্দ্রা প্রশ্ন করে, 'যদি কোন ব্যাপারে আপনার দুঃখ হয়ে থাকে তবে তার ভাগ কি আমারও পাওয়া উচিত নয়? আমাকে এভাবে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।'

নন্দী আশেপাশে ছিল না। কথা বলতে বলতে ঝুঁকে চন্দ্রা সামনের চেয়ারে বসা তিলকের মুখের খুব কাছে এসে ওর মুখটা রাখল, যেন অনেক দিন আগে চুম্বক বলে জানা লোহার টুকরোটা আজও চুম্বক হয়ে আছে কিনা দেখার জন্য আরেক টুকরো লোহাকে কাছে আনল। তিলকের ঠোঁটের এত কাছে থেকে ঠোঁট ফিরিয়ে নেওয়ার কথা চন্দ্রার মনে পড়ে না।

তিলক মুখটা ফিরিয়ে নিল। অতি ক্ষীণ স্বরে তার মুখ থেকে একটি একটি করে শব্দ বেরিয়ে এল, 'একেবারে অর্ধাঙ্গিনীর মত কথা বলছ দেখি।'

চোখ ছোট করে, ভ্রূ কুঁচকে চন্দ্রা একমুহূর্ত দাঁড়াল, যেন শব্দ কটা কোত্থেকে আসছে ঠাহর করতে পারেনি। তারপর টান টান হল। নিস্ফল হয়ে ফিরে আসা ঠোঁট দুটো যেন সামান্য কেঁপে উঠল। চেয়ারের কাছ থেকে সরে গিয়ে সে একটা খুঁটিতে সমস্ত শরীরের ভারটা ছেড়ে দিল। তার চোখ দুটো ধীরে ধীরে সজল হয়ে

উঠল, নাকের পাটা ক্রমাগত বিস্ফারিত হতে থাকল। তারপর খুঁটিতে মাথা ঠেকিয়ে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল, নিঃশব্দে, অবিরাম, অবিশ্রান্ত বর্ষণের মত অশ্রুধারা ঝরিয়ে।

তিলক উঠে গেল। ঘরে ঢুকল না। একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

চন্দ্রার ওই কান্নার কি-ই বা অর্থ? কি আশ্চর্য এই নারী জাতি! এরা জীবনে কতবার কাঁদে? তিলকের অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু শুনেছে; এদের চোখের জলে নাকি বিষ আছে, আবার অমৃতও আছে। এদের চোখের জল নাকি সাউডাঙ*-এর উদ্যত অস্ত্রকেও হার মানাতে পারে। কিন্তু সবচাইতে বিস্ময়কর এরা যখন তখন কাঁদতে পারে। নিরুদ্দিষ্ট রাজকুমারের পবিত্র স্মৃতিতে বছরের পর বছর কেঁদে কেঁদে উন্মাদ হতে পারে, আবার দ্বিতীয় প্রেমিকের সঙ্গে চারটের সময় দেখা করার কথা থাকলে, বেলা তিনটেয় প্রথম প্রেমিককে চোখের জল ফেলে ফেলে বিদায় দিতেও পারে। এদের চোখের জলে অনেকের জীবন পিচ্ছিল, কর্দমাক্ত হয়ে গেছে।

তিলক ভুলিয়ে রাখা বাচ্চা ছেলে নয়, অন্তত মোহে অন্ধ হয়। সে বিস্কুট কোম্পানির কাছে জনবহুল মোড়টায় এসে পড়ল! সেখানে দাঁড়িয়ে ওর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হল, মিথ্যে, সব ভুয়ো।

কিন্তু চন্দ্রার কান্না তো সে আগেও দেখেছে। তখন তো তার এমন বিষময় ধারণা হত না। তিলকের মা এবং বাবার ফটো দুটোতে ধুলো-ময়লা পড়ে নোংরা হয়েছিল, চন্দ্রাকে নামিয়ে মুছে রাখতে বলেছিল। সেই সময় আবার চন্দ্রা তিলকের জন্য একটা সোয়েটার তিনদিনে বুনে দিতে পারবে বলে বাজি ধরেছিল। তিলক ভুলে গেল বাজির কথা আর চন্দ্রা ভুলে গেল ফটো মোছার কথা। দুদিন পরে তিলক ফটো দুটোর দিকে আঙুল তুলে দেখাল, চন্দ্রা ভুলে গেছে এবং সময় পায়নি বলে দুটো কারণ দেখাল। কোন রাগ বা কুটিল চিন্তা পোষণ না করেই তিলক জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমার যদি কাজের চাপ বেশি হয়ে থাকে তো বল আরেকটা কাজের ছেলে বা মেয়ে রাখব নাকি কাজটাজ করার জন্য?' সেদিন চন্দ্রা অনেকক্ষণ কথা বন্ধ করে থেকে পরে কেঁদেছিল। মনে হয়েছিল তিলক একজন গৃহিণী হিসাবে ওর ওপর অনাস্থা প্রকাশ করেছিল। সেদিন তিলক তাকে অনেকক্ষণ বুকে নিয়ে আদর করেছিল, বুঝিয়েছিল যে তাকে পাওয়ার পর তার দিক থেকে কোন অভাব সে বোধ করেনি। অভাব বোধ করার সুযোগ চন্দ্রা দেয়নি; ও আসার পর তিলককে কোন দিনই ঘরের জঞ্জালের কথা ভাবতে হয়নি, বোতামের অভাবে জামায় আলপিন মেরে অফিস যেতে হয়নি, হাতের কাছে একটু ছিঁড়লেই জামাটা নন্দীকে দিয়ে দিতে হয়নি, নোংরা গেঞ্জি আলনার কোণায় জড়ো হয়ে থাকেনি, শূন্য বারান্দা

---

* সাউডাঙ অসমের এক তফসিলী জাতি বা জনজাতি। কথিত আছে এরা ভয়ঙ্কর রাগী হয়।

পিছনে ফেলে অফিসে বেরোতে হয়নি, চন্দ্রা সর্বদাই পিছন পিছন এসেছে; পিঠে যদি সামান্য কুটোও একটা থাকে, বারান্দা থেকে নামার আগে চন্দ্রা টোকা মেরে ফেলে দিয়েছে; অফিস থেকে ফিরে শূন্য বারান্দায় উঠতে হয়নি; চন্দ্রা পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকত; জিগ্যেস করত, 'ছাতাটা হাতে ঝুলিয়ে আনেন, কেন মেলে আসতে পারেন না?'

তিলকের সঙ্গী সাথীরা বলে 'ভাগ্যবান।' আশেপাশের বৃদ্ধারা চন্দ্রার সম্পর্কে বলে, 'লক্ষ্মী।'

আর তার বাহুপাশে যে নারীটিকে তিলক চেয়েছিল চন্দ্রার মধ্যে তার থেকেও অধিক আভরণে সজ্জিতা, উতলার পরিবর্তে উন্মাদ করার মত একজন নারীকে সে খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু আজ তার কি হয়ে গেল! সে যা জেনেছে, যা শুনেছে তার একবর্ণও তো মিথ্যে নয়।

তিলক একবার মাথা তুলে দেখে নিল, অজ্ঞাতসারে এগোতে এগোতে কত দূর এসেছে। আর বেশিদূর এগোতে তার ইচ্ছে করল না, সে ফিরল।

চন্দ্রা কেন এমন করল? কেন, এও তো হতে পারে কোন এক উন্মত্ত নিশিতে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অবস্থায় তার পা পিছলেছে। শোওয়ার ঘর থেকে ত্রিশ গজ দূরে থাকা এক সুন্দর, সুঠাম যুবকের আহ্বান সে উপেক্ষা করতে পারেনি। তার মত রক্ত-মাংসের কজন তরুণীই বা পারে? তিলক নিজেও কি তা পারত? তার মন সেই আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলেও, দেহ হয়তো পারত না। আর না পারার জন্য জীবনের সেই দুর্বলতম মুহূর্তে সে যদি কয়েকটা মিনিট সেই উন্মত্ত উপভোগে সামিল হত, তবে তার জন্য নিজেকে সে কতটা অপরাধী মনে করত?

তিলকের একটা তাম্বুল খেতে ইচ্ছা করল। রাস্তার পাশের এক দোকানে সে থেমে গেল। দোকানের ঝাঁপ তুলে রাখা খুঁটিটাতে আঙুলের চুনটা মুছে নিয়ে সে ভাবল, তার ভুলও হয়নি আবার ঠিকও হয়নি। চন্দ্রার জীবনে যে স্খলন ঘটেছে তার দাগ কি তার জীবনে আজও লেগে আছে? যদি নাই থাকে তবে তার অপরাধ কতটুকু? যে ভুল সে করেছিল তাকে তো তার ভুল বলা যায় না, হয়তো সে তার রক্তমাংসেরই ভুল; যে রক্তমাংস তিলক আজ নিজেই উপভোগ করে! কিন্তু —

তিলক অজান্তেই বাড়ির দিকে একটু দ্রুত এসেছিল; হঠাৎ তার হাঁটার গতি শ্লথ হল। কিন্তু পূজামণ্ডপে প্রভাতকে দেখে সে অত উল্লসিত হয়ে ফিরেছিল কেন? কেন অত উচ্ছ্বসিত হয়ে কথা বলছিল। অনেক দিন আগে হারিয়ে গেছে ভেবে আশা ছেড়ে দেওয়া নেকলেস একদিন হঠাৎ বাক্সের তলায় আবিষ্কার করলে যেমন আনন্দ হয় তেমনি আনন্দিত হয়ে ও কথা বলছিল কেন? এ তো হঠাৎ কোন দিন পিছলে পড়ে, গা-হাত-পা ধুয়ে, পিছনে যাওয়ার কথা ভুলে যাওয়ার লক্ষণ নয়! এ তো কোন কালে লুটোপুটি করে কাদা খেলার স্মৃতি সযতনে বুকে রাখার মত।

প্রভাতের দেখা পেয়ে আজও যে চন্দ্রার এত উচ্ছলতা, সেটাই চন্দ্রার জীবনের স্খলনের দাগ।

আর প্রভাতের মত একটা ছেলের মনও 'জীবনে প্রথমবারের জন্য কোমল হয়ে উঠেছিল।' কেন? প্রভাত বলেছিল তার দেখা আর দশটা মেয়ের মত এই মেয়েটাকে সে নস্যাৎ করে দিতে পারেনি, কেন?

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে, অন্ধকার বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তিলক ভাবল, সে ঢুকবে, না ঢুকবে না।

অফিসের টেবিলে কনুইয়ে ভর দিয়ে সে ভাবল, তাহলে কি সে ধ্বংস হয়ে যাবে? যে শান্তির জন্য সে জীবনটাকে বেঁধে রাখল, বিনা দোষে সেই শান্তি সে কেন হারাবে? না, জীবনটাকে এত সহজে সে ভাসিয়ে দিতে পারে না। এই লাইব্রেরিতে বসে সে জীবনের জটিলতা সম্পর্কে অনেক কিছু পড়েছে। একটা প্রাণীকে আপন করে নিতে মানুষ যুগ যুগ ধরে নাকি হয়রান হয়েছে। সেও হয়রান হচ্ছে, হোক। নিজেকে ধ্বংস করার আগে তাকে একবার শেষ দেখাটা দেখতেই হবে।

তিলক যেন মনে একটু বল পেল। সমস্ত ব্যাপারটা তার আরেকবার ভেবে দেখতে ইচ্ছা হল।

চন্দ্রাকে না হলেও প্রভাতকে তো সে ভাল করেই চেনে! প্রভাত নিজেই বলে, 'সে পেছু হটার ছেলে নয়।' সেই কারণেই হয়তো চন্দ্রা এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। প্রভাত তাকে বলেছিল, মেয়েটার ঔদাসীন্যে ওর জিদ বেড়ে গিয়েছিল, সে উঠে পড়ে লেগেছিল কত গভীর জলের মাছ দেখার জন্য। তার মানে চন্দ্রাকে পড়ার টেবিল থেকে উঠিয়ে আনতে সে যথেষ্ট কষ্ট করেছিল; অর্থাৎ ধরা না দিতে চন্দ্রাও যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত হয়তো সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রভাতের প্রলোভনের মায়ায় ভুলতে বাধ্য হয়েছিল। যদি তাই হয় তবে আজও সে প্রভাত 'বড় ভাল ছিল' কেন বলে? নোট দিয়ে সাহায্য করার জন্য আজও কৃতজ্ঞ কেন? নারীসুলভ কোমলতা আর সাধারণ ভদ্রতার জন্যই ধরা যাক পূজামণ্ডপে তার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেছে, কিন্তু ঘরে এসে তো বলতে পারত, 'একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, কিন্তু বেশিক্ষণ কথা বলিনি, কারণ আমি জানি লোকটা খুব সুবিধের নয়।' তিলক যদি আগে থেকেই প্রভাতকে না চিনত তাহলে চন্দ্রা খুব ভাল বলার পর হয়তো বলত, 'এ হে, কখনও আবার দেখা হলে নিয়ে এস তো, আলাপ করব।' তারপর হয়তো প্রভাতদা আসত; হয়তো কখনও একবেলা খেত, একরাত থেকেও যেত। তিলক অস্থির হয়ে উঠল। কে বলতে পারে দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত সে অফিসে থাকাকালীন কত দিন প্রভাত তিলকদের গেটটা খুলেছে, বন্ধ করেছে?

ছি ছি ছি ছি। তিলক নিজে নিজেই জোরে মাথা ঝাঁকাল। না না, ও বড় বেশি

ভাবছে। তার কাছ থেকে চন্দ্রা কি পায়নি, যে এত নিচে নামবে? কিসের অভাবে চন্দ্রা এত কুৎসিত হয়ে উঠবে? নিজের স্ত্রী সম্পর্কে এভাবে ভাবতে পারার মধ্যে তার নিজের পুরুষত্বের প্রশ্নও জড়িত হয়ে আছে। চন্দ্রা যা-ই করুক না কেন, পাপ পুণ্যের জ্ঞান তার আছে, সে এরকম করতে পারে না। ওর মনে এখনও কিছু থেকে থাকলে প্রভাতকে কাছে পাওয়ার জন্য তিলকের সর্বময় বিস্তৃতির মধ্যেও একটা চোরাগলি ও খুঁজে নিতে পারত। প্রভাতের কাছে ও যেদিন নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিল, সেদিনের জন্য চন্দ্রা শুধুমাত্র প্রভাতকেই দোষ দিতে পারে না। দোষ যদি প্রভাতের থেকে থাকে, তবে দোষ চন্দ্রারও ছিল। ও যদি সেই রাত্রে আনন্দ লাভ করে থাকে তাহলে সেই রাতটুকুর জন্য প্রভাত ভাল মানুষ, বড় ভাল মানুষ। আজ প্রভাতকে অপমান করা বা খারাপ বলে কি লাভ? আর অপমান করা বা খারাপ বলতে না পারার মধ্যে কি এখন প্রভাতকে প্রশ্রয় দেওয়া বোঝায়? না, বোঝায় না। হয়তো একটা নিঃস্বার্থ, অনাসক্ত, সরল সম্পর্কও বোঝায়। তিলক তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল।

চন্দ্রা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেনি। ঘরে ঢুকেই তিলক ছাতাটা চন্দ্রার হাতে দিয়ে বলল, 'বুঝেছ, যে গরম জামার অর্ডারটা দিয়েছিলাম, আজ তার ট্রায়াল দিয়ে এলাম, পরশুদিন দেবে। কিন্তু পয়সাই যে নেই এখন।'—

কথাটা যেন চন্দ্রার কানেই ঢুকল না। তিলক থাকলে পয়সা না থাকার মত নগণ্য একটা কথা তার কানে কি করেই বা ঢুকবে?

হঠাৎই বাড়িটার মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। নন্দীর মুখে আবার অদ্ভুত সুরে হিন্দি ছবির গান শোনা গেল। চন্দ্রা চুলের জট ছাড়িয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে একটা খোঁপা বাঁধল। তিলকেরও মনে পড়ল, তাই তো, অনেক দিন পেঁপের খার* খাইনি।

শোওয়ার ঘরে আবার এলোমেলো কথার ঢেউ উঠল। কোন একদিন দুপুরবেলা নাপিত নন্দীর দাড়ি কামাতে গিয়ে গালের একটা আঁচিল কেটে ফেলেছিল, প্রচুর রক্ত বেরিয়েছিল। যে ইঁটটার ওপর নন্দী বসে ছিল, সেই ইঁটটা তুলে নিয়ে নন্দী নাপিতকে এই মারে তো সেই মারে। ঘটনা দেখে চন্দ্রার হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরার জো। বিছানায় শুয়েও ও হাসতে থাকল, তিলকও হাসছিল। তারপর শুরু হল গায়ে তিল, তুলসী, আঁচিল এইসব থাকলে যা বলা হয় তা সত্যি কিনা। চন্দ্রা কোথায় যেন শুনেছে— ঠোটে তিল থাকলে নাকি বিলাসী এবং প্রেমিক হয়। তিলক জিগ্যেস করল, 'তোমার ঠোঁটে আছে নাকি?' চন্দ্রা মুখটা কাছে এনে দেখাল 'দেখুন, নেই?'

তিলক ওর নিচের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে থাকল। একবার জিগ্যেস

---

* পেঁপে পুড়িয়ে এবং জ্বাল দিয়ে তৈরি করা কষায় বস্তু। তা দিয়ে তরকারি রান্না হয়।

করে বসল, 'তোমার এই ঠোঁটে আমিই প্রথম চুমো খাচ্ছি, তাই না?' হঠাৎ প্রশ্নটা করেই সে বুঝল, ওর ভেতরে যেন পাপ আছে।

চন্দ্রার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। একটু পরে ঢোক গিলে নিচু গলায় ও বলল, 'হুঁ।' তিলকের মাথার ভেতর যেন একটা আগুনের শিখা দপ করে জ্বলে উঠল, হাতটা শক্ত হয়ে গেল।

ফাঁকি। দুর্দান্ত ফাঁকি, এরা জলজ্যান্ত ফাঁকি দিতে পারে। প্রভাতকেও যে চন্দ্রা দ্বিতীয় বারের জন্য ফাঁকি দেয়নি তার কি প্রমাণ আছে? মাথার সিঁদুর মুছে অচেনা জায়গায় রেখে দিলে; এই মেয়েটিই আবার নিজেকে অনাঘ্রাত ফুল বলে দাবি করবে, রক্ত-মাংসের লোভে। অন্তর বলে বস্তু এদের নেই; তাই অন্তরের কলুষতারও কোন প্রশ্ন নেই। যে জীবনে একবার পাপ লুকোনোর জন্যে সচেষ্ট হয়েছে, সে নিজের অজান্তে আরও দশটা পাপে ডুবে যাবার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। যদি এতই দেহের খাঁই, তবে চন্দ্রা আমার কাছে এল কেন? ও আমাকে দিনে রাতে কেন প্রবঞ্চনা করে চলেছে?

তিলক অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ানকে জানাল, 'আপনি এ-কদিন একটু কাজটা সামলে নেবেন, আমি বোধহয় কদিনের জন্য ছুটি নেব।'

অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'আমিও তো ছুটি নিচ্ছি পনের দিনের। সাত তারিখে আমার বিয়ে। আপনি কি জানেন না স্যার?'

'বিয়ে?' তিলক লোকটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। 'বসুন তো' ও সামনের চেয়ারটা আঙুল দিয়ে দেখাল, যেন দেশভ্রমণে বের হতে যাওয়া কোন লোককে একজন উপদেশ দেওয়ার জন্য বসাচ্ছে। ও আচমকা এ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ানকে প্রশ্ন করল, 'কি ধরণের মেয়ে বিয়ে করছেন আপনি?'

লোকটি হতভম্ব হল। তিলক সম্পর্কে কিছুদিন থেকেই ও উল্টোপাল্টা কিছু চিন্তা করছিল, এখন ও শুধু ভাবল, স্যারের হলটা কি! ও সলজ্জ কণ্ঠে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, 'কি জানি, মেয়ে কেমন, আমি এখনই কি করে বলি।'

'নিশ্চয়।' তিলক মুখের কথা কেড়ে নিল, 'ওপরের জল দেখে বিলের নিচে কি আছে কেউ বলতে পারে না। কিন্তু কয়েকটা ভুল আপনি দয়া করে করবেন না। আমাদের স্ত্রীলোকেদের সততা, নৈতিকতা সম্পর্কে কয়েকটা বড় সংকীর্ণ ধারণা আছে। আপনি যে মেয়েটিকে বিয়ে করবেন; সেই মেয়েটির মন পাওয়ার চেষ্টা করবেন এবং তবেই আপনি পেতে পারেন — যদি আপনিও আপনার হৃদয় উজাড় করে দিতে পারেন। অনেকে বাসনের নিচের ময়লা ঝরার ভয়ে বাসন উল্টে রাখতে ভয় করার মতই হৃদয়টাকে মেলে ধরতে ভয় পায়। কিন্তু ওটা ভুল। আপনি জানবেন মন থেকে কি বেরিয়ে পড়ল সেটা বড় কথা নয়, অন্তরে কি

গোপন রাখলেন সেটাই বড় কথা। কলঙ্ক কোথায় নেই? আপনি কি বিশ্বাস করেন — দাঁড়ান, — মেয়েটির বয়স কত বলে শুনেছেন আপনি?'

'একুশ।' ভদ্রলোক ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন।

'বেশ। আপনি কি বিশ্বাস করেন চোদ্দ বছর থেকে একুশ বছর পর্যন্ত এই সাতটি বছর মেয়েটি বিবেকানন্দের বই পড়ে কাটিয়েছে? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে তার জীবনে কখনও কোন দিন প্রলোভন আসেনি? যদি এসেই থাকে তাহলেও জানবেন আপনার করার কিছু নেই। আপনি মেয়েটির বর্তমানকে নিয়ে ভবিষ্যৎ তৈরি করতে যাচ্ছেন, তার অতীত খুঁচিয়ে বর্তমান ধ্বংস করতে যাচ্ছেন না। আমাদের পাপী মনগুলো গুণ এবং পুণ্য খুঁড়ে খুঁড়ে তার নিচে কোন পাপ লুকিয়ে আছে কিনা দেখতে চায়; এই ভুলটা আপনি করবেন না।'

তিলক পরিশ্রান্ত মানুষের মত একটা শ্বাস নিল। তারপর বলল, 'এঃ ছি ছি, আপনাকে কি সব কথা বললাম। আপনার একটা শুভ কাজের আগে এসব কথা বলার কি-বা দরকার ছিল? ছি ছি, আপনি কিছু মনে করবেন না, বুঝেছেন। ঠিক আছে যান, আপনার জীবন সুখী হোক। কি ব্যাপার! আমাকে দেখি বিয়েতে নেমন্তন্নই করলেন না।'

'করব, নিশ্চয় করব স্যার।' বলে লোকটি চটপট বেরিয়ে গেল।

তিলকের যেন চেতনা ফিরল। তার কাঁদতে ইচ্ছা করল। সে এইমাত্র যে কথাগুলো বলল সেই কথাগুলো সে আগে ভাবেনি কেন? সে নিজে কেন এই কথাগুলো নিজেকে বোঝাতে পারেনি? হয়তো বোঝাতে পারবে। কিন্তু প্রতারণা সে সইতে পারবে না। দেহের জন্য সে উন্মাদ নয়, কিন্তু একটি হৃদয় পাওয়ার অভিলাষ তার আছে। কিন্তু সে কি হৃদয় দিতে পেরেছে? দেবে, সে সব চন্দ্রাকেই দেবে। প্রভাতের— 'অন্য দশজনা মেয়ের সঙ্গে এই মেয়েটির একটা পার্থক্য আমার মনে থেকে গেল' আর চন্দ্রার— 'বড় ভাল' বলার মধ্যে দু'দিক থেকেই দুটো হৃদয়ের পরস্পরের প্রতি আসক্তির যে আভাষ সে পেয়েছে সেই সব কিছুকে সে তুচ্ছজ্ঞান করবে, মিথ্যে বলে জানবে। প্রভাত যে অন্য দশটি মেয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিল, তাদের কি হয়েছে? তারা যদি ধ্বংস না হয়ে গিয়ে থাকে, সে কেন চন্দ্রার জীবনটাকে ধ্বংস করবে? পৃথিবীটা যদি এভাবে চলতে পারে তবে সেও চলবে। পূজো দেখতে যাওয়ার আগে যে চন্দ্রাকে সে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পেরেছিল, পূজো দেখে সেই মেয়েটিই তো ফিরে এসেছিল। এ দুয়ের মধ্যে কেবল থেকে গেছে কয়েকটা কথা। সেই কয়েকটা কথাকেই সে তার জীবনটাকে ওলটপালট করার জন্য যথেষ্ট বলে ভাববে কেন?

আর চন্দ্রা? তার কি হল? দিন দিন রুগ্ন হয়ে শুকিয়ে যাওয়া তার মুখখানা দেখে তার কি বোঝা উচিত ছিল? সে তো ঘরে ফিরে যেতে চাইতে পারত। সে

তো তিলকের এই ব্যবহারের জন্য কোন কৈফিয়ৎ চাইছে না।

সেদিন বিকেলে চন্দ্রাকে বুকে নিয়ে তিলক অনেক কথাই বলল। শুধু বলল না, ওর কি হয়েছিল। চন্দ্রার শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠেছিল।

তিলক আর কোন কথাই ভাবল না। চন্দ্রাও আর কোন কথা জানতে চায়নি; ওর সাহস যেন জীবনের তরে লুপ্ত হয়ে গেছে। একটা খড়ি পেন্সিল নিয়ে দুটো বাচ্ছা ছেলে ঝগড়া করে কথা বন্ধ করে দেওয়ার পর আবার কথা শুরু করলে আগের থেকে বন্ধুত্ব যেমন আরও গাঢ় হয় এবং কি জন্য কথা বন্ধ হয়েছিল সেই প্রসঙ্গটা সর্বদা সাবধানে এড়িয়ে চলে, তিলকরাও সেইভাবে দুজনে দুজনের মনকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করে চলতে লাগল — আনন্দেই।

একদিন আচমকা তিলক দূর থেকে প্রভাতকে দেখতে পেল। সম্পূর্ণ সাহেবি পোশাকে। বোধহয় প্রভাত কোম্পানির বড় চাকরিটা পেয়েছে। ওর একটা তীব্র ইচ্ছা জাগল, প্রভাতকে ও কিছু কথা জিগ্যেস করে। অত্যন্ত কৌশলে, ধীরে ধীরে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেই শিউরে উঠল। দ্রুত অন্য একটা রাস্তায় ঘুরে গিয়ে সে প্রভাতের আড়াল হল। প্রভাত নামের কোন মানুষের সঙ্গে তার কোন কালে কোন পরিচয় ছিল না বলে ভাবতে চেষ্টা করল। অজান্তেই রাস্তার মধ্যে ওর মুখ থেকে শিস বেরোতে যাচ্ছিল।

কিন্তু বাড়িতে ঢোকার সময় তার মুখের চেহারা দেখে চন্দ্রা একটু সাবধান হল। শোওয়ার ঘরে চন্দ্রা জানালো 'নন্দীর কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার ভাল ঠেকছে না বুঝলেন?'

'কি আবার হল?'

'দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে ও রোজ জলের ভারীটার ঘরে গিয়ে বসে থাকে। লোকে কিছু বললে আমাদেরই লজ্জার ব্যাপার।'

'অ, ভারীর মেয়ের কথা বলছ?' তিলক হো হো করে হাসল। 'ছেড়ে দাও, মেয়ের জাত তো, একদিন জলওয়ালা টের পেয়ে বাঁক দিয়ে এক ঘা দিলেই মেয়ে সোজা হয়ে যাবে। কোথাকার প্রেম কোথায় যাবে তার পাত্তা পাবে না।'

চন্দ্রাও হাসল। কিন্তু উচ্ছ্বাসবশত স্ত্রীজাতির স্বপক্ষে ওকালতি করল, 'ইস্ ছাড়ুন, সব মেয়ে একরকম হয় না। ও যদি সত্যিই নন্দীকে কোন কথা দিয়ে থাকে; তাহলে বাঁকের পিটুনিতে কিছুই হবে না। মেয়েমানুষের প্রেম অত ঠুনকো হয় না। জীবনে কাউকে একবার আপন করে নিলে, তাকে ওরা কত যত্নে বুকে করে রাখে, তার আপনারা কি বুঝবেন?'

চন্দ্রা ভেবেছিল আনন্দের আতিশয্যে তিলক হয়তো ওকে জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু কি বলতে তার মুখ দিয়ে কি বেরিয়ে গেছে বুঝতে পারল, যখন সারাটা রাত তিলক মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকল, এবং ভোরবেলাতেই বেরিয়ে গেল।

যে সব মেয়েরা সেদিন বই ফেরৎ দিতে এল তাদের সবার সঙ্গেই তিলক ঠিকমত বই ফিরিয়ে না দেওয়া, পেন্সিল দিয়ে বইতে দাগ দেওয়া, ফিরিয়ে দেওয়ার সময় বইয়ের মধ্যে কি থেকে গেল না দেখে পরে 'দেখি দেখি আমার বইয়ের মধ্যে অমুকটা থেকে গেছে' বলা ইত্যাদি নানা রকম খুঁত ধরে রূঢ় ব্যবহার করল। তার মনে হল ওদের এই লাইব্রেরি থেকে বই নেওয়ার মধ্যেও বিশাল একটা জারিজুরি লুকিয়ে আছে।

প্রথম প্রেমের প্রতি ওরও খুব গভীর অনুরাগ আছে। ও নিজে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ নয়। কিন্তু শুনেছে, প্রথম প্রেমের স্মৃতি সততই মধুর। প্রতিষ্ঠিত জীবনের বিশাল সমুদ্র - কল্লোলিত - সঙ্গীতের ভেতরও প্রথম প্রেমের ক্ষীণতোয়ার কুলুকুলু ধ্বনি মূর্ছনার সৃষ্টি করতে পারে। পারে কোন এক নির্জন মুহূর্তে দেহ-মনকে পুলকিত করতে। অবিশ্রান্ত বর্ষণের পরেও মনে পড়ে যেতে পারে পত্রশীর্ষে দুলতে থাকা ভোরের শিশির বিন্দুটিকে। প্রথম প্রেমকে সে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তাই বলে চন্দ্রাকে প্রথম প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে দিতে সে পারবে কি? উদার হয়েছে বলে সে এতটাই উদার হতে পারবে কি যে তার বাহুপাশের বাইরে মাঝে মাঝেই চন্দ্রা প্রথম প্রেমের স্মৃতির গুঞ্জন স্মরণ করবে? কি করেই বা সে এতটা উদার হতে পারে? যদি কেউ পেরে থাকে তবে তারা মহামানব আখ্যা নিয়ে দূরে থাকুক, আর হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা নিয়ে তিলকরা সাধারণ মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকুক।

টেবিলে মাথা খুঁড়ে তার চিৎকার করতে ইচ্ছা হল — চন্দ্রা, তুমি কেন বোঝ না আমি তোমায় কতটা ভালবাসি? তুমি কেন বোঝ না তুমি যতই আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা করবে ততই আমার কাছে তা স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। তার চাইতে তুমি কেন আমার সামনে নিজেকে মেলে ধর না?

চন্দ্রা এসব কথা ভাবা প্রায় বাদই দিয়েছিল। ছোট ছোট তিনটে কামরার মধ্যে, অল্প বুদ্ধি নিয়ে বিবেকের সঙ্গে লড়াই করে করে ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত ও ভেবে ঠিক করেছিল, একদিন হয়তো কোন একটা দুর্জয় বস্তু ওকে গ্রাস করবে। কিন্তু তা নিশ্চয় মৃত্যুর চাইতে বড় নয়। যদি তা না-ই হয় তবে আর কেন মিছিমিছি চিন্তা করবে। অন্তত, মৃত্যুকে যে কোনদিনই সে নাগালের মধ্যে পাবে। যদি মরতেই হয় তাহলে যে কটা দিন তার হাতের মধ্যে আছে, সে কটা দিন সে তিলকের জন্যই ব্যয় করবে।

গম্ভীর মুখে তিলক বিকেলে বাড়ি ফিরল, চা খেতে বসে লুচিগুলো সে কেবল খুঁটে যাচ্ছিল, খাচ্ছিল না। চন্দ্রা এ বিষয়ে কোন কথাই বলল না, কারণ বলে কোন লাভ নেই। ও জিগ্যেস করল, 'গরম কাপড়টা আনার জন্য পয়সার জোগাড়

করবেন বলেছিলেন, করলেন?'

'কোথায় পাব পয়সা? ছড়িয়ে আছে নাকি!'

'না জোগাড় করবেন বলেছিলেন, তাই জিগ্যেস করছি।'

কতটা নিষ্ঠুর, কতটা প্রতিহিংসাপরায়ণ, কতটা নিচে নামলে এ রকম একটা কথা বলা যায়। সুস্থ মাথায় তিলক নিজেই ভেবে অবাক হতো। ও জানালো, ও একটা কথা, তোমার প্রভাত দাদাটিকে কাল দেখলাম, ওর সঙ্গে আমার ভালই পরিচয় আছে — অনেক দিন থেকেই। ওর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে আনব নাকি?'

প্রথমে চন্দ্রা ভাবল উত্তর দেবে কি দেবে না। উত্তর না দিলে তিলক হয়তো ভাববে প্রভাতের নাম শুনে ও বিমূঢ় হয়ে গেছে। 'আনুন' বললে হয়তো ভাববে প্রভাতের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি করার রাস্তা হওয়াতে ও চট করে রাজি হল। আর যদি 'না' বলে তাহলে ভাববে --

এটুকু ভাবতেই চন্দ্রার অনেক সময় লেগে গেল। তদুপরি সে এত কুশলী অভিনেত্রী নয় যে, যে-নামটা তিলকের মুখে শোনার জন্য ভূতগ্রস্থের মত ভীতা ছিল, সেই নামটা শোনার পরও ভাবলেশহীন মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে।

চন্দ্রার ভেতরে যা-ই হোক না কেন, তিলক দেখল ও একটা পাংশু মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে কোন শব্দ নেই, ও যেন জন্ম বোবা।

'হুঁঃ' বলে একটা শব্দ করে মুখে কাষ্ঠহাসি নিয়ে তিলক বেরিয়ে গেল।

তিলকের সামনে সে যতই সহজ স্বাভাবিক থাকুক না কেন, তিলকের প্রথম দিনের সেই আঁতকে ওঠার পর থেকে একটি মুহূর্তের জন্যও এই চিন্তা চন্দ্রা মাথা থেকে সরাতে পারেনি, এর কারণ কি? ওর বিবেচনায় প্রভাতের প্রশ্নের বাইরে আর কিছু খুঁজে পায়নি। যদি সেটাই কারণ হয়েও থাকে, তবুও তার সমাধান ওর কাছে সহজ ছিল না। তিলকের সামনে প্রভাতের নাম উচ্চারণ করার মত ক্ষমতা ওর জিহ্বায় ছিল না। আর যদি তিলক অন্য কোন কারণ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রে প্রভাতের নাম করার অর্থ দ্বিতীয় একটা সমস্যার সৃষ্টি করা।

আজ সব সন্দেহ দূর হল, তিলক আর নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারল না। তার মানে তিলক চন্দ্রার জীবনের একটা অতীত অধ্যায় পড়ে নিয়েছে। চন্দ্রা শিউরে উঠল।

কিন্তু অতীতের কাদা গায়ে ছিটিয়ে আপনি কেন প্রতিশোধ নিতে চাইছেন? আজ আপনি একবার আমার বুকটা চিরে দেখতে পারেন না, যে অতীত থেকে বুকের মধ্যে আমি আপনার জন্য কোন আবর্জনা পুরে নিয়ে আসিনি? আমার বিষয়ে আপনি যদি কিছু জেনেই ছিলেন, প্রথম দিনই কেন আমাকে পরিষ্কার ভাষায় জিগ্যেস করেননি? এটুকু সাহস আপনার থাকা উচিত ছিল, আর একটি মেয়ের

মুহূর্তের উত্তেজনায় করা একটি ভুলকে ক্ষমা করতে পারাটাও উচিত ছিল। আপনি কেন একবারও ভেবে দেখলেন না যে কি পরিমাণ অন্তরের বিশুদ্ধতা আপনার এই ঘোর অবহেলা সত্ত্বেও আমাকে কাতর হতে দেয়নি?

চন্দ্রার দৈহিক মানসিক শক্তি একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তবু আজ দু-একটা কথা বলার জন্য ও নিজেকে প্রস্তুত করল। 'ভাত আমিই বসাব' বলে ও নন্দীকে পয়সা দিয়ে সিনেমা দেখতে পাঠালো, আর সন্ধ্যার প্রতিটি মুহূর্ত গুণে প্রতীক্ষায় থাকল।

তিলক এল। কোনও ভনিতার দরকার ছিল না, কোন সময় অসময়ের প্রশ্ন ছিল না। চন্দ্রা ডাক দিল 'শুনুন; আমার জন্য আপনার যে কষ্ট হচ্ছে, আমার চোখের সামনে হওয়ার দরুণ আমার পাপের বোঝা বাড়ছে। আপনি পারলে আমাকে বিদেয় করুন। আমার ওপর কি ধারণা নিয়ে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন আমি জানি না। আমার আগের ঘটনা আপনি কি জানেন বা জানেন না, তাও জানি না। আমি যা জানি তাই বলি; অনেক দিন আগে কোন একদিন মাঝরাতে আমি প্রভাতদার কাছে চলে গিয়েছিলাম। সে রাতে তার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছিলাম। সমস্ত ঘটনাটা এখন আর অত ভাল মনে পড়ে না। ঐ দিনটির আগে এবং পরে কি ঘটেছিল আমি বলতে পারব না, কেননা মনে রাখার মত তেমন কিছুই ঘটেনি। আমার কাছে তা ছিল একটি মুহূর্ত মাত্রের ঘটনা। আপনাকে আমার অনেক কথাই বলার ছিল, কিন্তু আপনার সামনে আমার মুখে কোন কথা জোগায় না। কেবল একটা কথা বলে রাখি, আমি যদি আপনাকে সামান্যতমও বঞ্চিত করে থাকি, তবে আপনি ক্ষমা করলেও ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করবে না।'

কিসের জোরে চন্দ্রা এতগুলো কথা বলে ফেলল তা ও নিজেই জানে না; কিন্তু বলা শেষ করেই ও বসে পড়ে নিঃশব্দ কান্নার মধ্যে ডুবে বিহ্বল হয়ে গেল। এ কান্নার যেন শুরু নেই, এ কান্নার যেন শেষ নেই।

অনেকক্ষণ পরে তিলকের ঘোর কাটল। তার চোখ থেকে অঝোর ধারে বয়ে যাওয়া জল ও হাত দিয়ে মুছে ফেলল — চুপিসারে। তারপর চন্দ্রার কাছে উঠে এল। ওর পিঠে হাত রাখতে এই প্রথম তার সঙ্কোচ বোধ হল। তারপর আচম্বিতে ও চন্দ্রার মাথাটা বুকে টেনে নিল, বলল, 'কেবল এই কটা — এই কটা কথা শোনার জন্যই আমি এত দিন বসেছিলাম চন্দ্রা। আমি এত নিচে নামতে পেরেছিলাম কারণ তোমার ভালবাসা আমাকে অনেক উঁচুতে উঠিয়েছিল বলে। আমার মনে আজ কোন ক্ষোভ নেই, কোন দ্বন্দ্ব নেই, কারণ তোমার অন্তরে আমার অদেখা আর বোধহয় কিছুই নেই।'

তিলকের ফুপিয়ে কেঁদে ওঠার শব্দও শোনা গেল।

হারজিৎ

সন্ধ্যার পর পর বিছানাপত্র টানাটানি করে এদিক ওদিক সরিয়ে শোওয়ার ব্যবস্থাটা পাল্টে ফেলা হল। ঘর দুটোর চেহারাও পাল্টে গেল। বেশ একটু নতুন নতুন লাগছিল ঘরের ভেতরটা। এই টানা-হ্যাঁচড়ার পালা সাঙ্গ হওয়ার পর থেকেই মাথার ভেতর পারম্পর্যহীন কিছু ভাবনা, সেই কবে কোথায় দেখা কিছু দৃশ্যপট, যা কি না আসলে কোথায় কখন ঘটেছিল আজ আর মনে পড়ে না — কিন্তু ঘটেছিল — এ রকম কিছু ঘটনা হেমন্তের মনের মধ্যে ভেসে বেড়াতে লাগল। পরীক্ষা এগিয়ে আসছে, পড়ায় মন বসছে না, অতএব পড়ার টেবিলটাকে এক কোণ থেকে আরেক কোণে টেনে নিয়ে, টেবিল-ক্লথটাকে পাট পাট করে তার ওপর বইগুলো গুছিয়ে রাখা হল। একটা পুরনো গাছ চলতে ফিরতে চোখে পড়ত। একদিন তার ডালপালা ছেঁটে একবারে ন্যাড়া করে ফেলা হল। জায়গাটার চেহারাই গেল বদলে। কেমন খাঁ খাঁ করতে লাগল। কাছে একটা কারখানা, তার মেশিনটা ঘরঘর করে সারা দিনমান চলে, শুনতে শুনতে শব্দটা এখন আর কানে বাজে না। হঠাৎ শব্দটা থেমে যাওয়ায় একটা অচেনা অনুভূতি ধাক্কা দিল, এলাকাটা শুনশান মনে হতে লাগল।

এইমাত্র ললিতা অন্য ঘরে শুতে চলে গেল। পিছন থেকে তার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে হেমন্তর মনে পড়ে গেল — বাসের ভেতরে প্যাসেঞ্জারের ঠেলাঠেলি, তারই মধ্যে একটু জায়গা করে ও বসেছে। উরুতে একটা ব্যথা আছে ওর তা সত্ত্বেও ছেলেটাকে কোলে নিতে বাধ্য হয়েছে — দুপাশ থেকে প্যাসেঞ্জারের গুঁতো, বাসের ঝাঁকুনি, মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় মুখটা কুঁকড়ে যাচ্ছে তার; হঠাৎ একটা মোড়ের মাথায় এসে অনেক প্যাসেঞ্জার নেমে গেল, বাসটা প্রায় খালি; ছেলেটাকে পাশের সিটে বসিয়ে হেমন্ত পা দুটো সামনে মেলে দিল, মুখে একটা স্বস্তির শব্দ করে ধীরে ধীরে উরু দুটো টিপতে থাকল সে।

ললিতা দরজাটা বন্ধ করে দেবে না তো? ওদিক থেকে হুক তুলে দেবে না তো আবার? নাহ্, ও তা করল না। পর্দাটা খানিক নড়েচড়ে স্থির হয়ে গেল। সেদিকে

কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হেমন্ত বিছানায় এসে বসল। পা দুটো ছড়িয়ে দিল সে। তারপর একসময় অজান্তেই তার হাত দুটো দুই উরুর ওপর চলতে থাকল।

হঠাৎ কেন এই পারম্পর্যহীন চিন্তাগুলো মাথায় এল, এবার হেমন্ত সে কথাটাই ভাবতে বসল। কোথাকার বাস ছিল ওটা? ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছিল? কারা ছিল সেই প্যাসেঞ্জার? ভীড়, ঝাঁকুনি, যন্ত্রণা। কোলে বসে থাকা ছেলেটা তার নিজের ছেলে ? তারই নিজের সৃষ্টি? কোথায় শুরু, কোথায় শেষ ছিল সেই যাত্রার? কবেই বা আরম্ভ হয়েছিল?

কথাগুলো হেমন্তের স্পষ্ট মনে পড়ে না। কোন দিন, ঠিক কিভাবে, কেমন করে শুরু হয়েছিল সব আজ আর তার মনে পড়ে না। সেই যে— যেদিন ললিতা তাদের ঘরের বারান্দায় তার দাদার ছেলেটার সঙ্গে একটা পুরনো দশ টাকার নোট চলবে কি চলবে না বলে তর্ক জুড়েছিল, দরজার সামনে হেমন্তকে দেখে জিগ্যেস করেছিল, 'দেখ তো হেমন্ত এটা চলবে কি না?' হেমন্ত বাইরে এসে নোটটাকে সূর্যের দিকে ধরে বলেছিল, 'কেন চলবে না, খুব চলবে'; শুনে ললিতা যে হাসতে হাসতে বলেছিল, 'তাহলে তুমিই নোটটা ভাঙিয়ে দাও' — সেদিনই কি প্রথম শুরু? না না, সম্ভবত তারও আগে। ললিতা ওর দাদার মেয়ের সঙ্গে ভোরে বেড়াতে বেরিয়ে ফেরার সময় হেমন্তর বিছানার পাশে বন্ধ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে যে বলত, 'বুড়ো ছেলের এখনও ওঠার নাম নেই' — কিংবা সেই যে একদিন কাজের ছেলেটা রোববারে চুল কাটতে গিয়ে আর ফিরল না — তখন যে ললিতা — 'থাক, তোমার আর উনুন ধরিয়ে দরকার নেই, চা-টা আমাদের এখানেই খেয়ে নিও বলেছিল, সেটাই বোধহয় প্রথম আলাপ। এ রকম অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনার কোন্‌টা আগের কোন্‌টা পরের এখন আর ঠাহর করার উপায় নেই।

ঘটনাগুলো যেন ফেলে আসা দূরের মাঠ পেরিয়ে ভিন গাঁয়ের গাছগাছালির মতই অস্পষ্ট — কোন্ গাছটা লম্বা, কোন্‌টা খাটো বোঝা যায় — কিন্তু কোন্‌টা কাছে কোন্‌টা দূরে বোঝার উপায় নেই। সব একাকার।

একদিন অফিস থেকে ফিরেই হেমন্ত ললিতাকে জিগ্যেস করেছিল, ইন্টারভিউ কেমন হল দিদি?'

বেশ খুশির সুরেই বলেছিল ললিতা, চাকরি পাব না।

কেন?

বয়স পার হয়ে গেছে।

বয়স পার হয়ে গেছে! কেন, কত বলা ছিল বয়স?

আটাশ বছর।

হেমন্ত ভেবেছিল জিগ্যেস করে — আপনার বয়স কত — কিন্তু জিগ্যেস

করেনি। খানিক চুপ থেকে বলেছিল; তাহলে আপনি দরখাস্ত করেছিলেন কি করতে?

কারণ অ্যাডভার্টাইজমেন্টে বলা ছিল স্পেশাল কেসে বয়সের ছাড় দেওয়া হবে।

স্পেশাল কেস মানে?

ও আমিও ঠিক জানি না! ওরা কোন্‌টাকে স্পেশাল কেস ভাবে, তা আমি কি করে জানব। তাই ভেবেছিলাম, কি জানি বাবা, হয়তো আমারও কোন স্পেশাল কেস থেকে থাকবে। সেইজন্যই দরখাস্ত করেছিলাম।

তারপর?

তারপর দেখলাম আমার স্পেশাল কিছু বেরোল না। কথা বলতে বলতে ললিতা বারান্দার কাঠের রেলিংয়ের একপাশে গিয়ে বসল, তারপর চোখে হাসির ঝিলিক তুলে বলেছিল, 'আমি ভেবেছিলাম বোধহয় আমার স্পেশাল কোয়ালিফিকেশন হবে।' শুনে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল হেমন্ত।

মোটেই ভাল ছিল না ললিতার চেহারা! হনুদুটো বার করা, ভাঙা গালে তার টিকলো নাক বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেনি। অবশ্য চোখ দুটো বেশ বড়সড়। শ্যামলা শরীরের এখানে সেখানে বেশ কয়েকটা তিল। মেয়েটা ঢ্যাঙা কিন্তু গতরে মাংস বড় কম। হেমন্তর প্রায়ই মনে হত এই নাক, এই মুখ, এই রঙের তো অনেক মানুষ হয়, তবে সেই একই জিনিসেই ললিতার চেহারাটা দেখতে খারাপ হয় কি ভাবে? আসলে কিসের অভাবে একে দেখতে খারাপ বলা হয়?

একদিন হেমন্ত জিগ্যেস করেছিল, কি করবেন এবার? বাড়ি ফিরে যাবেন?

ললিতার নিজের কোন প্ল্যানই ছিল না। দাদা ইন্টারভিউ দিতে ডেকে পাঠিয়েছিল, তাই এসেছিল। এখন দাদাই আবার বলছে— ছেলেমেয়ে দুটোর পরীক্ষা সামনে, পরীক্ষা পর্যন্ত থেকে ওদের একটু দেখিয়ে দিয়ে যা। সুতরাং ললিতার থাকতে হবে, এবং ছেলেমেয়ে দুটোর টিউশনি চালাতে হবে।

ওদের পড়াতে শুরু করে ললিতা বুঝতে পারল, পরীক্ষাটা যেন তারই আরম্ভ হয়েছে। হেমন্ত প্রশ্ন করেছিল, কেন কি হয়েছে? উত্তরে ললিতা বলেছিল, ওদের বোঝাব কি, আমি তো নিজেই কিছু বুঝি না ছাই।

এটা আপনার বেশি বেশি, হেমন্ত বলেছিল।

ওরা ক্লাশ এইট-নাইনের — কথা শেষ করতে দেয়নি ললিতা — হলে কি হবে, আমরা এসব কিছুই পড়িনি। আমাদের সময় এসব ছিল না। এখন তো কোর্স একেবারে পাল্টে গেছে।

গায়ে গায়ে লেগে থাকা সরকারি কোয়ার্টার। পুরো একটা নিয়ে থাকে ললিতার দাদা। পাশেরটার আধখানা নিয়ে হেমন্ত। ব্যাচেলার, তাই ফুল কোয়ার্টার পায়নি হেমন্ত। একদিন হঠাৎই তার মনে হল এই দেড়খানা কোয়ার্টার মিলে যেন

একটা বড় কোয়ার্টার হয়ে গেছে। মাঝখানের হাত চারেক খালি জায়গাটা যেন ললিতার দৌড়ঝাঁপের সুবিধার জন্যই রাখা। নিজেদের ঘরের শেষ দুটো ধাপে তার পা-ই পড়ে না আর হেমন্তের কোয়ার্টারের একটা মাত্র সিঁড়ি ছুঁয়েই ললিতা পৌঁছে যায় হেমন্তের ঘরে। পারলে সবকটা ধাপ বাদ দিয়ে একলাফেই পৌঁছে যেত ললিতা। হাতে স্কুলের বইখাতা গাদা করা, আর সেই গাদাব মধ্যে পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যা। বায়ুমণ্ডলের চাপ, এ প্লাস বি হোল কিউব, দণ্ডচুম্বকের চৌম্বকক্ষেত্র, ওয়ার্ডসওয়ার্থের না দেখা 'ইয়ারো' — দেখার পর লেখা কবিতা —। মহাবিপাকে পড়ে যায় হেমন্ত, বলে, এসব তো আমি কিছুই জানি না। ললিতা শোনে না। বলে তুমি একটু পড়ে দেখলেই পারবে। তোমার মাথা আছে।

প্রথম দিকে ললিতার দাদার ছেলেমেয়ে দুটোও ললিতার পিছু পিছু আসত। ওরা দুজনে টুল দুটোয় বসাতে ললিতাকে হেমন্তর বিছানায় বসতে হত। পরে ছেলেমেয়ে দুটো কখনও-সখনও আসত। ললিতার কিছু ঠিক ছিল না, কখনও টুল খালি থাকা সত্ত্বেও দু'পা তুলে হেমন্তর বিছানাতেই বসতো, আবার কোন সময় পড়ার টেবিলটার কোণায় আধোবসা থেকেই ঘণ্টা আধেক পার করে দিত।

একদিন হঠাৎ হেমন্তর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'বুঝলেন দিদি, আপনি এসব চাকরি-বাকরির ধান্দা ছাড়ুন। তার চেয়ে একটা বিয়ে-টিয়ে করে সংসার পাতুন। সেট্‌ল্‌ড হয়ে যান।'

'অ্যাঁ, কি বললে।' বিস্ফারিত হল ললিতার চোখ। বেশ খানিকটা সময় হেমন্তর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল, 'লোকে বলে আমার নাকি মুখের কোন লাগাম নেই, কিন্তু তুমি তো দেখছি আমার চাইতেও এককাঠি ওপরে।'

'আমি এমন কি খারাপ বললাম?' বলেই হেমন্ত বুঝতে পারল ভুল হয়েছে। মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হল।

ললিতা তরল কণ্ঠে ঝাঁকিয়ে উঠল, 'না না, এমন কিছু খারাপ বলনি। তবে কথা কি জানো, আমাকে আজকাল আর কেউ এসব কথা বলে না। আমাকে আর এখন এসব বলার কোন মানেই হয় না।'

হেমন্ত সসঙ্কোচে উত্তর দিল, 'না না, আপনি মিছিমিছি এর'ম ভাবেন।'

ঝেঁজে উঠেছিল ললিতা, 'যাও যাও, তোমাকে আর আমার মন জোগানো কথা বলতে হবে না। সময়ে কাজে না লাগায় জমাট বেঁধে যাওয়া সিমেন্টের বস্তা দেখেছ? ওগুলো শেষে বর্ষার কাদা-উঠোন পার হতে লোকের পা রাখার কাজে লাগে।' হাসিতে ফেটে পড়েছিল কথাটা বলে। হাসি যেন তার থামতেই চায় না।

এক নিঃঝুম দুপুরে হেমন্ত বিছানায় শুয়েছিল, ললিতা একটা অ্যালজেব্রার খাতা সামনে নিয়ে কাছেই বসেছিল। অ্যালজেব্রা বইয়ের একটা ফর্মূলা দেখার নামে হেমন্ত অন্য কিছু ভেবে চলেছিল। ভেতরে ভেতরে তার একটা উত্তাপ জমা হচ্ছিল।

মনটা অস্থির। হঠাৎই তার মনে কেমন একটা সাহস দানা বাঁধল। মুখে একটা অস্বাভাবিক হাসি ফুটিয়ে হেমন্ত আস্তে আস্তে বলল, 'আপনার আঙুলগুলো ধরলেই বোঝা যায় আপনি খুব কাজ করেন — মশলা পেষেন, কাপড় ধোন, তরকারি কোটেন, খালি হাতে গরম বাসনকোসনও ধরেন —

'কেন, গরমে রস শুকিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে?' কেমন একটু অপ্রতিভ হেসে শুধোয় ললিতা।

এর কিছুদিন পরে একদিন ললিতা হেমন্তকে বলে, 'তুমি আর আমাকে দিদি বলো না, আর আপনি করেও বলতে হবে না।'

'তবে কি বলে ডাকব?' হেমন্ত সহজ সুরেই প্রশ্ন করেছিল।

'আপাতত কিছুই বলতে হবে না।' জবাবটা এড়িয়ে গেল ললিতা।

এই ঘটনার পরবর্তী দিনগুলিতে হেমন্তের অস্থিরতা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হল।

একদিন ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে অস্ফুটে জিগ্যেস করল, 'তোমার দাদা বৌদির ঘুম খুব পাতলা নাকি?'

'না না, ওদের দুজনেরই ঘুম খুব গাঢ়।'

এরপর একদিন ভোররাতে ললিতা হেমন্তের কানে কানে বলেছিল, 'তুমি একটা ফুল কোয়ার্টারের জন্য চেষ্টা করছ না কেন?'

'মানে আমাকে এখান থেকে তাড়াবার মতলব করছ নাকি?'

'না না, হাজার হোক এ হচ্ছে হাফ্। হাফ্ সব সময়ই হাফ্। ফুল ফুলই। ফুলের ব্যাপারই আলাদা।'

হঠাৎই হেমন্তর সমস্ত শরীরে একটা ঝিলিক খেলে গেল। তার মনে হতে লাগল হাত পা ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছে — সে সাবধান হল এ শিথিলতা যেন ললিতা আঁচ করতে না পারে। সময় যত এগোতে থাকল একটা গভীর সন্দেহ তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। ফলে তার সমস্ত শরীরে একটা ঝিম ঝিম বিবশতা।

সকালে অনেকক্ষণ পর্যন্ত হেমন্ত তার ঘরের জানালা খোলেনি। দরজাটা ললিতা যেমন আটকে রেখে গিয়েছিল তেমনি ছিল। অসাড় দেহে হেমন্ত কখনও বসে, কখনও দাঁড়িয়ে থেকে ভেবে যাচ্ছিল, ফুল কোয়ার্টার? ললিতা ফুল কোয়ার্টারের কথা বলে, কেন বলে? কে থাকবে ফুল কোয়ার্টারে?

দুপুরবেলায় অফিসে বসে হেমন্তর মাথাটা ভার ভার ঠেকছিল। একবার সে ভাবল, ঘুমের ক্ষতি হয়েছে বলেই হয়তো এ অবস্থা, একবার ভাবল ঘরে গিয়ে একচোট ঘুমিয়ে নিলে হয়। কিন্তু তার ঘরে ফিরতে ভয় হল। অফিসের ছুটির পরও তার ঘরে ফিরতে মন চাইল না। হোটেলে চা খেয়ে এক বন্ধুর বাড়িতে বসেই রাত নটা বাজিয়ে দিল সে। নটার পরে ঘরে ফিরে দেখে, রাতের খাওয়া

সেরে কাঠের রেলিংটার ওপর হেলান দিয়ে বসে আছে ললিতা। বোধ করি হেমন্তের জন্যই।

সে সময় হেমন্ত অনেকবার ভেবেছে, নাহ্, ললিতার কথায় চিন্তিত হওয়ার কোন কারণই নেই। হয়তো এমনিই, নেহাৎই বলার জন্যই ফুল কোয়ার্টারের কথা বলেছে সে — বিশেষ কোন উদ্দেশ্য না-ও থাকতে পারে। জমাট সিমেন্টের বস্তা — সেটাও তো ওর নিজের কথা। ভাবতেই হেমন্তর মনটা বেশ হাল্কা হয়ে যায়, ফুরফুরে লাগে। অফিসের আর্ধেক কাজ ফেলে রেখে তার ঘরে ফিরতে মন চায়; একটা নির্জন দুপুরের লোভে। সে চলেও আসে।

কিন্তু যেদিন অস্ফুট স্বরে ললিতা তাকে জানিয়েছিল, 'তুমি তো জানোই এমনিই আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর বেশি দেরি করতে আমার ভাল লাগছে না,' সেদিন হেমন্ত পালানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠল।

'মানে?' হেমন্ত ভেবেছিল ঝেঁজে উঠবে, কিন্তু মুখে কোন শব্দ না করে সে ললিতার দিকে চেয়ে থাকল। খানিকক্ষণ তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি ব্যাপারটাকে অন্য ভাবে, মানে সিরিয়াসলি নিয়েছ মনে হচ্ছে?'

'মানে?' ললিতার স্বরের এই তীক্ষ্ণতা হেমন্তর অজানা।

কোন জবাব দেয়নি হেমন্ত। এর পর ক'দিন হেমন্ত ঘরে ফেরেনি। সেই বন্ধুটির সঙ্গে থেকে অফিস করেছে। সে সময় আরেকটা কথাও তার মনে হয়েছে, সে কেন এভাবে এড়িয়ে চলছে? এড়িয়ে বেড়ানো মানেই পালিয়ে বেড়ানো। কিন্তু কিসের ভয়ে সে পালিয়ে বেড়াবে? ললিতা কি স্কুলের মেয়ে যে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে তাকে ও ফুঁসলেছে? না কি ছলে বলে জঙ্গলের হাতি বশ করে দয়ে ফেলেছে? ফেলেনি। সেরকম কিছুই সে করেনি। ললিতাও খুব ভাল করেই জানে এটা একরকমের খেলাই। অনেকটা বুনো মোরগ শিকার করার মত। কিংবা জমাট সিমেন্টের বস্তাকে মাথার বালিশ করে শোওয়ার মত একটা অস্বাভাবিক খেয়াল। অতএব তার ভয়টা কিসের?

এ রকম ভাবতে শুরু করে একসময় তার সাহসের তীব্রতা বাড়ে, সে ঘরে ফেরে। ঘরে যতক্ষণ থাকল নিজেকে নির্ভীক, সাহসী দেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালাল। কিন্তু আসলে সর্বদাই উৎকণ্ঠা নিয়ে উৎকর্ণ থাকল। পরে ললিতা এল, অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। একসময় তার গাল বেয়ে দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে এল। প্রথমে আঁচলে মুখ চেপে, তারপর টেবিলে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। কাঁদতেই থাকল। কান্না, কান্না আর কান্না। এ কান্নার যেন শেষ নেই। হেমন্ত প্রথমে বিরক্ত, তারপর বিমূঢ়, তার ওপরে বিচলিত এবং অস্থির হয়ে পড়ল। মেয়েটা অশ্রুপ্রপাতে ডুবে রুদ্ধশ্বাস হয়ে মরবে নাকি? আর সেই প্রপাতের ধারা হেমন্তই খুলে দিয়েছে নাকি? একটা অনুতাপ বোধ জুড়ে বসল হেমন্তের মনে।

ললিতার পিঠে হাত রেখে ধীরে ধীরে সেও নেমে পড়ল চোখের জলের সেই ধারা প্রপাতে। অবশেষে ভালবাসায়, ভালবাসার কথায় কথায় ভোলাল তাকে। শেষে ললিতা একবারটি হাসল।

হেমন্তকে কিন্তু তারপর থেকেই একধরনের অস্থিরতা ঘিরে রইল। একটা উদ্‌ভ্রান্তি পেয়ে বসল তাকে। ললিতার সেই অদ্ভুত হাসিটা, সোনালি সুতোর কাজ করা দামি কাপড়ের আঁচলের আড়ালে সেই হাসিটা কখনও লুকোয়, আবার কখনও একটা ফুল কোয়ার্টারের টেবিলে ফুটে ওঠে। ক্ষোভে রাগে একেকদিন অফিসের টেবিলের সামনে বসে কলমের নিবটাকে কাগজের ওপর প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টানে দুমড়ে দিতে ইচ্ছা করত তার —

এর চাইতে একটা অচেনা জায়গায় ট্রান্সফার নিলে কেমন হয়, যেখানে সহজে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না? এসব করার আগে সে একটা লম্বা ছুটির দরখাস্ত করল এবং ভাবতে থাকল ছুটির দিনগুলি কোথায়, কিভাবে কাটাবে। যাওয়ার যে তার খুব বেশি জায়গা ছিল, তা নয়। তাই কলেজ হস্টেলের ছেলে যেমন ছুটিতে বাড়ি যায় সেও তেমনি নিজের বাড়িতে গিয়ে উঠল।

এরই মধ্যে একদিন ললিতার দাদা গিয়ে হাজির তাদের বাড়িতে। থিংগ্‌স হ্যাড গান টু ফার। ঘটনা অনেক দূর গড়িয়েছে। বালিসের নিচে চিঠি রেখে ললিতা একগাদা ট্যাবলেট খেয়েছে। হসপিটালের ডাক্তার বমি করিয়ে বার করার পরও দু'দিন বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল ললিতা।

হেমন্তর দাদা প্রচণ্ড ক্ষেপে গেলেন। তিনি ললিতার দাদার সঙ্গে এসে ললিতাকে দেখে গেলেন। ছি ছি। না না, এ কখনও সম্ভব নয়। কুৎসিৎ, হেমন্তর চাইতে নয় নয় করেও ছ'সাত বছরের বড়, বুড়ি। সব শুনে হেমন্তর মা দিনরাত থেকে থেকেই কাঁদেন। তিন সন্ধ্যা তো ভাতই খেলেন না। এবং বারবার হেমন্তর স্বর্গত পিতৃদেবকে স্মরণ করলেন। হেমন্তর দাদার বয়স ত্রিশ। বিয়ে ঠিক করাই ছিল। কথা ছিল পাত্রী বি.এ. পরীক্ষা দেওয়ার পর বিয়ে হবে। কিন্তু এখন আর দেরি করা যায় না। বি.এ. পরীক্ষা পরেও হতে পারবে। আপাতত হেমন্তর বিয়ের রাস্তাটা পরিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজন। অতএব —।

তখন থেকেই হেমন্ত ধীরে ধীরে চুপ মেরে গেল। বাড়ির সবাই বাধা দেওয়া সত্ত্বেও হেমন্ত নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এল চাকরিতে জয়েন করতে। এক এক সময় নিজেই ভাবত জমাট সিমেন্টের এত আঠা? কখনও ললিতার বালিশের তলায় লিখে রাখা চিঠিখানা পড়তে মন গেল। কখনও বা সত্যিই মনে হল থিংস হ্যাড গান টু ফার। জল অনেক দূর গড়িয়েছে। ওর দাদার বিয়ে হয়ে গেল। বিশ বছরের নতুন বৌদিটি তাকে একটা তসরের পাঞ্জাবি উপহার দিল। বিয়ের কিছুদিন আগে থেকেই হেমন্তর সামনে বহু মেয়ের ফটো ধরা হল। দুজনকে সশরীরে ওর

সামনে হাজির করা হল। উনিশ-বিশ-বাইশের সতেজ মেয়ে। মিলবে, প্রত্যেকের সঙ্গেই হেমন্তর জুড়ি মিলবে। ২৭ বছরের সুন্দর চেহারার লম্বা চওড়া যুবক হেমন্ত। সবাই তার সঙ্গে জুড়ি মিলিয়েই মেয়ের খোঁজ আনছে। যাতে দুজনকে পাশাপাশি রাখলে বিয়ের পর বরকনের তোলা ফটো বলেই মনে হয়। এখন শুধু হেমন্তর কাকে ভাল লাগে এই কথাটুকুর অপেক্ষা।

'এখন বাদ দাও তো এসব। আমাকে এখন বিরক্ত করো না —।' এ জাতীয় দু-একটা কথার বাইরে হেমন্ত আর কিছুই বলল না। নির্জনে দুই একটা ফটো গোপনে বার করে দেখেনি যে তা নয় — কেউ নরম, ফুলের মত, কেউ উগ্র, বহ্নিমানা, উচ্ছল আবার কেউ যেন পূর্ণ হবে হবে। ফটোগুলো ঢুকিয়ে বাক্সটায় তালা মারে হেমন্ত। ললিতা আজকাল সব সময় ঘুরঘুর করে। চোখ বন্ধ করে কপালে আঙুল বোলাতে থাকে।

তারপর এক সময় তার নিজেরই মনে হতে লাগল এই মেয়েগুলো নেহাৎই বাচ্চা, মিনমিনে, ডলপুতুল মার্কা। ছবিতে দেখা পিছনে ডানা লাগানো, হাতে ফুল থাকা অন্য জগতের মেয়ে দুটোর সঙ্গে এদের খুব তফাৎ নেই। এই নাক এই মুখের চেহারায় তো কত মেয়ে আছে, তবে ললিতা অসুন্দরী কোন্ অর্থে? এই জাতীয় বিচারের কোন অর্থ নেই। সব বাজে কথা।

ক্রমাগত এইভাবে চোখ বুজে কপালে আঙুল চালিয়ে যাওয়ার শক্তি, সময় হেমন্তর বেশি দিন হল না। একদিন ফ্ল্যাট কোয়ার্টারের জন্য দরখাস্তে সই করে বসল সে।

ফ্ল্যাট কোয়ার্টার জুটে গেল তার। তারপর একদিন হঠাৎই সে বুঝতে পারল, এই ফ্ল্যাট কোয়ার্টারের বাইরে তার আর কিছুই থাকল না। মা জানিয়ে দিয়েছেন আর কোন দিন ওর মুখদর্শন করবেন না। বাকি আত্মীয়-পরিজনরা সেটুকু জানানোরও প্রয়োজন বোধ করেনি। ফ্ল্যাট কোয়ার্টারের বারান্দাটার এক কোণে বসে সে তাদের কুঞ্চিত মুখগুলো বেশ দেখতে পায়। সে ভেবেছিল, তার তিন বছরের বড় দাদা অন্তত এখানে এলে আগের মতই ওর ওখানে একরাত থেকে যাবে। না থাকেনি। সে খবর পায় দাদা মাঝে মাঝে আসে, হোটেলেই থাকে।

বন্ধু-বান্ধবের প্রতি আকর্ষণ আপনা থেকেই হেমন্তর ইদানীং কমে গেছে। ওরা সবাই কেমন বাচ্ছা পুতুলমার্কা মেয়েদের নিয়ে সংসার করে চলেছে। তারা প্রথম পরিচয়ে ললিতার দিকে খানিকটা ঢ্যালার মত চেয়ে থাকে, তারপর শ্রদ্ধাবনত একটা ভাব দেখায় আর সম্মানজনক দূরত্ব রেখে কথা বলে। এই মানুষগুলোকে হেমন্তর অসহ্য মনে হয়। কারুকেই আজকাল ভাল লাগে না ওর। এমন কি পথেঘাটে চলাফেরা করা লোকজনদেরও ওর পছন্দ হয় না আজকাল। ওরা মুখে কিছু না বললেও, ওরা কি বলতে চায় তা হেমন্তর কাছে জলের মত পরিষ্কার।

এই যে সেদিন ললিতা আর ও রিক্শা করে বড় রাস্তায় ঘুরল সেদিন

লোকজন নিশ্চয় বলাবলি করে থাকবে, লোকটা দিদিকে নিয়ে হাসপাতালে চলেছে। কিংবা ধরা যাক সেদিন যে রাতের শেষ শোতে ললিতা আর ও সিনেমা দেখে ফিরল, ওদের দেখে ওরা নিশ্চয় একবার ভেবেছে এই ছেলেটা এই মেয়েমানুষটাকে কোত্থেকে জোগাড় করেছে। নাহ্ এ আর ভাল লাগে না। ভাল লাগা তো দূরের কথা, অসহ্য বোধ হয়। তার চেয়ে এই চারদেয়ালের মধ্যের জায়গাটুকুই অনেক নিরাপদ। দিনকে দিন চারপাশে ছেলেমানুষের আর ন্যাকাদের ভিড় বাড়ছে। ওদের দেহে মনে বিরক্তিকর ধরণের অপরিপক্কতা।

এরপর থেকে হেমন্ত প্রায় স্তব্ধ, নির্বিকার হয়ে গেছে। গ্রামের গাছপালা, মাঝে মধ্যে ছোট ছোট কুঁড়ে — এইসব পিছনে ফেলে দূরের পাকা রাস্তায় ওঠার জন্য সে যেন এক বিস্তীর্ণ ধূ ধূ প্রান্তরের ওপর দিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে তো চলেছেই।

বিয়ের কিছুদিন পর ললিতার ছেলে হল। এই ঘটনাটা হেমন্তের খরা জীবনে সেচের জন্য একটা ফিডার ক্যানালের জল পাওয়ার মত। অন্তত একটা ব্যাপারে এই ঘটনাটা তাকে খানিকটা সুবিধা দিল। দেয়াল কটার মধ্যে তার জন্য কিছু কাজ জুটল, ওর নিঃসঙ্গ জীবনে একটা পরিবর্তন এল। একবার সে ভেবেছিল, হোক, একগাদা সন্তানের জন্ম হোক, ওদের আড়ালে ললিতা ঢাকা পড়ুক। ওদের হৈ-হল্লায় চাপা পড়ে যাক দীর্ঘশ্বাসের করুণ কান্না। কিন্তু সেটা হতে গেলে ললিতাকে বড় বেশি প্রশ্রয় দিয়ে ফেলা হবে যে, তার অস্তিত্বকে বড় বেশি স্বীকার করে নিতে হবে। এ সবে তার মন সায় দেয় না। একটা অভিমান ঘিরে থাকে তার চারপাশে।

ছেলেটার বয়স যখন বছর তিনেক, তখন ললিতারও একবার মনে হয়েছিল আরেকবার ব্যস্ত হয়ে পড়লে ক্ষতি কি, সংসারের বন্ধনটাকে আরও আঁট করা যাক। হেমন্তকে আরও খানিক ঘনিষ্ঠ করে নেওয়া যাবে। কিন্তু হেমন্তর দিক থেকে কোন উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া না পেয়ে শেষ-মেশ চুপ হয়ে গেল।

আজকাল বেশির ভাগ সময় ললিতা চুপ থাকাই পছন্দ করে। তার বিশেষ কোন অভিযোগ নেই। যেন একটা ফুল কোয়ার্টার তার দরকার ছিল, পেয়ে গেছে, ব্যস। অথচ যখনই হেমন্তের মনে হয় ললিতা কোন অভিযোগ করে না, তখনই বিরক্তিতে ফেটে পড়তে চায় সে। ঠিকই তো, এখন আর কি জন্যই বা অভিযোগ। ললিতা হেমন্তের মনের কথাটা বুঝতে পারে। তাই হঠাৎ কখনও নিজেই স্পষ্ট কাটা কাটা কথায় ধীরে ধীরে বলে, তুমি পস্তাচ্ছ, একটা বাজে বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছ, এইসব চিন্তায় তুমি ব্যতিব্যস্ত। ব্যাপারটা একটু কম প্রকাশ করলে ভাল হয় না? অন্তত ভদ্রতার খাতিরে? আমাকে অবহেলা করে, আমাকে শাস্তি দেওয়া, আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া এগুলো একটু কম দেখিও। যা বোঝার সে তো আমি বুঝতেই পারি।

এরই মধ্যে হেমন্তর মা'র মৃত্যু হল। খবর পেয়েই হেমন্ত বাড়ি যাওয়ার জন্য অফিস থেকে ছুটি নিল। একবার ভাবল ললিতাকে নেবে কি না। ললিতা ভাবল সে

যাবে কি না। ভেবে হেমন্তের অনেক আগেই সে ঠিক করল, সে যাবে। গিয়েছিল, ছেলেটাকে নিয়ে ওরা দুজনেই গিয়েছিল। সেই প্রথম সবাইকে নিয়ে নিজের ভিটেতে বারো দিন থাকল হেমন্ত। ঐ বারো দিন ওকে দাড়িগোঁফ কামাতে হয়নি বলে ও স্বস্তি বোধ করেছিল। অন্তত চেহারাটা একটু বাজে দেখাবে। ফল হল উল্টো। হেমন্ত বুঝল লোকের চোখে এখনও সে একটি সুন্দর যুবাপুরুষের প্রতীক। তার বৌদির অযত্নচর্চিত চেহারা, শ্রীহীন কাপড়-জামা সত্ত্বেও সে যেমন তাকে সুন্দরী বলে জানতে পারে, তার অবস্থাও লোকের চোখে সেই রকম। হেমন্তর ছুটি ছিল পঁচিশ দিন, কিন্তু চুল দাড়ি কামিয়ে পরিষ্কার হওয়ার পর ঘষে-মেজে তেলসাবান দিয়ে বৌদির তৈলচিক্কণ চেহারাটা দেখার পর হেমন্ত যেন সেখানে আর একমুহূর্তও তিষ্ঠোতে পারল না। নিজেকে বড় দীন মনে হল। একধরণের হীনমন্যতায় ম্রিয়মান হল সে। ফলে মানুষজনের ভিড় থেকে একরকম পালিয়ে বাঁচল সে।

তারপর আবার সেই বিস্তীর্ণ ধূ ধূ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পথ চলা। মাঝে একবার হেমন্তর মনে হল ছেলেটার জন্য একটা আলাদা ঘর দরকার। যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। কিছুদিন কাজটা নিয়ে বেশ দৌড়ঝাঁপ করে কেটে গেল। ছেলেকে নতুন ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে তার খেয়াল হল সামনে ছেলের ম্যাট্রিক পরীক্ষা, ওকে একটু তৈরি করা দরকার, যেই মনে করা অমনি পঁয়তাল্লিশের লোকটা একটা সতেরো বছরের ছেলের মত স্কুলের বই নিয়ে পড়া শুরু করে দিল। ঘরে এসে কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকলে ললিতা ভাবে তাকে অবহেলা করা হল। তাকে অবহেলা করা হয় না, এটা বোঝাতে গেলে এ জাতীয় কাজের বাইরে অন্য কাজ নেই। এর মধ্যে ললিতা সত্যিই জমাট বাঁধতে শুরু করেছে।

সবশেষে সেই দুর্ঘটনাটা। হেমন্তর দাদার আকস্মিক মৃত্যু। গত দু'মাস দাদার সংসারটাকে ঠিকঠাক ধরে রাখতে ব্যস্ত হেমন্ত। আত্মীয়-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার অপরাধবোধ অনুতাপের প্রায়শ্চিত্ত হল যেন। ব্যস্ততা তাই যেন বড় বেশি। অর্থাৎ, কোন চিন্তা করো না বৌদি, আমি আছি।

দাদার দুই মেয়ে, তারা অনেক দূরে পড়াশোনা করে। পড়ুক। তারা সেখানে থেকেই পড়ুক। ওদের কিছু বুঝতে দেওয়া চলবে না। দাদার জমানো এবং পাওনা টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করা থাক, ঘরটা ভাড়া দিয়ে ঘর ভাড়া আর সুদেই চলে যাবে। বৌদির জন্য চিন্তা কি, বৌদি থাকবে হেমন্তর কাছে।

সেই রকমই ব্যবস্থা হল। ছেলের ঘরটা বৌদিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হেমন্তই সব তদারক করেছে। কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। যখন যা দরকার —। আটত্রিশ বছরের সুন্দরী বৌদি নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ান। তার যেন আর কিছুই চাই না।

আজ বিকেলে বৌদি একবার বলেছিল, রাতে তার বড় ভয় লাগে। ঘুমের

মধ্যে উল্টোপাল্টা স্বপ্ন দেখেন। জেগে থাকলে মাথায় নানা রকম দুশ্চিন্তা আসে। আসলে একলা শুতে তাঁর —

হেমন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। কোন চিন্তা করো না বৌদি, ও আজ থেকে তোমার সঙ্গে শোবে। কি বল ললিতা? সেই ভাল হবে, তাই না? হুম।

তারপর খাটবিছানা টানা-হ্যাঁচড়া হল। এ ঘরের ছোট খাটটা ওঘরের খাটের সঙ্গে জুড়ে বড় করা হল। ছেলেটার জন্য একটা নতুন খাট বানাতে হবে। দরকার হলে বৌদির ওখান থেকে কিছু ফার্নিচার আনা যাবে'খন। সে পরের কথা। এ কদিন হেমন্ত ছেলের সঙ্গে ডাবলবেডের খাটটায় শোবে। আর ও ঘরের বড় বিছানাটায় ললিতা আর বৌদি। হবে না? বেশ হবে।

এই একটু আগে ললিতা বৌদির সঙ্গে শোওয়ার জন্য চলে যাওয়ার সময় পিছন থেকে ললিতাকে দেখে হেমন্তর মনে কিছু অভাবনীয় চিন্তা এল। ও বিছানায় পা দুটো মেলে দিল, ওর হাত দুটো ওর অজান্তেই উরু দুটোর ওপর ঘোরাফেরা করতে থাকল।

হঠাৎই তার মনে একটা খুশির ছোঁয়া লাগল। একটা স্বস্তির ভাব। তার মনে হল, দুজন অসহায়া মহিলাকে এক জীবনে সাহায্য করতে পেরেছে সে। মনটা অনেক হাল্কা লাগে তার।

বই পড়তে পড়তে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। হেমন্ত ছেলের হাত থেকে বইটা সরিয়ে নিয়ে পরম যত্নে লেপটা টেনে তার কান অব্দি ঢেকে দিল।

পিকনিক

প্রভাকরের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বেশ কয়েকজনই ডাক্তার। কিন্তু স্ত্রী রমার এই সব ছোটখাট, টুকটাক অসুখ-অসুবিধা, নতুন নতুন উপসর্গের কথা ওদের বলতে ইচ্ছে হল না। এই অল্পবয়সী ডাক্তারদের কোন বিশ্বাস নেই। ওরা রমাকে পরীক্ষা করবে, পঞ্চাশটা প্রশ্ন করবে। তারপর পরীক্ষা করে কি পাওয়া গেল, রমা কি বলল, এ সমস্ত কথা ওদের বউদের কাছে গল্প করবে, তারা আবার আশেপাশের বান্ধবীদের বলবে, সেই বান্ধবীদের কোন একজন প্রোগ্রেসিভ লেডিজ সোসাইটির অ্যানুয়্যাল কনফারেন্সে জমায়েত কোন একজনকে জানাবে, তারপর পনেরো দিনের মধ্যে সব জায়গায় ছড়িয়ে যাবে, রমার — রমা চৌধুরীর, — মানে আরে এই যে প্রভাকর চৌধুরীর স্ত্রী — তার এখন — ইয়ে, কিন্তু ইন্টারেস্টিং কথা হচ্ছে — মাঝে মাঝে বলে ওর — ইত্যাদি।

এই ডাক্তারদের বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু ডাক্তার একজন তো লাগবেই। অতএব প্রভাকর একজন নাম করা বৃদ্ধ ডাক্তারকে ধরেছে। বৃদ্ধ ডাক্তারের রোগীর সংখ্যা অগুনতি। কার কি উপসর্গ, কোন্ রোগী কি বলল, এসব নিয়ে তামাশা করার তাঁর সময় সুযোগও নেই আর মনে প্রয়োজনীয় রসও নেই।

কিন্তু প্রভাকরের মুশকিল হল —রমা প্রতিদিনই কিছু বিচিত্র, অদ্ভুত উপসর্গের কথা বলে, আর সে সবের ব্যাখ্যা খুঁজতে বৃদ্ধ ডাক্তারের কাছে রোজ দৌড়তে ভাল লাগে না। কি করা যায়, এ-নিয়ে যখন চিন্তা করছিল, তখনই ওর হাতে একটা বই পড়ল। কোন এক প্রসিদ্ধ ডাক্তারের লেখা প্রকাণ্ড বই। শঙ্খিনী, হস্তিনী ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর নারীর লক্ষণ আর দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্য থেকে আরম্ভ করে বাচ্ছার দাঁত গজানোর সময়ে হওয়া অসুখ এবং তার জন্য উপযুক্ত সতর্কতা সম্পর্কে অজস্র বিষয়ের আলোচনা, ইংল্যান্ড আর আমেরিকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর মনোবিজ্ঞানীদের মন্তব্যে পৃষ্ঠাগুলো ঠাসা। দিনদুয়েক বিকেলে গভীর আগ্রহে বইটার পাতা ওল্টানোর পর প্রভাকর ঠিক করল, কথায় কথায় বৃদ্ধ ডাক্তারটির কাছে দৌড়নোর কোন দরকার নেই, রমার ছোটখাটো উপসর্গের জন্য এই বইটাকেই ও অভিধানের মত ব্যবহার করবে।

একদিন বইয়ে কোন এক পৃষ্ঠায় প্রভাকর দেখল, গৃহিণীর এ রকম অবস্থায় ঘরে একটু ব্র্যান্ডি রাখা ভাল। কখনও হঠাৎই রোগিনীর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে চায়ের চামচের এক চামচ —। তদুপরি মাঝে মাঝে আধ কাপ গরম জলে এক চামচ ব্র্যান্ডি মিশিয়ে, একটুকরো পরিষ্কার তুলো জল আর ব্র্যান্ডির মিক্সচারে ডুবিয়ে সেটাই আস্তে আস্তে — ইত্যাদি।

প্রভাকর স্থিরনিশ্চিত হল, অল্প ব্র্যান্ডির ব্যবস্থা রাখা ভাল। কিন্তু এ শহরে এক বোতল ব্র্যান্ডি যোগাড় করা ওর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। ওর আশঙ্কা, হঠাৎ হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামলে উপায়ান্তর না পেয়ে যদি কাছের মদের দোকানের বারান্দাতেও ও আশ্রয় নেয় তো পরদিন মদ্যপ বলে ওর বদনাম ছড়াতে পারে। সুতরাং এ শহরে ও সে কাজ করার চেষ্টাই করল না। একবার অফিসের কাজে অন্য একটা শহরে ওকে যেতে হল, সেই শহরের এক দোকানে সন্ধ্যার বেশ পরে, ও ভয়ে ভয়ে ঢুকল, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাজটা শেষ করে কোটের পকেটে বোতলটাকে ঢোকানোর চেষ্টা করতে করতে পোঁ পোঁ করে বেরিয়ে এল। কোন্ কোম্পানির, কি ব্র্যান্ডি এসব বিচার করার ধৈর্য, সাহস, শক্তি, যোগ্যতা কোনটাই তার ছিল না। ব্র্যান্ডি হলেই হল, আর ঐ ব্র্যান্ডি কেনার দৃশ্যটা কারও চোখে না পড়লেই হল।

যথা সময়ে রমার একটি ছেলে হল, কিন্তু প্রভাকরের ব্র্যান্ডির বোতলটা আর খুলতে হয়নি। বোতলটা রমার দামি কাপড় আর গয়নার বাক্সের এক কোণায় ঢুকিয়ে রেখেছিল, সেভাবেই থেকে গেল। রমার হাত পা কোন দিনই ঠাণ্ডা হল না, আর উষ্ণ জলে মিশিয়ে হলেও অত ঝাঁঝালো জিনিস কোমল স্থানে লাগাতে রমার ভয় হয়েছিল। প্রভাকর বইয়ের পাতা খুলে ব্র্যান্ডি সম্পর্কিত লাইনগুলো স্পষ্ট করে পড়ে শোনানোর পরেও 'আজ থাক, কাল বরং পারলে লাগাব'- এদ্দূর অবধি এগোতে পেরেছিল, কিন্তু সেই 'কাল'টা শেষ পর্যন্ত আর আসেনি। আজকে আলস্য লাগছে, পরের দিন সময় নেই, তারপর একমাস কথাটা দুজনেই ভুলে থাকল। মোট কথা, সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে গেল, কিন্তু ব্র্যান্ডির বোতলটা সেই শহরের পুরানো কাগজের মোড়কের মধ্যে রমার অলঙ্কারগুলোর পাশে একই ভাবে পড়ে থাকল।

সন্তান জন্মের অনেক দিন পর রমা যখন আবার দামি কাপড়ের বাক্সে হাত দেওয়ার মত অবস্থায় এল, তখন থেকে ও প্রায়ই প্রভাকরকে শোনায়, 'এটা কারুকে দিয়ে দিন, মিছিমিছি —'

প্রভাকর উত্তর দেয়, 'থাক না, আর দেবই বা কাকে? দিলেও দেওয়ার সময় কি বলব?'

ছেলের বয়স যখন সাত মাস মত, এই সময় একদিন সন্ধ্যাবেলা প্রভাকরের মনে হঠাৎই এক অদ্ভুত আনন্দের হাওয়া খেলে গেল। সেদিন বিকেলে ওদের অফিসের সবাই একশো সত্তর মাইল দূরের এক অভয়ারণ্যে পিকনিক করতে গেল।

সঙ্গে তিনটে জলজ্যান্ত পাঁঠা গেছে, দুটো পালোয়ান গোছের পশ্চিমা রাঁধুনি, দুটো বাসের ছাদ ভর্তি নানা রকমের লোভনীয় রসদপাতিও; প্রভাকরের সহকর্মী চার বন্ধু চার বোতল মদ নিয়ে গেছে; জঙ্গলের মধ্যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাংলোয় রাত কাটাবে, মাঝরাতে বিদেশী সেন্টার ধরে ফুল ভলিউমে ট্রানজিস্টার চালাবে, থ্রি ডায়মন্ড — ফোর ক্লাবস্ চিৎকারে জঙ্গলের বুক কাঁপাবে, নেশা ভাল জমলে, আর যদি মুড আসে তো ঘরের চালের ওপর উঠে নৃত্য করবে। এইরকম পিকনিকে না কি প্রভাকর যাবে না? প্রথমে তো সঙ্গী চারজন প্রভাকরের দিকে চোখ ছানাবড়া করে তাকিয়ে রইল। শেষমেষ প্রভাকরের নিরুৎসাহ ভাবভঙ্গী দেখে ওরা ঘোষণা করল ওকে জোর করে লাভ নেই। এটা এক নম্বরের স্ত্রৈণ, পিকনিকের নাম নিলেই ঘরে বউ ওকে পেটাবে।

এসব আয়োজন নিয়ে, এসব কথা বলে অফিসের লোকজন পিকনিকে চলে গেছে। হয়তো এতক্ষণে কোন এক ফরেস্টের বাংলোতে পৌঁছেও গেছে। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে প্রভাকরের হঠাৎই এক অদ্ভুত মজা লাগল, আর তখনই অকস্মাৎ ওর ব্র্যান্ডির বোতলটার কথা মনে পড়ে গেল। রমাকে ডেকে বলল, 'দেখি, ওই বোতলটা বার কর তো।'

রমা জিগ্যেস করল, 'কেন? কি করবেন?'

প্রভাকর বলল, 'দাও না, একটা জিনিস দেখব।'

ওর কথা শুনে রমার ধারণা হল, ও হয়তো বোতলের লেবেলের ঠিকানাটা দেখবে কিংবা বড়জোর আলোয় নিয়ে ভেতরের জিনিসটার রংটা পরখ করবে। রমা বিশেষ কিছু না ভেবেই বোতলটা বার করে দিল। কিন্তু তারপর প্রভাকর যখন একগ্লাস জল আর একটা খালি গ্লাস চাইল, তখন রমার চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল, কি!

'আরে কিছু না একটু ফুর্তি করা।' বোতলটার ঢাকনা খুলতে খুলতে প্রভাকর জানায়। রমা তৎক্ষণাৎ একটা হুলুস্থুল বাধানোর উপক্রম করে, 'পারবেন না, পারবেন না। এসব ছাইপাঁশ আপনি মুখে দিতে পারবেন না। দেখি বোতলটা দিন তো। ছি ছি ছি।'

প্রভাকর চোখ বুজে হাসতে হাসতে বলল, 'আহ্, তুমি থামো না, ঝামেলা করো না। একটু ফুর্তিই তো। তাও ঘরের মধ্যে, তোমার সামনে। তুমি তো জানোই মদ আমি খাই না। আজ এমনি একটু মুড এসেছে।'

রমা অনেকক্ষণ যুদ্ধ চালাল। তার মতে, কোন মানুষই পরে মদ্যপ হবে ভেবে মদ খাওয়া শুরু করে না। আরম্ভটা করে আজ যেমন প্রভাকর করছে, তেমন করেই।

প্রভাকর রমাকে অমূলক আশঙ্কা করতে বারণ করল। শেষে যখন সে খালি গ্লাসটাতে তিন আঙুল মত মদ কিলকিল শব্দে ঢেলে নিল তখন রমা, 'উঁহ কি গন্ধ' বলে পাশের ঘরে চলে গেল। প্রভাকর সঙ্গে সঙ্গে 'এহ্, জিনিসটার গায়ে ভাল

করে বাতাসও লাগল না, আর উনি গন্ধ পেয়ে গেলেন। এত মিথ্যে কথা বলো না, বুঝলে।' বলে গ্লাসটা চোখের সামনে তুলে ধরে তরলের পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা করে মনে মনে হাসল।

প্রভাকরের সঙ্গে মদের সম্পর্ক সত্যিই ছিল না। বহুদিন আগে এক অবিবাহিত চাকুরে বন্ধুর বাড়িতে সে একরাতের অতিথি হয়েছিল, তৃতীয় এক সহপাঠী এক বোতল মদ নিয়ে ঐ বন্ধুর বাড়িতে সেদিন হাজির হয়েছিল। বাপরে বাপ, কি যে রাত গেছে সেদিন। প্রভাকরের কেবল একটা দৃশ্যই মনে আছে। গৃহস্থ বন্ধুটি জামা গেঞ্জি সব খুলে ফেলে কেবল অন্তর্বাস মাত্র সম্বল রেখে ঘরের মধ্যে হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এরপর আর দু-তিনবার প্রভাকর মদের সান্নিধ্যে এসেছে, কিন্তু প্রভাকর যা করেছে তাকে মদ খাওয়া বলা চলে না বন্ধুদের অনুরোধ প্রত্যাখান করতে না পেরে একটু চেখে দেখা মাত্র।

গ্লাসটা চোখের সামনে ধরে জিনিসটার পরিমাণ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। কতটায় যে কতটুকু হয়? মাপজোখ তো সে কিছুই জানে না। কিছু ঠিক করতে না পেরে ঢালি না ঢালি করে সে আরও আধা আঙুলটাক গ্লাসে ঢেলে ফেলল। আর গ্লাসের বাকিটুকু জল দিয়ে ভরে নিল। তারপর সে রমাকে ডাকল, 'শুনছ? এদিকে এসো না!'

রমা পাশের ঘর থেকে গজগজ করে উত্তর দিল, 'পারব না যেতে!' প্রভাকর উঠে গিয়ে রমার হাত ধরে একরকম প্রায় টেনেই আনল এবং ঘরের মাঝ বরাবর ওকে দাঁড় করিয়ে গ্লাসটা ওর দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'চিয়ার্স'! রমা চাদরের একপাশ দিয়ে নাকমুখ ঢেকে বিরক্তি আর অভিমান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

কাছেই বিছানায় সাত মাসের ছেলেটা ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা মুখে দিয়ে ঘুমে অচৈতন্য। নেটের মশারির মধ্যে ওকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওর ঘুম ভেঙে যেতে পারে ভেবে প্রভাকর চেয়ারটা সাবধানে টেনে বিছানার কাছ থেকে একটু সরিয়ে নিল। ও চেয়ারে বসল, তারপর রমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসল।

রমা ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনি সত্যিই ওটা খাবেন নাকি?'

প্রভাকর রমার সামনে বাঁ হাতের তালুটা সম্পূর্ণ মেলে ধরে ওকে ইঙ্গিতে শান্ত হতে বলল এবং একঢোক গলায় ঢালল। পরমুহূর্তে ওর মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। হাসিটা অবশ্য ঐ বিকৃতির ভেতরেও ঠোঁটে লেগে রইল এবং প্রভাকর ওর বাঁহাত খানা মালিশের ভঙ্গিতে গলায় বুকে ডলতে থাকল। রমা দুদ্দাড় করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

রমা টেবিলে খাবার সাজাতে ব্যস্ত ছিল। একটু পরে হাতে গ্লাসটা ধরে প্রভাকর তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রমা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, 'ওগুলো নিয়ে

এখানে কেন এসেছেন? যান ভেতরে রেখে আসুন।' বলে রান্নাঘরের দিকে তাকাল।

প্রভাকর ইঙ্গিতটা বুঝল, 'ও গোবিন্দর জন্য বলছ, ওকে আজ এদিকে আসতে মানা করে দাও। আজকে খাবার দেওয়ার ব্যাপারটা তুমিই কর। আজকে আমাদের ইনডোর গেম, ওর আউটডোর গেম।'

রমা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতেই প্রভাকর হেসে বলল, 'ভাবছ নেশা হয়ে গেছে? আরে না না, এমনিই ঠাট্টা করছি।'

কতক্ষণ পর পর কতটা পরিমাণ চুমুক দিতে হয় প্রভাকর সে হিসাবটাও জানে না। প্রায় মুখ ভর্তি করে একঢোক গিলে মুখটা বিকৃত করে ও বলল, 'বুঝলে, লোকে যে কি করে এসব খায়, কেন যে খায়, কি যে ভাল লাগে ছাই বুঝি না। তেতোও লাগে, জ্বালাও করে আবার হাসপাতালের মিক্সচারের মতও লাগে। ধুর!'

রমা সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসটার দিকে হাত বাড়াল, 'দিন, তাহলে ফেলে দিয়ে আসি। তাহলে খাচ্ছেনই বা কেন?'

গ্লাসটা সরিয়ে নিয়ে প্রভাকর বলল, 'আহ্হা দাঁড়াও, দাঁড়াও। কিছুক্ষণ পর হয়তো ভাল লাগতেও পারে।'

ভয়ে ভয়ে রমা সমস্ত কাজ নিজেই করতে লাগল আর গোবিন্দ যাতে না এসে পড়ে তার জন্য যত রকম ব্যবস্থা নেওয়ার নিল। একটু পরে খাবার টেবিলে গেলাসটা রেখে যখন প্রভাকর ভাত খেতে বসল, তখন গেলাসে তরলটা অর্ধেকেরও কম।

ভাতের থালাটা নিজের দিকে অল্প টেনে নিয়ে ও বলে চলল, 'এই সব খেতে গেলে সঙ্গে কি লাগে জানো। অনেক দিন আগে একটা গল্প পড়েছিলাম— লর্ড অব সেটিউনার, বুঝলে, লর্ড অব সেটিউনার, তোমরা পড়েছিলে গল্পটা? কি করে আর পড়বে তোমরা? তোমরা তো পড়বে নিয়তির পরিহাস, প্রেমিকার দুঃখ, বিধির লিখন এ সমস্ত। লর্ড অব সেটিউনারে পড়েছিলাম, মনে আছে, পুরনো মদ আর লবস্টার—লবস্টার মানে বুঝলে, এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাইজের চিংড়ি মাছ, সেই মাছের ওপরের খোসাটা ফেলে দাও, ভেতরের শাঁসটা বড় বড় টুকরো করে ভাজো, তারপর এক চুমুক এটা আর একটুকরো লবস্টার। আহ্।'

প্রভাকর একঢোক মদ খেয়ে এক গ্রাস ডালমাখা ভাত মুখে দিল। তারপর বলল, 'লবস্টার! এখানে তুমি আর লবস্টার কোথায় পাবে? এই জাহান্নমে যাওয়া দেশে লাগ বললে ফড়িংয়ের সমান চিংড়ি মাছ একটা পাওয়ার উপায় নেই, পেলেও বেটাদের অত্যাচারে কেনার উপায় নেই।'

কয়েক গ্রাস ভাত খাওয়ার পর প্রভাকরের হঠাৎই দেশটার উপর প্রচণ্ড রাগ হল। ও বলে চলল,'সবচেয়ে নির্লজ্জ ব্যাপার কি জানো? মাছের ব্যবস্থা, মাংসের ব্যবস্থা নেই, মানুষের একবেলা ভাল করে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু লজ্জার কথা

হল কুত্তারা, আবার একটা মানুষের পেটে দিনে ক'শো গ্রাম মাছ-মাংস-ডিম পড়া দরকার তার লিস্টি আমেরিকা-ইংল্যান্ড থেকে এনে এই লোকগুলোর মাঝে প্রচার করে থাকে। তুমি কথাটা বুঝতে পারছ?'

'বুঝেছি, এখন আপনি ভাত খান তো।' রমা মিনতি করে।

ভাত খাওয়ার ব্যাপারে প্রভাকর খুব আগ্রহ দেখাল না, গ্লাস থেকে এক ঢোক মেরে নিয়ে শুরু করল, 'মানুষকে খেতে দিতে না পারার মধ্যে ওদের ক্লীবত্ব আছে, কিন্তু মানুষের কি খাওয়া উচিত, সেটা শোনানোর মধ্যে ওদের পশুত্বের লক্ষণ ধরা পড়ে, বুঝলে? এরা সব জঘন্য চরিত্রের পশুর দল।'

এরা মানে কারা, প্রশ্ন করার সাহস রমার হল না। বারে বারে ভাতগুলো প্রয়োজনের চাইতেও বেশি নাড়াচাড়া করতে থাকা প্রভাকরের আঙুলগুলোর দিকে তাকাল এবং মনে প্রাণে চাইছিল ও যেন আরও দু'গ্রাস ভাত খায়। প্রভাকর হঠাৎ সামান্য সময়ের জন্য শান্ত লোকের মত ভাত খেতে শুরু করল। তারপর স্বগতোক্তির মত বিড়বিড় করে বলতে থাকল, 'এত জল এই দেশটাতে, অথচ একটা মাছ পেতে নেই। এটা একটা কথা হল? এদিকে আবার বেটারা হেলিকপ্টারে চড়ে জল দেখতে আসে। কুকুরগুলোকে মেশিনগান দিয়ে গুলি করে খতম করে দেবো বাপধন।' তারপর গলাটা একটু চড়িয়ে বলল, 'এখানে ও সব লবস্টার টবস্টার হয় না তো, তাই এখানে কি চলে জানো? ফুলুরি—মানে পকৌড়ি—মুসুরির ডাল, খেসারির ডাল, বেসনের পকৌড়ি, পটেটো চিপস্— মানে আলু ভাজা— বাস— চমৎকার।' এরপর সুর পাল্টে বলল, 'কি গো, তুমি আজ খেয়েই চলবে না কি? ওঠ, ওঠ। কোথায় রাতে কম খেয়ে শরীরটা ঠিক রাখবে, তা নয় একগাদা ভাত নিয়ে সাঁটিয়ে যাচ্ছ তো সাঁটিয়েই যাচ্ছ। ধুর, ওঠ তো।' বলে সে নিজেই উঠে পড়ল, বারান্দায় গিয়ে মুখ ধুয়ে নিল, তারপর ফিরে এসে গ্লাসটা নিয়ে শোওয়ার ঘরে চলে গেল।

কাজ-টাজ শেষ করে রমা যখন শোওয়ার ঘরে এল, তখন প্রভাকরের সামনের টেবিলে গ্লাসটা ভর্তি অবস্থায়। গ্লাসটায় চোখ পড়া মাত্র রমার ভয় ধরে গেল। ও তাড়াতাড়ি মশারির মধ্যে ঢোকার আয়োজন করতে লাগল। প্রভাকর ওর হাত ধরে টেনে চেয়ারটার কাছে বিছানার ওপর বসিয়ে দিল। তারপর শুরু করল, 'আমি ছোটবেলায় কিছু ভুল করেছি, বুঝলে। এই সব অকম্মা বিদ্যে ছেড়ে আমার মিলিটারিতে জয়েন করা উচিত ছিল। কি করতে পারি দেখিয়ে দিতাম।' তারপর সে কাকে কাকে গুলি করে মারবে তার একটা তালিকা আউড়ে গেল। দেশের অনেক বিখ্যাত নেতা থেকে আরম্ভ করে কেরোসিন তেলের ডিপোর মালিক অবধি অনেকেই তার মধ্যে পড়ে গেল। শেষটায় অস্বাভাবিক কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'কোন কথা নয়, গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম।'

মশারির নিচে ছেলেটার হাত পা কেঁপে উঠল, রমা ধমকে উঠল, 'এত চেঁচাচ্ছেন কেন?'

'একদিন না হয় চেঁচালামই, কি হয়েছে তাতে?' প্রভাকর একটু বেপরোয়া ভাবে জিগ্যেস করে।

'রাত হয়েছে, আশপাশের লোক শুনলে পরে—'

'বাদ দাও তোমার আশপাশের লোক।' প্রভাকর রমার মুখটা এক হাত দিয়ে তুলে ধরল, 'বলি কোন্ মহাপুরুষটা আছে তোমার আশেপাশে? কার কাছে লজ্জায় আমি চুপচাপ থাকব?' জানলা দিয়ে একটা ঘরের দিকে আঙুল তুলে জিগ্যেস করল, 'ওটা?'

'আঃ!' রমা সন্ত্রস্ত হয়ে ওর মুখ চাপা দিতে চাইল।

'ঠিক আছে। বেশ, নাই চেঁচালাম। কিন্তু তুমি বল দেখি — এই মজুমদার কত মাইনে পায়? জানো?'

'জানি না—' রমা বিরক্তি ভরে জানায়।

'তুমি জানো না। আমি জানি। আমার মাইনে দিয়ে আমি ওর মত তিনটেকে মাইনে দিতে পারি। কিন্তু আসল কথা হল ও আমার মত দশটাকে কিনে রাখতে পারে। কি করে? বলছ না কেন? কোথা থেকে পায় ও এত টাকা? তুমি বলতে পারবে না, কিন্তু আমি পারি। আর এই জন্যই ওকে আমি এত তুচ্ছজ্ঞান করি। ওর সামনে আমার লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই। কালকে যদি ওদের বাড়ির কেউ কিছু বলে, তুমি বলে দিও এই পৃথিবীর পাঁচখানা মহাদেশের মানুষ মদ একটা খাদ্য হিসাবে খায়, কিন্তু ঐ পাঁচটা মহাদেশের মানুষ কেউ ওর মত ঘুষ খায় না। এ বলার পরও যদি ওদের কেউ মুখ খোলার চেষ্টা করে আমাকে বোলো, আমি গুলি করে মারব।'

প্রভাকর গ্লাসে একটা বড় চুমুক মেরে কিছু সময় গুম মেরে রইল। রমা দুঃখে ক্ষোভে অসহায়ের মত মাথা নাড়ল, 'কি যে কাণ্ড করলেন আজ আপনি।' একবার 'আমি শুলাম' বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাকর ওকে বসতে ইঙ্গিত করল। তারপর গম্ভীর সুরে বলে উঠল, 'তুমি আমাকে মদ খেতে মানা করছ। একটু মদ খাচ্ছি বলে তোমার বাজে লাগছে? কেন? কারণ তুমি আমাকে ভালবাস। তুমি আমাকে অন্তর থেকেই ভালবাস। ঠিক। আমিও তোমাকে ভালবাসি। তুমি বড় ভালমানুষ হে। ভাল মনের মানুষ। কিন্তু এই প্রতিবেশীদের কথা আমাকে বলবে না। এদের প্রত্যেকটাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। তুমি জেনে রাখো, এদের অন্তরটা যত কালো, আধা বোতল মদ আমার বুক তার চাইতে বেশি কালো করতে পারবে না। এই জন্যই আমি কাউকেই পরোয়া করি না।'

প্রভাকর আরও একঢোক মদ গিলল। এরপর সে উত্তেজিত স্বরে অনর্গল কথা বলতে লাগল। এখান থেকে অজন্তা সিনেমা পর্যন্ত যত ঘরে পরিষ্কার কাপড় পরা,

পাকা ঘরে থাকা ভদ্দরলোক আছে তাদের বাড়ির পাঁচ-ছ'জন বউয়ের পূর্ব প্রেমিকেরা নাকি প্রভাকরের এক সময়ের বন্ধু। সরকারের আইনের অসংখ্য ধারার মাত্র কয়েকখানা ঠিক মত প্রয়োগ করলে এই বাড়িগুলোর একটিও সাবালক পুরুষ জেলের বাইরে থাকবে না। ওই সব ঘরে হাতের নাগালে এক বোতল করে বিষ রেখে এসো, দেখবে একবছরের মাথায় সব খালি হয়ে গেছে।

ঘুমে আর ভয়ে রমা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কথার ফাঁকে ফাঁকে ও অনেকবার প্রভাকরকে শুতে অনুরোধ করল, গ্লাস কেড়ে নিতে চাইল, বারান্দায় গিয়ে বসে থাকবে বলে শাসাল, কিন্তু কোন লাভ হল না। প্রভাকর ওকে আদর করে বলল, 'আঃ! একটা রাত্রিই তো। রোজই তো শুই, একটা রাত না হয় না শুয়েই কাটালাম, কি এমন ব্যাপার? তুমি বড্ড বেরসিক দেখছি।'

এক সময় রমার কেঁদে ফেলার উপক্রম হল, আর ঠিক সেই সময় প্রভাকর মৃদু শান্ত কণ্ঠে আরম্ভ করল, 'বুঝলে রমা, মানুষের এই বিচিত্র জীবনধারার কথা ভাবলে আমার একটা ঘটনা প্রায়ই মনে পড়ে। তোমার মনে আছে, একদিন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হোল্ড-অলের ওপর বসে থাকা এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে তোমার পরিচয় করে দিয়েছিলাম?'

রমা মনে করল, 'হুঁ'।

'কোলে একটা বাচ্চা ছিল।'

'হুঁ'।

'আরও চারটে ছন্নছাড়া চেহারার অর্ধভুক্ত ছেলেমেয়ে ওর চারপাশে ঘোরাফেরা করছিল?'

'হুঁ'।

'ভদ্রমহিলার চেহারাটা মনে পড়ে?'

'হুঁ'।

'চেহারাটা দেখে তোমার কি মনে হয়েছিল?'

'মনে হয়েছিল ভদ্রমহিলা কোন কালে নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী ছিলেন'।

'ঠিক। তুমি ঠিক ধরেছ' প্রভাকর আচম্বিতে উচ্চস্বরে রমার কথাকে সমর্থনের ভঙ্গীতে গ্লাসের বাকিটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে অলস ভঙ্গীতে চেয়ারে এলিয়ে রইল।

'ঠিক বলেছ। এক সময় ও— ওর নাম সুপ্রভা— খেয়াল আছে আমি তোমাকে সেদিন নামটা বলেছিলাম। বলিনি?

'বলেছিলেন বোধহয়, ভুলে গেছি।'

'হোয়াই? কেন ভুলে গেছ? মানুষের নাম মনে রাখাটা মগজের লক্ষণ জানো? ভুলো না। হুঁ— একটা সময় ও সত্যিই চোখে পড়ার মত মেয়ে ছিল। নাক-মুখ ভাল, গায়ের রং ভাল, চোখ ভাল। লম্বাটে। কথাবার্তা ভাল। মোটের ওপর ভালই, মানে

বেশ ভাল।' ভদ্রমহিলা সম্পর্কে আরও দুটো কথা বলার জন্য, ভদ্রমহিলার চেহারাটা চোখের সামনে আনার চেষ্টায় ও খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'একবার একটি ছেলের সঙ্গে ওর পরিচয় হল। সাদা-সিধে ভাল মানুষ। পরিচয় হল মানে ওদের দুজনের মধ্যে একটা ভাল সম্পর্কও হল। একদিন সেই ছেলেটা মেয়েটির বাড়িতে কারও মারফৎ খবর পাঠাল যে সে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায়। আরে বাপরে বাপ, ও যেন ভীমরুলের চাকে আগুন দিল। ওদের আত্মীয়-স্বজন মিলে প্রায় জনা সত্তর লোক বিষাক্ত হুল খাড়া করে গোঁ গোঁ করে বেড়াতে লাগল। ওর যে জামাইবাবুটি ওর বাহুতে টিপে, পিঠে ধাক্কা না মেরে কথা বলতেই পারে না সে শুদ্ধু ওই ছেলেটিকে পেটানোর জন্য তৈরি হল। কারণ কি? না মেয়েটার বিয়ে দেওয়া হবে এক অভিজাত বংশের ছেলের সঙ্গে। ষাট বছর আগে বানানো সেই ঘরের পোর্টিকোতে মোটা মোটা পিলার আছে, গর্ডন নামে এক মহামান্য ইংরেজ অফিসার ওই বাড়ির টেবিলে খানা খেয়ে গেছেন, সেই বাড়ির মুখ্য ব্যক্তি মানে সম্ভাব্য পাত্রের বাবা যে সময়ে ইন্টারমিডিয়েটে সায়েন্স পরীক্ষা পাশ করেছিলেন, সেই সময় নাকি সায়েন্সে আর পড়ার মত ডিগ্রিই ছিল না। কুত্তার বাচ্চা সব!'

'ছিঃ, মুখ খারাপ করছেন কেন?' রমা আগ্রহ ভরে কথাগুলো গিলছিল, এবার ধমক দিল।

'ও কটা শব্দ না ব্যবহার করলে আমি যা বলতে চাইছি তা পরিষ্কার করে বলতে পারব না। বুঝেছ? ভাষায় ঠিক জোর পাই না।'

পরের কথাগুলো শোনার জন্য রমা হাঁ করেছিল, কিন্তু প্রভাকর চুপ করে থাকল।

'তারপর?' রমা জিগ্যেস করে।

প্রভাকর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ল, 'তারপর আর কি হবে।' চড়া গলায় শুরু করলেও ঝিমিয়ে গেল, ওর কথা বলার শক্তি যেন কমে এল, জিভটা যেন বশে রইল না। 'তারপর সেই বনেদী-বংশধরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। সাত বছরে বংশধরটি আরও পাঁচটা বংশধরের জন্ম দিল। সেই মেয়েটার হাড় আর চামড়ার মাঝের মাংসটুকু ও গ্রাস করল। মেয়েটির পিঠে লম্বা লম্বা বেতের দাগ বসিয়ে দিল, চড়ের চোটে মাড়ির দাঁত নড়িয়ে দিল। তুমি ভাবতে পারো রমা, একটা অকর্মণ্য মাতাল মদ খাওয়ার পয়সা যোগাতে না পারার জন্য তার পাঁচ সন্তানের স্ত্রীকে রাতের বেলা পিটিয়ে ঘর থেকে বার করে দেয়?'

প্রভাকর মদের বোতলের দিকে হাত বাড়াল। রমা শঙ্কিত হল। সে ঝট করে বিছানা থেকে নেমে প্রভাকরের হাত চেপে ধরল। এবার জোর করার মত শক্তি আর প্রভাকরের ছিল না।

'আরো কি জানো?' একটা বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে প্রভাকর একটা একটা করে

শব্দ উচ্চারণ করল, 'সত্তর বছর আগের তৈরি মহামান্য গর্ডন সাহেবের পদধূলিতে মহীয়ান সেই বাড়ির মোটা মোটা পিলারের আড়ালে এ সমস্ত কাহিনী লুকিয়ে যায়। এই জন্যই, বুঝলে এজন্যই পাড়াপ্রতিবেশী এই সব ভদ্দরলোকদের পরোয়া করার কথা আমাকে বোলো না। আমি ওদের খুব ভাল করে চিনি। আই নো দেম থরোলি।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে ও আবার বলল, 'কি সুন্দর দেহমনের একটি মেয়ে—'

রমা দ্বিধাগ্রস্থ স্বরে জিগ্যেস করল, 'মেয়েটিরই হয়তো কিছু দোষ আছে৷ আপনি কি করে জানেন।'

'ন-নো।' প্রভাকর টেবিলে খুব জোর একটা চাপড় মারল, বোতল, গ্লাস, অ্যাশট্রে, চাবির রিং.... সব ঝনঝনিয়ে উঠল। 'হতেই পারে না' তারপর চড়া গলায় বলল, 'আই নো হার থরোলি। আমি তাকে সবার থেকে বেশি জানি।'

'কি করে?'

প্রভাকর উত্তর দেওয়ার আগেই মশারির ভেতর থেকে ছেলেটা তারস্বরে কেঁদে উঠল। প্রভাকরের টেবিল চাপড়ানোর আওয়াজে ও চমকে উঠেছে। রমা তাড়াতাড়ি মশারির মধ্যে গিয়ে জড়িয়ে ধরে ওর কান্না থামানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ওর কান্না থামল না। বিছানায় বসে কোলে নিয়ে নানা ভাবে ওকে আদর করতে থাকল রমা, কিন্তু ও তারস্বরে কেঁদেই চলল।

এই কান্নার ভেতর এক সময় পাশের ঘরের দেয়াল ঘড়িতে দুটো বাজার আওয়াজ হল, তার একটু পরেই এই ঘরের মেঝেতে প্রভাকর ওয়াক্ ওয়াক্ শব্দে বমি শুরু করল। শেষ বমিটুকু বেরিয়ে যাওয়ার পর ও মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ বসে থাকল। তারপর হেঁচড়ে বিছানায় উঠল। তার মাথাটা বালিশে, পা দুটো ঝুলে থাকল।

সকালে জেগে উঠে প্রভাকর দেখল, বাইরে কড়া রোদ। সে একবার চট করে মেঝেটা দেখল, না, মেঝেতে কিছু নেই। রমা ইতিমধ্যে বমি পরিষ্কার করে ফেলেছে। তার একবার চিৎকার করে রমাকে ডাকার ইচ্ছে হল, কিন্তু ডাকল না। ওর পাশেই, ছেলেটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কি জানি, এতক্ষণ তো ঘুমোয় না। রাত্রে ও কতক্ষণ ধরে কান্নাকাটি করেছে প্রভাকরের বড় জানতে ইচ্ছে হল। ছেলের হাতটা টেনে নিয়ে ও একটুক্ষণ নাড়াচাড়া করল তারপর সস্নেহে তালুতে একটা চুমু খেল। ছেলের মাথায় আঙুল চালিয়ে চালিয়ে ও বিছানায় পড়ে থাকল।

রমার চোখের নিচে কালি পড়েছে। তাড়াতাড়ি গা ধোয়ার পরও ওর মুখটা অন্ধকার হয়ে আছে। 'আমি ওকে সবার থেকে বেশি জানি' আর তারপরেই ছেলেটার তারস্বরে কান্না— এই শব্দগুলোই যেন মাথার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুমের ক্ষতির জন্য মাথাটা এরকম ভার ভার লাগছে বলে ও নিজেকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করল।

পরদিন বিকেলে ও গোবিন্দকে বলল, 'দেখিস তো, বাজারে চিংড়ি মাছ ওঠে কি না। চালানি চিংড়ি— এই অ্যাত বড় বড়।'

দিন পাঁচেক পরে একদিন বিকেলে গোবিন্দ অনেক দূরের বড় বাজার থেকে দশটা বিশাল বিশাল চিংড়ি কিনে আনল। রমার কথামত এই কদিন ও সবকটা বাজারে চিংড়ি খুঁজে তোলপাড় করে শেষমেশ আজকে বড় বাজারে পেয়েছে।

রমা মাছের খোসাগুলো ছাড়িয়ে শাঁসগুলোকে ছোট ছোট টুকরো করে নিয়ে ভাজল, বেশ করে পেঁয়াজ দিয়ে বেসন দিয়ে পেঁয়াজি ভাজল। সেইদিন রাত্রে রমার, শেষ প্রশ্ন ছিল, 'কি করে?' উত্তরটা ওর চাই। ভেতরে ভেতরে ও অস্থির হয়ে আছে, একটা জেদ চেপে আছে। রমা যখন রান্নাঘরে এতসব করে চলেছে তখন প্রভাকর শোওয়ার ঘরে ছেলেকে পেটের ওপর বসিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে ছেলের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত। —'কি হবি বড় হয়ে তুই? সব করিস, কিন্তু বড় হয়ে আমাকে আবার যেন ধমক দিবি না। এত কষ্ট করে তোকে বড় করব। আর তারপর বুড়ো বয়সে তুই আমাকে ধমকাবি ও সইবে না।' ছেলেটা বারদুয়েক হাতে তালি দিল, শব্দ হল না।

দুটো কোয়ার্টার প্লেটে চিংড়ি মাছ ভাজা পেঁয়াজি নিয়ে রমা ঘরে ঢুকল। টেবিলে রাখার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাকর জিগ্যেস করল, 'বাহ্ এসব কোত্থেকে? সাংঘাতিক আয়োজন দেখছি। তুমি তাহলে এইসব করছিলে? কিন্তু ব্যাপারটা কি? হঠাৎ যে?'

রমা হেসে বলল, 'খান, আপনি ভালবাসেন। বোতলটায় আদ্ধেক মতন আছে ওটুকু শেষ করে ফেলুন।'

ছেলেটাকে কাঁধে নিয়ে প্রভাকর উঠে বসল, টুপ করে এক টুকরো ভাজা মাছ মুখে দিয়ে রমার কথা শেষ হওয়ার আগেই চেঁচিয়ে,'না না না, ওর নামও আর মুখে আনছি না। আমি তোমাকে বলে রাখছি, আর কখনও ও কথা ওঠাবেই না।' প্রভাকর ছেলের পিঠে হাত বোলাতে লাগল, যেন মনে মনে ছেলেকে ছুঁয়ে শপথ করছে।

রমা থ মেরে দাঁড়িয়ে রইল। প্রভাকর হাসতে হাসতে বলল, 'আর বোতলটার কি গতি হয়েছে জানো না?'

রমা শান্ত চোখে ওর দিকে তাকাল।

'আধবোতল মদসমেত বোতলটা ভাঙলাম, ভেঙে পেছন দিকে একটা গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দিয়েছি।' তারপর প্রভাকর ছেলেকে জিগ্যেস করল, ও ভাজা মাছ চিবোতে পারবে কি না।

প্রহরী

একটা দুর্গে দু' হাজার সৈন্যের ষাট দিনের খাদ্য ছিল। ঠিক আছে। কুড়ি দিন পরে তার থেকে তিনশো সৈন্য চলে গেল। কত? তিনশো। চোখ দুটো বুজে মনে মনে দু'হাজার থেকে তিনশো বিয়োগ করে রজনী মাস্টার মাথা ঝাঁকাল; বুঝলাম। দশদিনের মাথায় দুর্গে আরও আটশো সৈন্য এল। কি হল, কি হল কথাটা? ও আরও এল আটশো? এবার মুখে মুখে যোগ করে রজনী মাস্টার সোজা হয়ে বসল। মাস্টার ভেবেছিলেন অঙ্কটা এ পর্যন্তই। তবু তিনি শেষ লাইনটা পড়লেন, সৈন্যদের বাকি খাদ্যে কত দিন চলতে পারবে? মাস্টারের সব গোলমাল হয়ে গেল। তিনি ভ্রূ কুঁচকে ট্যালার মত শেষ পংক্তিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বয়সের সাথে সাথে চোখের দৃষ্টি ভোঁতা হয়ে এসেছে। একটা লাইন পড়তে গিয়ে তিনি অন্য লাইনটা পড়ে বসেননি তো? ধুতির আগায় চোখ দুটো একবার মুছে নিলেন, তারপর তিনি অঙ্কটা আবার গোড়া থেকে পড়তে শুরু করলেন। একবার পড়লেন, দুবার পড়লেন, আর প্রতিবারেই অঙ্কটা আরও বেশি জটিল আকার ধারণ করতে লাগল। অবশেষে অঙ্কটার আগা-মাথা কিছু বুঝতে না পেরে, অঙ্কের বদলে পাটিগণিতের ঐ পাতাটার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, যেন একটা প্রকাণ্ড দুর্গের মধ্যে হাজার হাজার সৈন্যের আসা যাওয়া চলছে, বেরোনোর যারা বেরোচ্ছে, ঢোকার যারা ঢুকছে এবং দুর্গের প্রবেশ দ্বারে রজনী মাস্টারকে বসিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে; তুমি সৈন্যদের গুনতে থাক।

খানিকক্ষণ এভাবে থেকে, ঘন ঘন চোখ দুটো কচলে নিয়ে চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন তারপর তিনি দিলীপকে বললেন, 'ঠিক আছে এ অঙ্কটা পরে হবে'খন, তুই এখন ইতিহাস পড়, আজ কদিন যাবৎ তো ইতিহাস পড়তেই শুনি না। পড়, জোরে জোরে পড়ে যা, আমি শুনব।'

দিলীপ টেবিলে থুতনি ঠেকিয়ে অর্ধেক জলের গ্লাসের মধ্যে দিয়ে মাস্টারমশায়ের মুখখানা কেমন লাগে দেখার চেষ্টা করছিল। ও জানতো এই অঙ্কটা

মাস্টারমশায়কে করতে দিলেই ও অনেকটা সময় রেহাই পাবে, হয়তো দৌড়ে একবার রান্নাঘরে উঁকি মেরেও আসতে পারবে। নয়তো ঐ ঘরে গিয়ে সোনালি কি করছে দেখে আসবে। কেবল মাস্টারমশায়ের অঙ্কটার ভেতর আরেকটু মগ্ন হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। মাস্টারের নতুন হুকুম শুনে ও টেবিলের নিচে পা চুলকে ঠোঁট ওল্টাল তারপর বইয়ের গাদা থেকে বাঁধানো ইতিহাস বইটা বার করে নিল। জোরে জোরে পড়তে বললে ও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে। কারণ ওর অভিজ্ঞতা আছে, যত চেঁচিয়ে পড়বে তত কম পড়তে হবে।

দিলীপের চেঁচানোর ফাঁকে মাস্টারের চোখ বুজে এল। টেবিলে কনুই রেখে দুই তালুতে চোখ ঢেকে তিনি মৌন হয়ে রইলেন। ওঁর খুব খারাপ লাগছিল। এভাবে আর কত দিন চলবে। চোখের সামনে জন্মানো দিলীপ কাল পরশু এক্স ওয়াই দেওয়া অঙ্ক করবে। আজ দুর্গের খাদ্যের হিসাব করছে, তখন হয়তো কোথাকার সাগরের ঢেউ গোনার অঙ্ক বার করে বসবে। আর ততদিন পর্যন্ত যদি রজনী মাস্টারের এই চেয়ারে বসার সৌভাগ্য হয় তবে বোবা হয়ে থাকতে হবে। এখন না হয় যা নয় তাই কিছু একটা বলে যাচ্ছেন, তখন কি আর তা পারবেন!

এক্স ওয়াই দেওয়া অঙ্ক করার আগেই স্কুল ত্যাগ করা রজনী মাস্টার পাঠশালার মাস্টার; সাহিত্য, অঙ্কন এবং হাতের লেখার মাস্টার। একটিবারও না মুছে রজনী মাস্টার বোর্ডের ওপর পাখি এঁকে ফেলেন, কচুপাতা, গ্লাস তো অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। কোন ছেলে দাঁড়িয়ে সাহিত্য পড়ে যাওয়ার সময় চেয়ারে বসে থেকে মাস্টার মশায় যদি হাঁক দেন, 'কি কি? আবার পড় দেখি' তাহলে সে পড়তে গিয়ে দেখবে সত্যি সত্যিই সে একটা শব্দ বাদ দিয়েছিল। হাতের লেখা ভাল করানোর জন্য অনেক ছেলের আঙুলের গাঁটে বেত দিয়ে পিটিয়েছেন। বানান না পারার জন্য অনেকেরই গায়ে বেতের দাগ নিয়ে ঘরে ফিরতে হয়েছে। বহু ছাত্রের বাবা, অনেক দিন সন্ধ্যায় এসে রজনী মাস্টারকে গালাগাল করে গেছেন। দাঁড় করিয়ে রাখো, নীল ডাউন করিয়ে রাখো— এগুলো কি শাস্তি নয়? ঐ বেতের বাড়ি দেওয়ার সময় ছেলেগুলো কতটুকুনি তোমার একবার চোখেও পড়ল না? কোন দোষ করলে শুধরে দেওয়ার জন্য, কিছু না পারলে শেখানোর জন্যে তোমায় মাস্টার হিসাবে রাখা হয়েছে, ছেলেগুলোকে অকেজো করার জন্য রাখা হয়নি। তোমার নিজের ছেলে যদি হত মারতে তো দেখতাম।

যারা বাড়ি বয়ে গালি দিতে আসে, তারা কেউ অল্পস্বল্প রাগে আসে না। আসে যখন, একেবারে উগ্রমুর্তি ধরে আসে। গালি দেওয়ার সময় তাদের হুঁশ থাকে না। তারা মুখে যা আসে তাই বলে যায়। রজনী মাস্টার ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে নির্বিকারভাবে শুনে যান, কিন্তু এসব কথা শুনে বেড়ার ওপারে ভাগ্যবতীর বড় কষ্ট হয়। প্রতিটি লোক গালি দিয়ে যাওয়ার পর ভাগ্যবতী মাস্টারকে পই পই করে বোঝান, লোকের

ছেলেমেয়েদের গায়ে কি দরকার হাত দেওয়ার? কি দরকার মানুষের গঞ্জনা সহ্য করার?

রজনী মাস্টার অনেক রাত অবধি গজগজ করেন। হুঃ! তোমার নিজের ছেলে হলে! 'দরকার নেই আমার অমন গরু গাধা ছেলের। ও রকম ছেলের বাপ হওয়ার চাইতে এখন ঢের সুখে আছি। অথচ যারা মাস্টারকে গালমন্দ করে যান, তারা ভাল করেই জানেন মাস্টারমশায়ের ছেলেমেয়ে নেই।

হয়নি এমন নয়, বিয়ের দু'বছর বাদে ভাগ্যবতীর একটি মেয়ে হয়েছিল। কিন্তু পৃথিবীর আলোয় সে কাঁদতে পারেনি। নিস্তব্ধ হয়ে এসেছিল, ভাগ্যবতী-রজনী মাস্টার-সাহায্য করতে আসা প্রতিবেশী মহিলাদের সবাইকে নিস্তব্ধ করে দিয়ে পৃথিবীর সামান্যতম ব্যাঘাত না ঘটিয়ে সে চলে গেল।

এরপর আরেকটি কন্যা। এই কন্যা সন্তানটি কিন্তু যেন কাঁদার জন্যই কাঁদল। মাঝে মাঝে সামান্য ঘুম, সামান্য নীরবতা, তার বাইরে বাকি সময়টা কেবলই কান্না আর কান্না। ভাগ্যবতী দুর্বল হাতটা তার গায়ে মাথায় বুলিয়ে দেওয়ার বাইরে আর কিছুই করতে পারেনি। এর চাইতে বেশি কিছু করা তার শক্তিতে কুলোয়নি। মেয়েটাকে ভূতে-প্রেতে ধরতে পারে, অপদেবতায় ভর করতে পারে, তা দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও প্রতিবেশীরাই করেছিল।

রজনী মাস্টারের কিন্তু বিশ্রাম ছিল না। তার মেয়ে অন্তত কেঁদেছে। 'আঃ কাঁদুক ছাড়তো। না কেঁদে ও করবেটা কি। আমরা যে অর্ধেক বয়স পার করে ফেললাম, আমরাও কি পারি একটা মনের কথা ঠিকঠাক বলতে? জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে তাই না বলেও থাকতে পারি। ওই টুকুনি মেয়ে তার কি জানে? ও বলতে তো জানেই না, আবার না বলেও থাকতে পারে না। তোমরা এ সব বোঝ না।'

মাস্টার দোকানে ছুটলেন মেয়ের ফ্রক কিনতে। দর্জি জানাল একগজ কাপড়ে দুটো ফ্রক হয়েও কাপড় বাঁচবে। মাস্টার জানালেন, 'একটা বরং পরে হবে, তুমি আমাকে চট করে এখন একটাই বানিয়ে দাও। আমি এখানেই একটু বসছি এখন।' দর্জির কাঁচি, হাত পা একদমে চলল। মাস্টার হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই চোখের সামনে ছোট্ট ফ্রকটা আকার পেল।

'হেঁ হেঁ হেঁ জামাটা দ্যাখ' বলে মাস্টার দু'হাতের আঙুলে জামাটাকে মেলে ধরে নিজের আনন্দে নিজেই হাসলেন, তারপর তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, 'এই জামাটা তৈরি করে রেখো, আমি এক সময় এসে নিয়ে যাব।'

মাস্টার ঘরে পৌঁছনোর আগেই মেয়েটার কান্না থেমে গিয়েছিল। যেটুকু কাঁদবে বলে এসেছিল সে কান্নাটুকু তার শেষ হয়ে গেছে।

ওই জামাটা আর মাস্টারমশাই আনতে যাননি। বেশ কিছু দিন অপেক্ষা করে

দর্জি এসে জামাটা দিয়ে পয়সা নিয়ে গেল। যত দিন বিছানায় থাকার কথা তার থেকেও বেশি দিন পড়ে থেকে ভাগ্যবতী বিছানা ছেড়ে উঠলেন। কিছু দিনের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক হলেন, ঘরের কাজকর্মে হাত দিলেন। এর মধ্যে যে এত কিছু ঘটে গেছে কারোই যেন সে কথা মনে নেই। মাস্টার সুবিধা পেলেই ভাগ্যবতীকে খনার বচন ব্যাখ্যা করে শোনান। মাত্র তিনটে বচনের ব্যাখা করতেই রোববারের গোটা দুপুরটা গড়িয়ে যায়। ভাগ্যবতী সময় পেলে কাসুন্দি-খরিচা* ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য বস্তুর আয়োজন করেন। এই দুজনের মধ্যে যে আরও দুটো প্রাণী এসে চলে গেল, তার কথা ভুলেও কেউ উচ্চারণ করেন না, যেন সন্তান-সন্ততির কথা কারও মনে আজ পর্যন্ত আসেই নি।

ঘরে একা থাকার সময় কিন্তু ভাগ্যবতীর বুকটা কে যেন চেপে ধরে। চাল বাছতে বাছতে আঙুলগুলো অজান্তেই থেমে যায়। অনেক দুপুরে তার চোখ দুটো ভিজে ওঠে। কেবল একটা কথাই তাকে কুরে কুরে খায়, আজ তার দোষেই মানুষটার মনটা ভিতরে ভিতরে শেষ হয়ে গেছে। কি যন্ত্রণায় মাস্টারের বয়সের একজন লোক খনার বচনে রস পায়, ভাগ্যবতী তা বোঝেন।

ছাত্রদের পড়তে দিয়ে স্কুলের চেয়ারে বসে আঙুলে চোখ ঢেকে মাস্টার ভাবেন নিজের তো কিছুই ছিলই না, আর কোন কিছুর আশাও ছিল না, এখন তার সাথে একটি মহিলার জীবনেরও সব আশা অকাঙ্ক্ষা তিনি শেষ করে দিলেন। বুকের মাঝে একটা আগুন নিয়ে মেয়েলোকটা ধীর স্থির শান্ত হয়ে থাকে, আর ভাগ্যবতীর এই ভাবটাই মাস্টারকেঅস্থির করে তোলে। মাঝে মাঝে মাস্টারের কেমন ভয় ধরে যায়।

ভাগ্যবতীর অজ্ঞাতসারে কারও কারও সঙ্গে রজনী মাস্টার পরামর্শ করেন। অবশ্যই ঘরের চৌহদ্দির ভেতর নারকেল গাছের চারা লাগাবেন, রাস্তার ধারে অশ্বত্থ গাছের চারা রোপণ করবেন —এর চাইতে বেশি কিছু বলার মত ব্যবস্থা কোন মাস্টারমশায়ের নাগালের মধ্যে ছিল না। তাদের কথা মাস্টার বলামাত্র পালন করলেন। বড় রাস্তায় যাওয়া আসার পথের দুপাশে দুটো নারকেলের চারা রুইলেন। সাতটা গ্রামের মানুষ যে রাস্তা দিয়ে শহরে যাতায়াত করে সে রাস্তার পাশে একটা সুন্দর অশ্বত্থের চারা লাগিয়ে বেড়া দিয়ে ঘিরে দিলেন। ভাগ্যবতীকে এর কোন কারণ জানালেন না।

কিছুদিন পর ভাগ্যবতী তৃতীয় শিশুটির জন্ম দিলেন। এবারও মেয়ে। আর ক'ঘন্টা থেকে সেও মারা গেল।

মাস্টার দু'কোপে নারকেল গাছের চারাদুটো শেষ করবেন ভেবেছিলেন, অশ্বত্থ গাছের বেড়া ভেঙে উনুনে গুঁজে দেবেন, কিন্তু শান্ত হতে হল, এবার ভাগ্যবতীকে নিয়ে বেশ কিছুদিন টানা-পোড়েন চলল।

* খরিচা — বাঁশের কলি দিয়ে রান্না তরকারি।

এর কিছুদিন পর রজনী মাস্টারের চাকরিটি গেল। তিনি মনে করেছিলেন, তিনি সামনে না থাকলে যে কোন দিন ভাগ্যবতী পাগল হয়ে যেতে পারেন। স্কুলের সেক্রেটারির কাছে মাস্টার দু'মাসের ছুটি চেয়েছিলেন। বদলে সেক্রেটারি তাকে একেবারেই বিদায় করলেন। পিঠে দাগ বয়ে নিয়ে যাওয়া ছেলেদের বাপেদের ক্রমবর্ধমান আপত্তির ঠেলায় সেক্রেটারির কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড় হয়েছিল।

সেক্রেটারির সামনে রজনী মাস্টার হেঁট মাথা আর তোলেননি। তুললেন রাস্তায় এসে। এখন উপায়? দুটো পেটের চিন্তা। সঞ্চয় বলতে একটি ফুটো কড়িও নেই। নগদ পয়সা না হলে ঘরে একমুঠো চাল আনার সংস্থান নেই। থাকার মধ্যে শহরে একটুরো জমি আছে। দূরদর্শী বাবার কিনে রাখা। বাবা হয়তো ভেবেছিলেন, এক সময় এক ঝাঁক নাতিপুতির ঠেলায় ঘরে দম নিতে পারা যাবে না, তখন এ জমির দাম সোনার দাম হয়ে যাবে অতএব কিনে রাখা ভাল।

মাস্টার সাত দিনের মধ্যে কিছু জমি বেচে এক বাণ্ডিল নোট হাতবাক্সের নিচে এনে রাখলেন। ভেবে রাখলেন এই টাকা কটা শেষ হলে, বয়স আরেকটু বাড়লে বাকি জমিটুকুও বেচে দেবেন, অতএব চিন্তা নেই।

ভাগ্যবতী ভেবেছিলেন তার অসুখের জন্য হয়তো মাস্টার ছুটি নিয়েছে। কিন্তু এক সন্ধ্যায় মাস্টার একদৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে জানালেন 'চাকরিটা নেবে বলেই যেন আমার এগার বছরের চাকরিটা কেড়ে নিল। কেন নিল তাও বলল না। ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর সঙ্গে সারাটা দিন চেঁচামেচি করে কাটাতাম। এখন কি নিয়ে যে দিন কাটাব?' কথাগুলো বলে ভাগ্যবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে মাস্টার চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে, ঝাড়া দিয়ে উঠে হাসতে হাসতে বললেন, 'রাগ হলে ওদের দু-একটা চড় থাপ্পড় লাগাই আর এই জন্য ওরা আমাকে এই মারটা দিল। ঠিক আছে, তোদের না হয় দু-চারটে থাপ্পড় দিলামই বা, তাই বলে তার দাগ বড় হলে তোদের পিঠে লেগে থাকবে? থাকবে কি থাকবে না, বড় হ' বুঝবি। আর ওরা না হয় ছোট, কিন্তু ওদের বাপেদের তো বোঝা উচিত ছিল। আমি যে ওদের নষ্ট করার জন্য পেটাই না, এটুকু বোঝার জন্য একটা লোকও কি ছিল না?'

ছিল। চাকরি যাওয়ার অনেক দিন পর চিন্তামণি হাজারিকা রজনী মাস্টারকে ডেকে পাঠালেন। হাজারিকার স্ত্রী জানালেন, 'দু'বছরটাক বাড়িতে পড়িয়ে বাবুলকে হাই স্কুলে ভর্তি করব ভাবছি। আপনি যদি সন্ধ্যাবেলাটায় একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেন...'

মাস্টার হেসে ফেললেন। এই দিনটার জন্যই যেন তিনি এতকাল অপেক্ষায় ছিলেন। হাজারিকা বললেন, 'কিন্তু মাস্টারমশায় দেখবেন, একটা কথা এখনই বলে রাখি, ছেলে দেখতে এঁটুকুনি। কিন্তু শয়তানের একশেষ। লিখতে হবে জেনে এরই মধ্যে শ্লেট ভাঙতে শিখে গেছে। দু-এক ঘা না দিলে একে ঠিক করা মুশকিল।

আমার মুখ বন্ধ, এদিকে তো গায়ে টোকাটি পর্যন্ত দিতে দেবে না।' হাজারিকা সুরমায়ার দিকে ভ্রূকুটি করলেন।

বাক্যালাপের রসটুকু উপলব্ধি করতে না করতেই মাস্টারের হাসিটা মরে গেল। তিনি ভাবলেন, ওই দু-এক ঘা দেওয়ার জন্যই কি হাজারিকা ওকে ডাকল?

স্কুলের একদঙ্গল ছেলের পিছনে খরচ করা শক্তি মাস্টার বাবুলের ওপর আরোপ করলেন। প্রতি সন্ধ্যায় চিন্তামণি আর সুরমায়ার দিকে একটুকরো হাসি ছুড়ে দিয়ে রজনী মাস্টার একটি কাঠের চেয়ারে এসে বসেন আর প্রতি রাতে সুরমায়া বাবুলকে খেতে ডাকার পর একটা অদ্ভুত তৃপ্তি নিয়ে তিনি ঘরে ফেরেন। ভাগ্যবতী ততক্ষণে রান্নাবান্না শেষ করে পথ চেয়ে থাকেন।

বছর খানেক যাওয়ার পর যখন বাবুল উল্কাপাত, রুক্মিণী ইত্যাদি শব্দ সমেত শ্রুতলিপি লিখতে শিখল, তখন একদিন রাত্রে রজনী মাস্টার টের পেলেন, ভাগ্যবতী আরেকবারের জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষায় আছে। রজনী মাস্টার শিউরে উঠলেন। কেন আবার তিনি এই ভুল করতে গেলেন, নিজেও তার কারণ খুঁজে পেলেন না।

পরদিন দিনের আলোয় ভাগ্যবতীর দিকে তাকিয়ে রজনী মাস্টারের ভয় ধরে গেল। মা হওয়ার সব যন্ত্রণা যখন ভাগ্যবতী হাসিমুখে সাদরে গ্রহণ করতে তৈরি ছিলেন, কাঁঠাল কাঠের খাট একদিকে ধরে যে অনায়াসে মাস্টারের সঙ্গে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে পারতেন, সেই সময় একটার পর একটা অভিশাপে ভাগ্যবতীর শরীর মন দুটোই যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। যে চুড়ি সাবান মাখিয়ে হাতে গলাতে হত, সেই চুড়ি এখন হাত ধুতে গেলে এমনিই খুলে পড়ে যায়। এই মহিলাটি এখন নিজের শরীরে অতিথি পুষবেন? আর যদিও বা পোষেন, শেষ পর্যন্ত আরেকটা মর্মান্তিক আঘাত ব্যতীত আর নতুন কি-ই বা পেতে পারেন? একটা, দুটো, তিনটে অভিজ্ঞতার জ্বালাকে মাস্টার যত ভুলতে চেষ্টা করেছেন, ততই বেশি জ্বলেছেন, যতই সব ভুলে গেছি বলে নিজেকে প্রবঞ্চনা করার চেষ্টা করেছেন ততই মনে পড়েছে, কিভাবে তিনটে সন্তান এসেছিল, কিভাবে তারা চলে গেল, যে জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত হয়, তার পক্ষে কবার হেরেছে তার হিসাব করা নিরর্থক। রজনী মাস্টার হয়তো নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে এখনকার মতই আর একটা দুর্যোগকে পার করবেন, কিন্তু এই মহিলাটি সইতে পারবেন কি? এইবার হয়তো পাগলই হয়ে যাবেন। রজনী মাস্টার ছটফট করতে লাগলেন। যে ভাগ্যবতীর জীবনে যৌবনের সামান্য রংটুকু লেগে আছে উঁচু গাছের মাথায় শেষ বিকালের নরম রোদের মত, তাকে এই সন্ধিক্ষণে মরণকূপের দিকে ঠেলে দিতে পারলেন কি করে?

সেদিন সন্ধ্যায় বাবুলকে পড়াতে গিয়ে চিন্তামণি, সুরমায়া আর বাবুলের স্মিতমুখ দেখে তার কেমন খটকা লাগল। আজ পর্যন্ত এমন কোন দিন হয়নি যেদিন

রজনী মাস্টার ওদের হাসিমুখ দেখেননি। আজ পর্যন্ত তিনি জেনেছেন তার সান্নিধ্য এরা উপভোগ করেন। কিন্তু আজ হঠাৎই তার মনে হল যেন এই তিনটি প্রাণীর হাসিই তাকে এতটা উতলা করতে পারে যার ফলে কিছুদিনের মধ্যে একজন মহিলা পাগল হয়ে যাবে। আশ্চর্য।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ঠিক সময়ে ভাগ্যবতীর একটা কন্যা হল। সে কাঁদল, চুপ করল। আবার কাঁদল, শুল, জাগল। একদিন গেল দু'দিন গেল, একটা তীব্র উত্তেজনায় আর আশঙ্কায় রজনী মাস্টার প্রতিটি মুহূর্ত পার করলেন। ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে চোরের মত তিনি ভাগ্যবতীর ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ঠাহর করেন, তারপর চুপিসারে উঁকি মেরে দেখেন, আশ্চর্য ব্যাপার, ভাগ্যবতীর বুকের কাছে মেয়েটা হাত-পা নেড়ে চলেছে।

সেই কবেকার সেলাই করা জামা দুটোর একটা বাক্সের তলা থেকে বার করে ওকে পরানোর সময় ভাগ্যবতীর হাত থর থর করেছিল।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই একগজ কাপড়ের সেলাই করা জামা দুটো পুরনো হয়ে ফেটে ফালা ফালা হয়ে গেল। তার জায়গায় একটা দুটো করে অনেক জামা এল। সেগুলোও গেল আর সেইদিন রজনী মাস্টার যখন মেয়ের জামার জন্য তিনগজ কাপড় নিয়ে এলেন তখন ভাগ্যবতী বললেন, 'ওর আর ফ্রক চলবে না, এবার কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হবে।'

রজনী মাস্টারের মেয়ের নাম নিশা। নামটা দিয়েছিলেন সুরমায়া। ভাগ্যবতীর কন্যা হওয়ার মাত্র কুড়ি দিন আগে সুরমায়ার একটি কন্যা জন্মেছিল, দুজনেরই জন্ম হয়েছিল রাতে, রাশিচক্র দেখিয়ে চিন্তামণি মেয়ের নাম রাখলেন জোনালি। রজনী মাস্টারের রাশিচক্র দেখানো-টেখানোর ব্যাপার নেই। সুরমায়া বললেন দুজনেরই রাশি সম্ভবত এক, অতএব ওর নাম হোক নিশা, দুটো মিলে একটা শব্দ হবে জোনালি নিশা। নামটা নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ মাস্টার কিংবা ভাগ্যবতী কারোই ছিল না। নাম আবার কি, একটা হলেই হল। নতুন নতুন নাম রজনী মাস্টারের মাথায় আসে না। ওঁর ভাল লেগেছিল একটাই নাম, আর সে নামটা অনেক দিন আগেই ভাগ্যবতীকে দিয়ে রেখেছেন তাঁর বাবা মা। মেয়ের ব্যাপারে কারো পরামর্শ রজনী মাস্টার এবং ভাগ্যবতী অগ্রাহ্য করেন না। কেউ হয়তো বলে কোমরে অমুক মাদুলিটা লাগাও, তো লাগাচ্ছেন, কেউ হয়তো বলল গলায় একটা বাঘনখ ঝুলিয়ে দাও, তাই দিচ্ছেন, সুতরাং সুরমায়ার সোনার মুখে যে নাম বেরিয়েছে; তাই নাম হল। নিশা।

নিশার জন্য রজনী মাস্টারের জীবনে একটা প্রচণ্ড উদ্‌ব্যস্ততা এল। জমি বেচা পয়সা শেষ, চিন্তামণি হাজারিকার দেওয়া পয়সায় এক সপ্তাহের খাবার জোটে। আবার জমি বেচতে হবে ভাবলেই রজনী মাস্টারের বুক কাঁপে। ওই জমিটুকু কি

কুক্ষণেই না তিনি বেচলেন, তার বদলে আরও দু-চারটে ছাত্র পড়ানোর কাজ জুটিয়ে নিতে পারলে হত। অনেক দিন বাদে পাঠশালার সেক্রেটারির ওপর রজনী মাস্টারের মেজাজ আগুনের মত জ্বলে উঠল। এই রাগ সেদিন চাকরিটা কেড়ে নেওয়ার সময় যদি চড়ত তো সেক্রেটারি টের পেয়ে যেতেন মাস্টার ছেলে কেন পেটায় এবং কেমন করে পেটায়।

ঘুরে ঘুরে তিনি একটা টিউশন জোগাড় করলেন। চার ঘর মারোয়াড়ির ছেলেমেয়েদের জুটিয়ে নিলেন অসমীয়া শেখানোর জন্যে। পরে আরও ক'ঘর তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠাতে শুরু করায় একটা ছোটখাটো স্কুলের মত হল এবং মাস্টার একটু দম ফেলতে পারলেন।

আর থাকল চিন্তামণি হাজারিকার বাড়ির টুইশানটা। বাবুল এক সময় রজনী মাস্টারের নাগালের বাইরে চলে গেল। থাকল সোনালি। কিন্তু মেয়ে পড়ানোতে রজনী মাস্টারের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। পড়াতে হলে নিশাকেও পড়াতে হয়। নিশাকে তিনি বই খাতা কিনে দিয়েছেন, মাসে মাসে বেতন দিচ্ছেন, জোনালির সঙ্গে ও স্কুলে যাচ্ছে আসছে। কিন্তু এর বাইরে ওর খবর নেওয়ার সময় হয় না তার।

মাস্টারের কপাল ভাল, জোনালির চাইতে দু'বছরের ছোট দিলীপের জন্যই কাঠের চেয়ারটা ছাড়তে হল না।

কিন্তু এই টেবিলে বসে নামতা মুখস্থ করা দিলীপ আজ দুর্গের অঙ্ক দেখাচ্ছে, বুঝতে পারলেন দিলীপও তার নাগালের বাইরে গেল বলে। যে কোন দিন এ বাড়িতে তার বিদ্যাদানের কাজ ফুরোবে, অথচ নিশার প্রতি তার কর্তব্য শেষ হতে এখনও বহুদিন বাকি।

অবশ্য চিন্তামণি হাজারিকার পয়সার প্রতিদান যতটা বেশি সম্ভব দেওয়ার চেষ্টা মাস্টার সর্বদাই করেছেন। দিলীপের করতে দেওয়া অঙ্কগুলো কাঠ পেন্সিলে দাগিয়ে তিনি পাটিগণিতের বইটা ঘরে নিয়ে আসেন। তার এককালের ছাত্র প্রভাকরের ভাই দিবাকরের পড়াশুনায় খুবই মেধাবী বলে নাম আছে। দিবাকরকে ডেকে এনে বলেন, 'বাবা, এই অঙ্ক কটা একটা কাগজে করে দেবে? বোঝার মত করে একটু বিস্তারিত ভাবে কোরো।' দিবাকর করে দেয়।

মাস্টারমশায় সন্ধ্যাবেলায় কি পড়ান সে ব্যাপারে চিন্তামণি হাজারিকার মাথা ব্যথা নেই। তিনি ভাবেন, স্কুলের শিক্ষক যা পড়ান ঘরে এসে সেটা পড়ে নেওয়া ছেলেমেয়েদের নিজেরই কাজ। ওর দরকার রজনী মাস্টারের উপস্থিতিটা। এতদিন ধরে তিনি দেখছেন ছেলেমেয়ে মানুষটিকে সমীহ করে। রজনী মাস্টার ঢুকলে দিলীপের তো কথাই নেই, এমন কি ক্লাশ টেনের বাবুলও পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে। এটাই দরকার। তাছাড়া মানুষটাও একবারে ঘরের লোকের মত হয়ে গেছে। ঐ মানুষটাকে যে কটা পয়সা দিতে হয়, তার জন্য চিন্তামণি হাজারিকার কোনদিনই অভাব ঘটবে না।

রজনী মাস্টার, ভাগ্যবতী এমন কি নিশাও বোঝে জোনালিদের বাড়ির লোকেরা আপনজনের মতই। একদিন চাকরিটা চলে যাবে জেনেও রজনী মাস্টার এবাড়ির কাজটাকে সহজভাবে গ্রহণ করেছেন। শিবাজী শত্রুর ব্যূহ থেকে কি কৌশলে পালাল, দিলীপকে সে গল্প শোনাতে গিয়ে চাঁদ সদাগরের তৈরি চক্রগৃহে সাপটা কেমন চালাকির আশ্রয় নিয়ে ঢুকে পড়ল সে বিষয়ে বলে যান। তারপর হয়তো বলে যাবেন কি করে একবার এক সাপে কাটা মানুষকে মোড়ের মাথায় শুইয়ে রেখে ওঝা তিন দিন ধরে ঝেড়েছিল। শেষটা হয়তো সুরমায়াও কাছে দাঁড়িয়ে শুনে থাকবেন। বাড়ি ফিরে যাওয়ার মুখে হয়তো সুরমায়া বলতেন, 'কাল নিশাকে নিয়ে আসবেন, এখানে ভাত খাবে।' আর পরদিন নিশাকে সুরমায়া একটা কাগজের প্যাকেট দেবেন— নতুন ফ্রক একটা। জোনালিও মাস্টারকে ছুঁচ-সুতো, রাবার-পেন্সিল আনার জন্য মাঝে মাঝে পয়সা দিয়ে দেয়। সন্ধ্যাবেলা সেগুলো ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে রজনী মাস্টার জোনালির টেবিলের জিনিসগুলো নাড়াচাড়া করে দেখেন। স্নোর শিশি খুলে দিয়ে বলবেন, 'এটা দেখি শেষের পথে।'

'হ্যাঁ ওটা শেষ, কাল মা নতুন একটা আনিয়েছে।' জোনালি জানায়।

খবরটা মাস্টারের কাছে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক, 'ও তাই না কি?' একটু দোনোমোনো করে তারপর না-বলি না-বলি করে বলেন, 'তাহলে তোদের এটা লাগবে না?'

লাগবে না। অতএব অর্ধেকের চাইতে একটু কম থাকা স্নো-র শিশি মাস্টার পকেটে ঢুকিয়ে বাড়ি নিয়ে যান। গিয়ে ভাগ্যবতীকে দেন, ভাগ্যবতী আবার হাতে নিয়ে নিশার চোখে পড়ে এমনি জায়গায় রেখে দেন।

নিশা ভালবাসে। ওর এই বয়সে অন্তরে একটা রঙের ছটা লেগেছে। বাইরে একটু বর্ণময় হতে তার ভালই লাগে, অন্তত ক্লাশের মেয়েদের মধ্যে এভাবে থাকতে। ক্লাশ সেভেনের মেয়েরা সকলেই জানে নিশা কোত্থেকে স্নো পায়— কেবল নিশাই জানে না সবাই জানে বলে। ওর মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় জোনালি যদি সঙ্গী মেয়েদের বলে দিয়ে থাকে। বলবে কি? না বোধহয়। বললে তো ও অনেক কথাই বলতে পারে। নিশা ওদের বাড়িতে খায়, জোনালির মা ওকে কি কি দিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই বলবে না। জোনালি ওকে সবচাইতে বেশি ভালবাসে। কত রাতে তো ভাত খাওয়ার পরে নিশাকে জোর করে নিজের কাছে শুইয়ে রেখেছে। পাশের মৃণালদাদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়ার সময় কতবার তো নিশাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে গেছে।

এরপর ধীরে ধীরে ভাগ্যবতী উৎকণ্ঠা নিয়ে নিশার ফেরার পথ চেয়ে বসে থাকতে শুরু করলেন — কতক্ষণে জোনালি-বাবুল-মৃণালরা নিশাকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। নিজের বয়স্থা মেয়ের জন্য পথ চেয়ে থাকতে থাকতে কেমন এক অদ্ভুত

উত্তেজনা অনুভব করেন। বিশ্বাসই হতে চায় না যে তার মেয়ে এত বড়টা হয়েছে।

সত্যিই তাই হল। ছোটবেলায় অতি দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়ে প্রতি মুহূর্তে ভাগ্যবতীকে সন্ত্রস্ত রেখে একসময় নিশা তাকে অবাক করে দিল। ভাগ্যবতীর উৎসুক দৃষ্টির সামনে বয়স নিশাকে যতটা দেওয়া দরকার ততটাই দিয়ে ভরিয়ে দিয়ে চলে গেল। আর বিহ্বল মা নিশাকে দিল কটা কাঁচের চুড়ি, একটা জার্মান সিলভারের নেকলেস এবং একজোড়া সোনার রিং। একটা মাত্র গয়না পরেও নিশা চোখের সামনে দাঁড়ালে ভাগ্যবতীর মনে হয়, যেন গোটা ঘটনাটাই একটা অদ্ভুত মায়া। নিশা যেন ঈশ্বরের এক বাড়তি দান। নিশা স্কুলে গেলে, এখানে ওখানে বেড়াতে গেলে ভাগ্যবতী ছটফট করতে থাকেন; মাঝে মাঝে হঠাৎই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, এই বুঝি সাগর শুকিয়ে গেল। এই বুঝি মাণিক অন্তর্হিত হল।

এদিকে নিজের ভেতর এত আভরণ আবিস্কার করে নিশা এক মধুর অস্বস্তি অনুভব করে। রাস্তা, ইস্কুল, বাড়ি সবই তার কাছে নতুন মনে হয়। রাস্তায় সে যে কবে থেকে মাথা হেঁট করে হাঁটতে শুরু করেছে নিজেই জানে না। আর মাথা তুলে যাদের দেখে তাদেরও কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়, কেন যে নিজেই ভেবে পায় না। ওদের ঘর থেকে চোখে পড়ে তরুদিদের পোর্টিকোতে বসে, তরুদি আর অজয় ডাক্তার, কি এত কথা বলে জানার জন্য মনটা তার উসখুস করতে থাকে। চুপি চুপি গিয়ে আড়াল থেকে শুনে আসতে ইচ্ছে করে। পরদিন তরুদি কাছে এলে ও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, কাল এই তরুদিই কি অপূর্ব সুন্দর ভঙ্গীতেই না কথা বলছিল ঐ ডাক্তারটির সঙ্গে।

ইস্কুলে যাওয়ার পথে ওদের থেকে জোরে হেঁটে ওদের পিছনে ফেলে পাশ দিয়ে স্কুল কলেজের ছেলেরা যখন হেঁটে যায় নিশার কেমন দম বন্ধ হয়ে আসে। পিছন থেকে ছেলেদের কথাবার্তার শব্দ কাছাকাছি হতে আরম্ভ করলেই নিশারা নিজেদের মধ্যে কথা বন্ধ করে দেয়, রাস্তার ধার ঘেঁসে একটু সরে আসে, এই ছেলেগুলো এসে পড়ল, এই ওদের সমানে সমানে এসে গেছে, এই পার হয়ে গেল। এই সময়টুকু নিশা নিজের সামনে দু'হাত দূরের মাটির দিকে তাকিয়ে রাস্তা হাঁটে, কিন্তু ঐ হাঁটার ফাঁকে সামনে হেঁটে যাওয়া স্কুল ছাত্রদের পকেটের স্বল্প খুচরো পয়সার ঝুনঝুন শব্দটাও যেন কানে দশজন নর্তকীর পায়ের ঘুঙুরের শব্দের সমান আওয়াজ নিয়ে ওর কানে প্রবেশ করে। ছেলেদের প্রত্যেকটা কথা ও যেন প্রাণপণে শোনে। কি যে বলে ছেলেগুলো। ওদের কথায় অনেক মারপ্যাঁচ, যা বলে তা নয়, তার অর্থ সম্ভবত অন্য কিছু।

এই সময়টা নিশার খুবই প্রিয়। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে যখন মারোয়াড়ির বাড়িতে ছেলে পড়ানো শেষ করে বাবাকে ফিরতে দেখে, তখন মজাটা নষ্ট হয়। যদি বা সে দলটার কিনারে কিনারে যাচ্ছিল এখন কোন একটা কিছু বলার ছলে সে দঙ্গলের

মধ্যে ঢুকে পড়ে। যতক্ষণ না বাবা পার হয়ে যাচ্ছেন, ততক্ষণ সে অন্য দশটা মেয়ের মাঝে লুকিয়ে থাকে। বাবাকে বিশ্বাস নেই, যা লোক হয়তো সবার সামনেই জিগ্যেস করে বসবে, ভাত খেয়ে এসেছিস, না খাসনি?

বাবা যদিও আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে রাস্তায় কখনও কথা বলেনি, কিন্তু তবুও ওর বড় রাগ হয়। বাবা একটু পরে বাড়ি ফিরতে পারে না? মাকে বলতে হবে কথাটা।

নিশার মাকে বলতে হল না, রজনী মাস্টার নিজে থেকেই একদিন রাস্তা ছেড়ে দিলেন। মারোয়াড়ির বাড়ি থেকে বেরিয়েই সর্বদা দেখেন ঝাঁক ঝাঁক ছেলেমেয়ে। যতক্ষণ চোখে দেখা যায় ততক্ষণ তিনি মেয়েদের দলগুলো তন্ন তন্ন করে খোঁজেন কোন্ দলটার মধ্যে নিশা আছে। যখন জোনালিদের মধ্যে নিশাকে দেখেন তখন দূর থেকে নিশার দিকে তাকিয়ে নিজের অজান্তেই তিনি হাসেন। একদল মেয়ের সঙ্গে নিশাও মিশে গেছে, কারো সঙ্গেই একটুও বেমানান নয়। তার নিজেরই ভুল হয়ে যায়, ওই মেয়েটা তারই সন্তান কি না। কার সাধ্য বলে এই মেয়েটির বাবা একটি মারোয়াড়ি বাড়ি থেকে ত্রিশ টাকা মাসমাইনে নিয়ে বাড়ি ফেরে।

নিশারা কাছাকাছি হলে রজনী মাস্টার কদাচিৎ না থাকতে পেরে চট করে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নেন। সোজাসুজি তাকাতে তার লজ্জা করে। ঘরে ঢুকেই মাস্টার স্ত্রীকে জিগ্যেস করেন, 'ও ভাত খেয়ে গেছে তো? কেন, তখনও ভাত হয়নি বুঝি? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, টিফিনে আসবে তো?' তারপর রজনী মাস্টার দমকে দমকে হাসতে থাকেন আর বলে চলেন, 'ওকে যদি তুমি রাস্তায় দেখতে! এত এত বড়লোকের মেয়ের মধ্যে তুমি তোমার পান্তাভাত খেয়ে যাওয়া মেয়েকে চিনতেই পারতে না।'

ভাগ্যবতী সকাল সাড়ে নটায় কখনই বা মেয়েকে দেখতে যাবে, অতএব মাস্টারের হাসি দেখে তিনি কেবল একটু হাসেন।

স্কুলের রাস্তায় দিনে দিনে নিশা যত উজ্জ্বল হয়ে উঠল, রজনী মাস্টারের ততই নিজেকে অপরিচ্ছন্ন মনে হতে লাগল। ছোট ছোট কাঁচা পাকা দাড়ি গোঁফে ঢাকা মুখ, ভাগ্যবতীর সেলাই করে দেওয়া হাতা ছেঁড়া জামা, সব সময় কলের জলে ধুয়ে লাল হয়ে যাওয়া ধুতি, এই বেশে শহরের প্রধান সড়কে সকাল সাড়ে নটায় হেঁটে যেতে মাস্টারের সঙ্কোচ হল। একদিন তিনি রেললাইন পার হয়ে ধান-কলের সামনের রাস্তাটা দিয়ে এসে দেখলেন, ভালই, গাড়ি ঘোড়া নেই, লোকজন কম, রাস্তা একটু বেশি হলেও তাড়াতাড়ি ঘরে পৌঁছনো যায়।

প্রধান সড়কটাতে এবার নিশার জন্য পড়ে থাকল অজস্র মানুষ। এত মানুষের মেলা যে নিশাই মুখ উঁচিয়ে তাকাতে পারে না। মাথা তুললেই যে লোকটার চোখে চোখ পড়ে যায়, সে যে কেন নিশার দিকে অমন অদ্ভুত ভাবে তাকিয়েছিল, একথা ভাবতে ভাবতেই সে প্রায় স্কুলে পৌঁছে যায়। লোকগুলো নিশ্চয়ই ওকে কিছু বলতে

চায়। হায় রাম, একপাল মেয়ের সামনে তাকে সত্যিই যদি কেউ কিছু বলে বসে! সর্বনাশ হবে। অথচ কি বলতে পারে, এ সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। কেবল এটুকু মনে হয় যা-ই বলুক শুনতে নিশ্চয় ভাল লাগবে। বিকেলবেলা স্কুল থেকে ঘরে ফিরে নিশার নিজের উপর নিজেরই রাগ হয়। এভাবে যদি সঙ্কোচে গুটিয়ে থাকে, তাহলে আসা যাওয়াই সার, কোন দিনই কিছু শোনা হবে না।

কিন্তু যখন নিশা সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে সোজাসুজি তাকাতে শিখল। টিফিনে ভুজিয়া কিনতে গিয়ে দোকানদারকে 'তোমার বিয়ে কবে?' জিগ্যেস করতে শিখল। তখন বিরক্তিতে তার মন ভরে উঠল। ও বিরক্ত হল প্রতিটি লোকের ওপর, স্কুল কলেজের প্রতিটি ছাত্রের ওপর, যেমন জোনালি বিরক্ত হচ্ছিল ওদের বাড়ির সামনের সরকারি লাইটটার উপর। সন্ধ্যা হল আর অমনি ঝাঁ-ঝাঁ করে জ্বলতে শুরু করে দিল। পূর্ণিমাই হোক আর অমাবস্যাই হোক, ওদের সামনের বারান্দায় আলোর দরকার থাকুক চাই না থাকুক জ্বলতে থাকবে তো জ্বলতেই থাকবে। একটুও কমবেশি এদিক ওদিক নেই। আর লোকেরও যেন লাইট পোস্টের মতই রাস্তায় সেজে এসে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই। যেন মহারানীর যাওয়ার রাস্তার পাহারাদার সব, স্থির দাঁড়িয়ে থাকবে কিন্তু কথা বললেই মাথা কাটা যাবে।

প্রথমে নিশার এই বিরক্তি ছিল অবুঝ, গোপন। কিন্তু ধীরে ধীরে তা তীব্র অভিমানে ফুলে উঠতে লাগল, একটা অক্ষর ধেবড়ে গেলে খাতার একটা পুরো পাতাই একটানে ছিঁড়ে ফেলে, ও দেখল রাস্তার লোকগুলো সবার জন্যই লাইটপোস্ট কিংবা প্রহরী নয়, এমন কি তার হাতে হাত দিয়ে চলে ফেরা জোনালির জন্যও নয়।

মসজিদের মোড়টা পার হয়ে অন্য মেয়েদের বিদেয় করে নিশা আর জোনালি বাড়ির পথে সামান্য এগোনোর পরে পরেই সাইকেলে চড়ে কোথায় থেকে ঝুপ করে উদয় হয় মৃণাল। সামনের চাকাটা ওদের দুজনের সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষে, তারপর প্যাডেলটা একবারে পাঁচ আঙুলও ঠেলে কিনা সন্দেহ, সাইকেল ঠিক জোনালি নিশার হাঁটার তালে তালে এগিয়ে চলে। ছোট থেকেই বড় হতে দেখেছে মৃণালকে, অথচ সব লজ্জা যেন এই সময়টার জন্যই রাখা ছিল জোনালির, সে মাথা নিচু করে পথ হাঁটে। মৃণাল কিছু একটা জিগ্যেস করলে নিশা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে যায়, না তাকে নয়, বুঝতে পারে ও জোনালিকেই জিগ্যেস করেছে। যে হাসিটা নিয়ে ও মৃণালের মুখের দিকে তাকিয়েছিল সেই হাসিটা সামলে নিয়ে নিচের দিকে তাকায়, বড় কষ্ট হয়।

ঘরে পৌঁছনোর সাথে সাথে হয়তো ভাগ্যবতী জিগ্যেস করলেন, 'কানের পাশে ওগুলো কি লাগিয়েছিস?' দৌড়ে বেড়ায় ঝোলানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিশা দেখে, কালি। ছোট্ট একটা দাগের মত। গোটা রাস্তাটা এই দাগটা তার গালে ছিল নাকি?

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখটা দেখতে দেখতে ওর জোনালির কথাই

বেশি মনে হল, জোনালি দিনকে দিন সিঁদুরের আভা ধরছে, ওর গাল দুটো আরও ভরাট হয়েছে। ছোট হওয়ার জন্য গত বছরের বানানো তিনটে ব্লাউজ বাবার হাতে নিশার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। সবাই বলে জোনালি দেখতে ভারি সুন্দর। নিশা দেখতে কেমন, একথা এখন পর্যন্ত কারো মুখে শোনেনি। এই চোখ, এই ভ্রূ, নাক, বেণী দুটো সামনে আনলে এরকম হয়— আয়নার মধ্যে নিজেকে দেখতে ভালই লাগে নিশার। মৃণালরাই বা কি ভাবে কে জানে।

মৃণালরা যে কিছুই ভাবে না, সে কথাটা যেদিন জানতে পারল সেদিন ঘরে ফিরে কাঁদবে না প্রচণ্ড আক্রোশে পিটিয়ে পিটিয়ে বাড়ির ছাল-বাকলা উঠিয়ে ফেলবে ঠিক করতে পারেনি নিশা। বাঁ হাতটা জোরে কামড়ে ধরে ও দাঁড়িয়ে ছিল। ভাগ্যবতী কাছে এসে বললেন, 'জামা-কাপড় বদলা, আবার দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ও তোর বাবার হাতে জোনালির মা ঐ শিশিটা পাঠিয়েছে।' ভাগ্যবতী নিশার পড়ার টেবিলটার দিকে আঙুল দেখালেন।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে নিশা টেবিলটা দেখল। স্নোর শিশি একটা। তীরের বেগে নিশা টেবিলটার কাছে পৌছল তারপর শিশিটা খামচে তুলে নিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘরের এককোণে ছুড়ে মারল। কিছু বলতে গিয়ে ভাগ্যবতীর মুখটা হাঁ হয়ে রইল। কোণায় রজনী মাস্টারের বাবার জোগাড় করা একটা হরিণের শিং রাখা ছিল, তাতে লেগে স্নোর শিশিটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। চারদিকে স্নো ছিটকে পড়ল।

জোনালি-বাবুল-মৃণালরা সিনেমা দেখার জন্য নিশাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। পরের দিন দেওয়ালি, স্কুল ছুটি; নিশা ওর কাপড়টা পরে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল। সিনেমা হলের ভেতর অন্ধকারে মৃণালকে ও ভাল করে দেখতেই পেল না। তাছাড়া ওদের মাঝখানে জোনালি বসেছিল। সিনেমা শেষ হওয়ার পর বাইরে বেরিয়ে কোন একটা ছুতোয় নিশা মৃণালকে জিগ্যেস করল, 'আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন?' মৃণাল কথাটা জোনালিকে জানাল। জোনালি বলল, 'আমরা না হয় ওদিক দিয়ে ঘুরে যাই, নিশাকে বাড়িতে পৌঁছে ফিরে আসব।' প্রস্তাবটা মৃণালের ভাল লাগল। সেভাবেই কাজ হল। ঘরে ঢুকেই নিশার যেন দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। এই ভাঙাচোরা বাড়ি, খসে খসে পড়া বেড়া, এগুলোই যেন ওর কাল হয়েছে। এই সব সে ভেঙে ফেলতে পারে না। আর পারে না বলেই যেটা পারে, সেটাই ভাঙল— স্নোর শিশিটা।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে মারোয়াড়ির দেওয়া হালুয়া মিঠাইয়ের একটা পোঁটলা নিয়ে রজনী মাস্টার একটু দেরিতে ফিরে এলেন। হরিণের শিংটার দিকে তাকিয়ে চুপি চুপি ভাগ্যবতীর কাছে কেমন করে কি ঘটেছে জানতে চাইলেন। 'কি জানি কি হয়েছে ওর, আমি বলতে পারব না।' ভাগ্যবতী জানান। রজনী মাস্টার নিজেও জিগ্যেস করলেন

না, তার ভয় হল। নিশা আর ভাগ্যবতী যখন ভাত খাচ্ছিল, তিনি তখন একবার চেষ্টা করেছিলেন মাটি থেকে কিছু স্নো তোলা যায় কি না, পারেননি। এক জায়গায় জমে থাকলে তবু না হয় একটা কথা ছিল, এ একেবারে চারদিকে ছড়িয়ে একাকার।

পরে একদিন খুশির মেজাজে ভাগ্যবতী নিশাকে জিগ্যেস করেছিলেন, 'সেদিন তুই ওভাবে স্নোর শিশিটা ভাঙলি কোন্ রাগে?'

'এত সব জিনিস না পেয়ে যখন চলছে তখন ঐ একটু স্নো না হলে কি এসে যায়? বাবাকে বলে দিও লোকের কাছ থেকে আমার জন্য যেন কিছু না আনে। আমার নিজের যা আছে তাতেই হবে।'

আর এই কথাটা প্রমাণ করার জন্য নিশা অস্থির হয়ে উঠল। এমন সময় রজনী মাস্টার দিলীপের কাছ থেকে একটা দুর্ভার বোঝা ঘরে নিয়ে এলেন— তিনটে অঙ্ক। একটায় একটা চৌবাচ্চায় দুটো নল আছে জল ঢোকার আর বের হওয়ার, অন্যটায় একটা ব্যাঙ একটা কুয়ো থেকে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে উঠছে এবং পড়ে যাচ্ছে; তিন নম্বরটায় কোন এক গোয়ালা দুধে জল মিশিয়ে বেচেছে। চিন্তামণি হাজারিকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাস্টার আসার পথে দিবাকরকে খবর দিয়ে এলো, 'কালকে একবার যেওতো বাবা, একটু সাহায্য করতে হবে।'

আর পরদিন বিকেলে যখন দিবাকর গোয়ালার লাভের হিসেব করে উত্তরের নিচে দাগ দিচ্ছে, ভাগ্যবতী ওর জন্য চা করছেন, সেই সময় নিশার ডান চোখে কিছু একটা ঢুকল। কি যে ঢুকল সে-ই জানে। দিবাকর প্রথমে তো কিছুই দেখতে পেল না। নিশাকে জানালার কাছে নিয়ে অস্তোন্মুখ সূর্যের রক্তিম আলোয় আরেকবার দেখল, ভুতে আঙুল রেখে চোখের নিচে পাতা টেনে দেখল, গালে আঙুল রেখে নিচের পাতা টেনে দেখল, কিছু নেই, কেবল নিশার চোখের কালো মণির মধ্যে ছোট্ট জানালাটা আর তার মধ্যে দিয়ে অনেক দূরের অস্তোন্মুখ লাল সূর্যটা দেখা যাচ্ছে।

নিশা কিন্তু বারবার বলা সত্ত্বেও কিছু নেই বলে মানতে রাজি হল না। প্রথমে চোখটা, তারপর গোটা শরীরটা তার যেন পুড়ে যাচ্ছিল। দিবাকর চলে যাওয়ার পর গালের ঐ জায়গায় হাত রেখে ও ভাবতে চেষ্টা করল কতক্ষণ সে ওখানটা ছুঁয়ে ছিল। চোখ দেখা সারা হতেই ও হাতটা সরিয়ে নিয়েছিল কি? নাহ্, প্রয়োজনের চাইতে একটু বেশি সময়ই ছুঁয়েছিল। নিশ্চয়।

কিন্তু রজনী মাস্টার তো আর রোজ রোজ চৌবাচ্চায় দুটো নল থাকা অঙ্ক ঘরে আনেন না অতএব দিবাকরও রোজ আসে না। কিন্তু হঠাৎই নিশার মনে হল সেও স্কুলের অনেক পড়া বুঝতে পারে না। মাকে বলল, ' আমি কিন্তু এবার ফেল করব মা। পড়া-টড়া একদম মাথায় ঢুকছে না। তার মধ্যে আবার দিদিমণি বলেছেন এবার নাকি পরীক্ষা খুব কঠিন হবে।'

ক্লাশ নাইনের পরীক্ষা, কঠিন হতেই পারে। রজনী মাস্টার দিবাকরের দাদা

প্রভাকরকে গিয়ে ধরে পড়লেন, দিবাকর যদি মাঝে মাঝে একটু নিশাকে দেখিয়ে শুনিয়ে দেয়। প্রভাকর জানাল, 'ঠিক আছে স্যার, আমি ওকে বলব'খন।'

এরপর থেকে দিবাকর মাঝে মাঝে আসে। তার নিজের পড়াশুনোর চাপও খুব বেশি। তাই ঘন ঘন আসতে পারে না। কিন্তু যে সময়টুকু পায় তারই মধ্যে যতটা সম্ভব নিশাকে পড়া বোঝানোর চেষ্টা করে। রজনী মাস্টার তখন বসে থাকে চিন্তামণি হাজারিকার বাড়ির কাঠের চেয়ারটায়। ভাগ্যবতী থাকেন রান্নাঘরে আর টেবিলে কনুইয়ে ভর দিয়ে নিশা ঘন ঘন আড়মোড়া ভাঙে। কিছু সময় ধরে এটা সেটা বলার পর দিবাকর জিজ্ঞাসা করে, 'বুঝেছ?'

নিশা চমকে ওঠে, এই কথাটাই তো ও-ও দিবাকরকে জিগ্যেস করবে বলে ভাবছিল। ও বড় করে চোখ মেলে দিবাকরের মুখের দিকে তাকায়, কি বোঝার কথা জিগ্যেস করছে ও। দিবাকর একবার পড়লেই বইয়ের বিষয় বুঝতে পারে, কিন্তু আরও অন্য কিছু সে একটু বুঝতে পারুক তার অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে নিশা।

অনেক দেরি হচ্ছে দেখে একদিন নিশা ভয়ে দুরু দুরু বুকে, কাঁপা কাঁপা হাতে রুল টানা খাতার পাতায় আবোল তাবোল লিখে দিবাকরের পকেটে ঢুকিয়ে দিল। কথা এমন বিশেষ কিছু নয়, দিবাকর এলে ওর খুব ভাল লাগে, এই পর্যন্ত। বাকি আর সব অতি সাধারণ বিষয়। হাতের লেখা দেখে দিবাকর যেন না হাসে, চিঠিটা পড়েই যেন ছিঁড়ে ফেলে। অবশেষে এই বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছে, 'আপনি বোধহয় আমায় ঘৃণা করেন।'

দিবাকর বড় বিপদে পড়ল। সে পড়াশুনার থেকে মুখ না তোলা ছেলে, প্রথম হওয়ার পরও পরীক্ষাটা মনোমত হয়নি বলে ভাবা ছেলে, কলেজের ইলেকশনে প্রথম যে এসে ধরে তাকেই ভোটটা দিয়ে সুড়সুড় করে ঘরে চলে আসা ছেলে। নিশার চিঠিটা পড়ে সে প্রথমে ভাবল মেয়েটা পাগল আথচ তাকে মুখের ওপর পাগলী বলে দেওয়ার মত সাহসও তার নেই। এটা যদি প্রেমের চিঠি হয়, তা হলে ভয়ের কথা। প্রেমের আদি অন্ত সে কিছুই বোঝে না। কিন্তু এটাও ঠিক নিশার ওপর ওর একটা স্নেহের টান আছে। সে যত অল্প বয়সের মেয়ে তার চাইতেও তাকে ছোট মনে হয়।

একদিন নিশাকে সে এই কথাটাই বলার জন্য এল। এসব ব্যাপারে তার মুখে ভাষা যোগায় না। ঘরে ভেবে আসা সব কথাই বলার সময় উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। সে শুধু বলতে পারল, হ্যাঁ নিশাকে সে খুব ভালবাসে।

আর এই কথা শুনে নিশার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এক অভূতপূর্ব লজ্জায় ওর গাল দুটো রাঙা হয়ে উঠল। একটা বিরাট বোঝা বুক থেকে নেমে যাওয়াতে ও যেন পাখির মত হাল্কা হয়ে গেল, এক অদ্ভুত তৃপ্তির আবেশে সে যেন বোবা হয়ে গেল।

সেই দিন থেকে নিশা দিবাকরের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারে না। তাকালেই সমস্ত শরীর কেমন গুটিয়ে যায়। পড়ার টেবিলে বইয়ের বাইরে অন্য কথা আলোচনা করতে তার ভয় হত। কি জানি দিবাকর আবার কি বলে ওকে বোবা বানিয়ে দেবে। সেই দিন দিবাকর যা বলেছিল, সে কথাগুলোই যেন তার কানে অনবরত গুন গুন করে বাজে। সামনে বসে থাকা দিবাকর, আর সেদিনের কথার মালায় ডুবে থাকা সে, এই-ই অনেক, এর চাইতে বেশি তার আর কিছু চাই না। কি দরকার স্কুল থেকে ফেরার পথে হাফ প্যাডেল মেরে সাইকেল চালিয়ে তার সঙ্গে আসার।

কিন্তু একদিন রজনী মাস্টার বড় উত্তেজিত হয়ে ঘরে ফিরলেন। আজকাল তিনি চিন্তামণি হাজারিকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এ বাড়ি ও বাড়ি ঘোরেন, তাদের ছেলেমেয়ের খবরাখবর নেওয়ার পর নিশার কথা বলতে বলতে হাসেন। তাদেরই একটি বাড়ি থেকে ফিরে এসে রজনী মাস্টার ভাগ্যবতীকে জিগ্যেস করলেন, 'ও শুয়ে পড়েছে?'

'হ্যাঁ শুয়ে পড়েছে, কেন?'

মাস্টারের শুকনো মুখখানা হাল্কা ঘামে ভিজে উঠেছিল। কপালের শিরাগুলো ফুটে উঠেছিল। তিনি এই মাত্র যা শুনে এলেন তা তার গোটা জীবনের তিল তিল সঞ্চিত সম্পত্তি মুহূর্তের আগুনে ভস্মীভূত হওয়ার তুল্য। তিনি কিছুই জানেন না, ভাগ্যবতীও কিছু না জানতে পারেন, কিন্তু নিশা আর দিবাকরের ব্যাপার স্কুলের ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে মায় বুড়োবুড়ি সবার মুখে মুখে।

'এসব চলবে না; আমি এ সব চলতে দেব না।' রজনী মাস্টার গর্জে উঠলেন।

'চেঁচাবেন না; এত অস্থির হচ্ছেন কেন? রাত হয়েছে।'

'হোক রাত। আমি এখনই গিয়ে দিবাকরকে বলে আসব। কাল থেকে ও যেন আর এমুখো না হয়। তুমি কিছু বোঝ না। আমার একমাত্র সন্তান—।'

'একমাত্র সন্তান' এই কথাটা রজনী মাস্টারের মুখে লেগেই থাকে। ঘরে বাইরে নিশার কথা উঠলেই মাস্টার মন্ত্রের মত বিড়বিড় করে উচ্চারণ করেন কথাটা।

ভাগ্যবতী জোর করেই মাস্টারকে শুইয়ে দিলেন। নিশার যাতে ঘুম না ভাঙে তার জন্য সব রকম চেষ্টা করলেন। কেবল ঘুম এল না তার নিজের। তরুণী কন্যার মা হলে এক সময় তাকে অনেক বিড়ম্বনা সইতে হয়। সেই বিড়ম্বনা তার জীবনে এল অনেক দেরী করে। তিনি হাসবেন না কাঁদবেন বুঝতে পারলেন না। হয়তো এ রকম অনেক বিপর্যয় সইতে সইতে তিনি আরও বেশি অভিজ্ঞ হতে পারতেন। হয়তো আজ রাতের এই বিড়ম্বনা তিনি নিশার আরও তিন দিদির সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারতেন। অনেক দিন আগের তিনবারের যন্ত্রণা ভাগ্যবতীকে আরেকবারের জন্য কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। তার মেয়ে শেষ পর্যন্ত যুবতী হয়েছে। কোন একটা ছেলের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে কেউ কিছু বলেছে, কাল সকাল থেকে

তার মেয়েকে শাসন করতে হবে। একটা নতুন কাজ, অদ্ভুত অপূর্ব। দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও ভাগ্যবতী একটা অদ্ভুত পুলক অনুভব করলেন। আর আশ্চর্যের কথা, বারে বারে তার দিবাকরের মুখটা মনে পড়তে থাকল।

পরের দিন রজনী মাস্টার মারোয়াড়ির বাড়ির ছেলে পড়িয়ে শহরের বড় রাস্তা দিয়ে ফিরে এলেন, ঠিক সাড়ে নটায়; নিশা ঠিকমত স্কুলে যাচ্ছে কিনা দেখতে। যাচ্ছে। ঘরে ফিরে তিনি আবার বকবক করতে লাগলেন, 'সারাটা জীবন মাস্টারী করলাম, শয়ে শয়ে ছেলে সোজা করলাম, কেউ আমাকে ধোঁকা দিতে পারেনি; আর এখন ঘরেই...'

ভাগ্যবতী বললেন, 'মিছে বকবেন না তো। বলছি তো যা করার আমি করব। যদি তাতেও না হয় তখন আপনাকে জানাব।'

সবারই কপাল ভাল। এরপর যেদিন দিবাকর এল, রজনী মাস্টার ঘরে ছিল না। নিশাকে রান্নাঘরের উনুনটা দেখতে পাঠিয়ে ভাগ্যবতী দিবাকরকে জানাল, এতদিন নিশাকে পড়া দেখিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি খুব খুশি হয়েছেন। এখন ওর পরীক্ষা কাছে এসেছে এ কদিন ও নিজেই পড়ুক। আর এ রকম আসা যাওয়াটা ভাগ্যবতীর খুশির কারণ হলেও, চারপাশের লোকজনের চোখে ভাল না-ও ঠেকতে পারে। দিবাকর ভাল ছেলে, কেনই বা সে মিছিমিছি লোকের কথা শুনতে যাবে।

দিবাকর অবাক হয়ে ভাগ্যবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এ রকম নিরপরাধ, নিরীহ, কাতর দৃষ্টি ভাগ্যবতী কারও চোখে কখনও দেখেননি। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তার মনে হল যেন তিনি একটা মহাপাপ কাজ করলেন, যার কোন ক্ষমা নেই।

ভাগ্যবতীর পাশ কাটিয়েই নিশা ঘরে ঢুকল। ইচ্ছা করলে ভাগ্যবতী 'শুনে যা তো' বলে তাকে বাধা দিতে পারতেন। কিন্তু দিলেন না। দিবাকরের দিকে চেয়ে নিশা অতীব শান্ত বিষাদের হাসি হাসল, তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে নির্বিকার কণ্ঠে বলল, 'আপনি আবার এ সব কথায় কিছু মনে করবেন না। আমি যদি আপনাকে কোন মন্দ কথা বলতাম তো আপনার পা ধরে ক্ষমা চেয়ে নিতাম।' নিশা এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে তারপর আবার বলে, 'আমাকে না দেখলে বুঝি আপনি আমাকে ভালবাসবেন না?' নিশা আরেকবার হাসল।

দিবাকর ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। একদিন বারে বারে দেখতে বলা সত্ত্বেও নিশার চোখে কিছু নেই বলেছিল, আজ অন্যদিকে তাকিয়ে থাকা তার চোখ দুটোর কথা ভেবে বার বার তার মনটা অধীর হল, সেই চোখে সে কি দেখতো! তার কি যে হল বড় ভুল হয়ে গেল। কিন্তু এখন বড় দেরী হয়ে গেছে; এতক্ষণে নিশ্চয় নিশার দু'চোখ জলে ভরে গেছে।

ভাগ্যবতীও ভেবেছিলেন, এবার হয়তো এই বোকা মেয়েটাকে সামাল দেওয়াই

কঠিন হবে। কিন্তু নিশার কোন বিকার নেই। সে একটি মুহূর্তও মন খারাপ করে থাকল না, এক সন্ধ্যা ভাত না খেয়েও থাকেনি। মা'র সঙ্গে একটিবারের জন্য কথাবার্তাও বন্ধ করেনি। স্কুলের পথে সে দু-একবার ধীরে মুখ তুলে এদিক ওদিক তাকায়, ঠিক দিবাকরকে দেখার জন্য নয়, এমনিই। নিশার এই অস্বাভাবিক শান্ত মুখের হাসি ভাগ্যবতীকে আরও অনুতপ্ত করে তুলল। একটা অপরাধ বোধের তীব্র অনুভূতি তাকে ক্রমাগত কষ্ট দিতে থাকল। একদিন নিজেকে আর সামলাতে না পেরে তিনি ভাতের পাতে বসে নিশাকে জিগ্যেস করলেন, 'দিবাকরকে আসতে বারণ করাতে তুই দুঃখ পেয়েছিস?'

হাতের ভাতের গ্রাস মাঝপথ থেকে থালায় ফিরিয়ে এনে নিশা স্থির দৃষ্টিতে মা'র মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎই কিছু একটা মনে পড়ে গেছে এমন ভাবে বলল, 'না না মা, আমি দুঃখ পাব কেন? তোরা নিশ্চয় কিছু ভাল বুঝেছিস, তাই এমন করেছিস। আমি কেন দুঃখ পাব?' কথাগুলো বলে একটা ম্লান হাসি দিয়ে নিশা আবার ভাতের গ্রাস মুখে তুলে নিল।

ভাগ্যবতীর বুকের মধ্যে হাহাকার করে উঠল। এর চাইতে যদি নিশা সেদিনকার মত একটানে ভাতের থালাটা ঘরের কোণে ছুড়ে ফেলে দিত তো তিনি অনেক বেশি শান্তি পেতেন। নিশার এই হাসি, এই কথা, কথায় কথায় মা'র সঙ্গে খুনসুটি করা নিশার নয়। একটি নারীর মনের সমস্ত শক্তি নিয়ে নিশার বয়সটার মধ্যে ঢুকে তন্ন তন্ন করে দেখলেন, নিশার আজকে হাসতে পারার কথা নয়। জন্মের দশদিন পরেও নিশাকে হাত পা নাচাতে দেখে তার যেমন একটা অবিশ্বাস জন্মেছিল, আজও তেমনি নিশার হাসিটাকে হাসি বলে বিশ্বাস করতে পারলেন না। এ ছাড়া এই মেয়েটির অন্তরের আরও গভীরে যাওয়ারও আর কোন উপায় তার ছিল না।

ভাগ্যবতী কিছুই করতে পারলেন না। তিনি আরও যত্নে নিশার স্কুলে যাওয়ার আগে ভাত রাঁধলেন। দুপুরবেলা নিশার পরিষ্কার কাপড় আরেকবার ধুলেন। এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা ওর চুলের ফিতাগুলোকে তুলে রাখেন, আরেকদিন অনেকদিন ধরে জমানো পয়সায় বাড়িতে কাপড় বেচতে আসা এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে নিশার জন্য একজোড়া ভাল পাটের মেখলা চাদর কিনলেন। নিশা মেখলাটা লম্বালম্বি খুলে দেখল ঝুল ঠিক আছে কিনা। চাদরটার ভাঁজ না খুলে পাড়টা বুকের ওপর ফেলে দেখল তারপর আবার ভাঁজ করে রেখে দিল। ভাগ্যবতী অনেক দিন পর জিগ্যেস করলেন, 'নতুন কাপড় জোড়া পরিস না কেন?' শেষে একদিন নিশা উত্তর দিল, 'কিছু একটা না হলে কি করে পরি ওটা? এমনিই যদি ইস্কুলে পরে যাই তো সঙ্গের মেয়েরা কি বলবে?'

ভাগ্যবতী রুদ্ধশ্বাসে কিছু একটা ঘটার অপেক্ষা করছিলেন।

কিন্তু তারপর এই বাড়িতে যা ঘটল, তার ফলে বাড়িটা শ্মশান হয়ে গেল। আজীবন নিজের ভাগ্যকে অবিশ্বাস করে আসা প্রতিটি মুহূর্তকে সন্দেহ আর ভয়ের চোখে দেখা ভাগ্যবতী, ভয়ের আসল রূপ দেখে থ হয়ে গেলেন, তারপরে মুখে একটি শব্দও না করে আছড়ে পড়লেন।

জীবনে প্রথমবারের জন্য নিশা বলেছিল, 'মা, আমার শরীরটা ভাল লাগছে না, আমি ভাত খাব না'। দুদিন গেল চারদিন গেল, রজনী মাস্টার পাগলের মত ডাক্তার-কম্পাউন্ডার, ফার্মেসিতে ছোটছুটি করলেন, চিন্তামণি হাজারিকা নিশার পায়ের কাছে, সুরমায়া মাথার কাছে, জোনালি-মৃণাল-দিলীপ-বাবুলরা নিশাকে ঘিরে ধরে বসে রইল আর ওদের মাঝখান থেকে সুযোগ বুঝে নিশা চলে গেল।

প্রথমে ক্লাস নাইন, তারপর পুরো বালিকা বিদ্যালয় ছুটি হয়ে গেল। বহু শিক্ষিকা এবং ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়েতে রজনী মাস্টারের ঘর ভরে গেল। এত মানুষ কোন দিন তার উঠোনে জড়ো হত কিনা সন্দেহ। সুরমায়া উন্মাদের মত করতে লাগলেন, চিন্তামণি হাজারিকা লুকিয়ে লুকিয়ে বারবার চোখ মুছলেন। জোনালিকে সাথের মেয়েদের ধরে রাখতে হল, দিলীপরা এক কোণে মাটিতে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

সবার চোখের আড়ালে লোকজনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে এসে দিবাকর নিশার বুজে থাকা চোখ জোড়ার দিকে খানিক একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে আবার সবার নজর এড়িয়ে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে সে যেন দেখে গেল, একটা কালো মণির ভেতর ছোট্ট একটা জানালা, তার মধ্যে অনেক দূরে একটা ছোট রক্তিম সূর্য ডুবে গেল।

এরপর এই বাড়িটাকে শ্মশানের নিস্তব্ধতা ঘিরে ধরল। দুটো বেঁচে থাকা প্রাণী ছায়ার মত ঘরটার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, কেউ কথা বলে না। কেউ কারো চোখের দিকে তাকায় না। দুজন দুজনকে ভয় করে। হঠাৎ যদি বা কখনও চোখে চোখ পড়ে যায় তো দুজনে ভূত দেখার মত দেখে। অনেক দিন পর্যন্ত পথ চলতি মানুষেরা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করত। বাড়িটার প্রাণ ফেরাতে ঘন ঘন আসতে লাগল সুরমায়া, চিন্তামণি হাজারিকা, জোনালিরা—সবাই। এই বাড়িটার সঙ্গে এককালে সম্পর্ক থাকা লোকের মধ্যে আসেনি কেবল দিবাকর। সে অন্য শহরের কলেজে পড়তে চলে গিয়েছিল। যেদিন ভাগ্যবতী এই খবরটা প্রথম শুনলেন সেদিন চমকে উঠে জিগ্যেস করলেন, 'কোথায় গেল ও? আবার আসবে না? কবে আসবে?

দিবাকরের ঘরে ফেরার দিনটার জন্য ভাগ্যবতী ভিতরে ভিতরে অস্থির অথচ নীরবে প্রতীক্ষা করে রইলেন। কলেজের বন্ধে দিবাকরের ঘরে ফেরার খবর যেদিন শুনলেন, সেদিন থেকে তিনি ঘন ঘন রাস্তার দিকের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে আরম্ভ করলেন। ছেলেটাকে দূর থেকে একবার দেখার বড় ইচ্ছা হল। কিন্তু দিবাকর সে রাস্তা দিয়ে একবারও গেল না। এত লোক ভাগ্যবতীর কাছে এল, সে কি

একবারও আসতে পারতো না? ঘরে না এলেও রাস্তা দিয়ে একবার যেতে তো পারে।

দিবাকর এদিকে আর এলই না, কলেজ খোলার আগেই সে চলে গেল।

ভাগ্যবতী একজন বিশ্বস্ত মানুষ চাইছিলেন, যে তার কাছে দিবাকরের খবর মাঝে মাঝে পৌঁছে দেবে। সে কোথায় থাকে, কে-ই বা তাকে রেঁধে বেড়ে খাওয়ায়, কে-ই বা তার পরিচর্যা করে। অথচ রজনী মাস্টারের কানে তার নাম বেশ যায়। কিন্তু ভাগ্যবতী বড় অসহায় বোধ করলেন, কাউকে জিজ্ঞাসা করতেই তার ভয়। একদিন জোনালি খবর দিল, দিবাকর অনেক দিন বাড়ি আসে না। দাদার কাছে চিঠি দিয়েছে ওর এম এ পরীক্ষার আর বেশি দিন বাকি নেই। ভাগ্যবতীর নাকের পাটা ফুলে উঠল, ক্ষীণ স্বরে অনেকটা অনুরোধের ভঙ্গীতে জোনালিকে জিগ্যেস করলেন, 'ওর পরীক্ষা কবে এই খবরটা আমাকে দিতে পারবি?'

জোনালি খবর এনে দিল। যেদিন থেকে দিবাকরের পরীক্ষা তার আগের দিন বিগ্রহের বেদীর সামনে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে থাকলেন এবং সারারাত বিনিদ্র কাটালেন।

একসময় রজনী মাস্টারের সব চুল সাদা হল, ভাগ্যবতীর শুকনো গাল মেচেতার দাগে ভরে গেল। এতদিনেও কিন্তু দিবাকর একটি বারের জন্যও ঐ পথ মাড়াল না। ভাগ্যবতী আশা করেছিলেন অন্তত একদিন সে আসবে এবং তিনি তার সব খবর রাখতেন।

কিন্তু যে খবরটা তিনি রাখতেন না সেই খবর দিতেই একদিন দিবাকরের মা স্বয়ং এলেন। ছোট একটি বাটায় পান তাম্বুল* এগিয়ে দিয়ে খবরটা দিলেন, দিবাকরের বিয়ে। মেয়ে পাশেরই জগন্নাথ নাজিরের মেয়ে।

ভাগ্যবতী নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। অনেক দূরে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে স্থির হয়ে রইল। যেন এই মাত্র কেউ তাকে নিশার দ্বিতীয়বার মৃত্যু সংবাদ দিয়ে গেল।

কদিন পর জগন্নাথ নাজিরের বাড়ি থেকেও বিয়েতে নেমন্তন্ন করে গেল।

সুরমায়া বিয়েতে যাবে কি না জিগ্যেস করাতে ভাগ্যবতী যাবেন না বলে জানালেন। এই বয়সে এই বিয়ে দেখার মত মনের জোর তিনি খুঁজে পেলেন না, কিন্তু বিয়ের দিন সকাল থেকেই তিনি এক অস্থির যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। কোথাও একমুহূর্ত শান্তিতে বসতে পারছিলেন না। একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে থাকা রজনী মাস্টারকে হঠাৎই বললেন, 'আমি বিয়েতে যাব'।

রজনী মাস্টার মুখ তুলে একবার ভাগ্যবতীকে দেখলেন, তারপর তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয় যাওয়া দরকার, যাওয়া দরকার। না গেলে আবার কিছু ভাবতে পারে। কখন যাবে? এখনই না রাতে?'

---

* অসমীয়া সমাজের নিমন্ত্রণের রীতি। পান, তাম্বুল ব্যতিরেকে কোন নিমন্ত্রণই গ্রাহ্য হয় না।

'রাতে'। ভাগ্যবতী জানালেন।

সন্ধ্যা লাগার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যবতী কনে-বাড়ি উপস্থিত হলেন। কনে বিজয়া তখন কলাগাছ দিয়ে ঘেরা জায়গাটার মধ্যে একটা উঁচু পিঁড়িতে বসে হলুদ খেলতে খেলতে সোনার বরণ ধারণ করেছে। ভাগ্যবতী কাঁপা কাঁপা হাতে তার কপালে, গালে, গলায়, হাতে বাটা হলুদ মাখিয়ে দিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

মেয়েরা মিলে কনে সাজাল, প্রকাণ্ড একটা আয়নার সামনে কনেকে বসিয়ে সবাই ঘিরে থাকল। বর আসার আগে খাওয়া দাওয়া সেরে নেওয়ার জন্য মেয়েরা যখন সবাই উঠে চলে গেল, তখন সেই একাকিত্বের মধ্যে ভাগ্যবতী বিজয়ার কাছে এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন। ঘোমটাটা কপালের ওপর তুলে একবার দেখলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তুমি খুব সুখী হবে মা। খুব সুখী হবে। আমি তোমার বরকে অনেক দিন দেখি না। হয়তো সে এখন আরও অনেক ভাল, অনেক বড় হয়েছে। আমি তাকে সেই কবে দেখেছি, তখন তোমরা স্কুলে পড়তে।'

বিজয়া মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে বলল, 'আমি জানি আইতা*'

জানে? চকচকে চোখ নিয়ে ভাগ্যবতী বিজয়ার মুখের দিকে তাকালেন। যদি জানেই তবে নিশা তার আরও অনেক দিন বেঁচে থাকবে, কাল পরশু রজনী মাস্টার আর ভাগ্যবতী মরে গেলেও আরও দুটো প্রাণী থাকবে যারা নিশাকে আরও অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখবে।

বর আসার হুলুস্থুলের মাঝখানে একটা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ভাগ্যবতী ঘরে ফিরলেন। রজনী মাস্টার একটা চেয়ারে সামনেই বসেছিলেন। বাক্স খুলে না পরা সেই মেখলা চাদরটা বার করে ভাগ্যবতী আবার বিয়েবাড়িতে চলে গেলেন। অন্ধকারের মধ্যে রজনী মাস্টার চেয়ারটাতে বসে থাকলেন। ধীরে ধীরে মধ্যরাত্রি হল। গোটা পাড়াটা নীরব হল। আর সেই নীরব অন্ধকারের মধ্যে বসে হাতের তালুতে মুখ ঢেকে রজনী মাস্টার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

যজ্ঞের কাছে বর কনে; মণ্ডপের চারপাশে অনেক লোকজন; তার মাঝে ভাগ্যবতীও বসেছিলেন। কেউ কেউ মাঝরাতে চলে গেল, কারো বা মাঝে মাঝে চোখ বুজে এল, কিন্তু ভাগ্যবতীর চোখে পলক পড়ল না। বার বার তার ভুল হচ্ছিল যে এটা তার নিজের বাড়ির উঠোন নয়, অন্যের বাড়ির উঠোন। ঘোমটার নিচে যে মুখটা সেটা কার ভাবতে গিয়ে তার বারবার ভুল হয়ে গেছে।

শেষ রাতে উৎসর্গের সময় তার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। হোমের পাশে

---

* অসমীয়া ''আইতা'' শব্দের যথার্থ কোন বাংলা প্রতিশব্দ নেই। ''আইতা'' অর্থে সম্মানিত বৃদ্ধা।

রাখা বড় সরাটা দেখতে দেখতে জিনিসে ভরে উঠল। এক সময় ভাগ্যবতী উঠে গিয়ে মেখলা চাদরটা তার ওপর রেখে এলেন। অনেক দিন বাদে খুব কাছ থেকে দিবাকরের মুখের দিকে তাকালেন, দেখলেন দিবাকর নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। আমকাঠের ধোঁয়ায় তার যেন কষ্ট হচ্ছিল, দিবাকর হাতের রুমাল দিয়ে তাই চোখ দুটো ঢেকে নিল।

ভাগ্যবতী আর মণ্ডপে থাকলেন না। একটি সঙ্গী দেখে বাড়ি ফিরতে চাইছিলেন কিন্তু কাউকে না পেয়ে তিনি বিয়েবাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। এক কোণায়, হাঁটুর ওপর গাল পেতে বসলেন, এক বুক ভাঙা কান্নার দমকে তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। শেষ রাতের কনেবাড়ি, 'কি হল বুড়িমা?' এই কথাটুকু জিগ্যেস করার মতও কেউ ভাগ্যবতীর কাছে ছিল না।

আকাশ

কিসের শব্দে জ্যোর্তিময় চৌধুরির ঘুম ভেঙে গেল, প্রথমে তিনি ধরতে পারলেন না। জেগে উঠেই তিনি শব্দটা কি ছিল, জানার চেষ্টা করলেন। খুব জোরে কি একটা ট্রাক গেল? সন্ধ্যাবেলায় তাড়াহুড়ো করে প্যাণ্ডেলের চালে যে লোকগুলো টিন তুলেছিল, তারই কি দুটো পড়ে গেল? না, শব্দটা মানুষের গলার মনে হল যেন, পাশের বিছানায় স্ত্রী তৃপ্তি কিংবা ওঘরে মেয়ে পাপড়ি ঘুমের মধ্যে চেঁচায়নি তো?

নাহ্। একটু পরে চৌধুরির কানে গেল আধ-ফার্লংটাক দূর থেকে আসা খোলা ভরাট গলার হাঁক, হুঁশিয়ার। পুলিশের ওপর অনাস্থা প্রকাশ করে এ অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের নিয়োগ করা রাতের পাহারাদার। বড় বীভৎস ওর এই হাঁক। ওঘরের পাশের কদম গাছের পাতা থেকে দু-এক ফোঁটা শিশির মণ্ডপের টিনের ওপর ঝরে পড়ছে, টুপ টুপ; আর কোথায় ছয়-ফুটি পালোয়ান রাতের চৌকিদারের গলাচেরা আওয়াজ। কোথায় মা'র আসার কথা জানতে পেরে বাসায় থাকা পাখির ছানার চিঁচিঁ ডাক, আর কোথায় হুলো বেড়ালের হাঁউ-হাঁউ।

চৌধুরি পাশ ফিরে লেপটাকে টেনে কান ঢেকে আবার ঘুমোনোর চেষ্টা করলেন। আজকাল আস্তে আস্তে ঘুম কমে আসছে; ঘুম ভাঙার পর জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো দেখতে পেলে মনটা ভাল লাগে, বাহ্ আজ বেশ ঘুমিয়েছি। কিন্তু তেমন রাত্রির সংখ্যা কমে গেছে। বহু রাতে তিনি জানালার ফাঁক দিয়ে স্ট্রিট লাইটের আলোকে দিনের আলো ভেবে অপেক্ষা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করেছেন সে আলো ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে না, তখন উঠে গিয়ে ঘড়ি দেখেন, আড়াই বা তিন কখনও দুটো। অবশ্য এখন ঘড়ি দেখা ছেড়ে দিয়েছেন। ঘড়িতে কম সময় দেখলেই তার ভয় হয়। এমনি হয়তো ঘুম হত, কিন্তু ঘড়িতে কম সময় দেখার পর আর ঘুম আসতে চায় না, ওই বিছানায় তৃপ্তি জেগে না ওঠা পর্যন্ত তিনি এপাশ ওপাশ করতে থাকেন।

অতএব চৌধুরি পাহারাদারটির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে ঘুমোনোর চেষ্টা

করলেন। চৌকিদার যখন হাঁক পেড়ে ঘুরছে, তখন সময়টা নিশ্চয় চোরের, অর্থাৎ গৃহস্থের গভীর ঘুমে থাকার সময়।

কিন্তু পাশ ফেরার পর চৌধুরির দুপুরের ডাকে আসা চিঠিটার কথা মনে পড়ল। রাত দশটা নাগাদ ওঘরে পাপড়ি ঘুমিয়েছে ভেবে তৃপ্তির সঙ্গে গুন গুন করে আবার চিঠিটার কথাই পেড়েছিলেন। শেষে হঠাৎ 'এহ্ অনেক দেরি হল। শোও, শুয়ে পড়' বলে তিনি লেপের নিচে ঢুকলেন এবং না ঘুমিয়ে অনেকক্ষণ চিঠিটার কথা ভাবতে থাকলেন।

এই যে সঞ্জয় নামের ছেলেটা, যার সঙ্গে চৌধুরিরা পাপড়ির বিয়ে দিতে যাচ্ছে, তার সুন্দর চেহারার আড়ালে লুকিয়ে থাকা আসল মানুষটাকে চৌধুরিরা চেনে কি? কি রকম অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তারা প্রতিমার মত সুন্দর, সরস্বতীর মত উজ্জ্বল মেয়েটিকে নিক্ষেপ করতে চলেছে, একবারও ভেবে দেখেছে কি? স্নিগ্ধা আলেয়া, রুনঝুন, গৌরী, সাকিনা হরুমাও*, চন্দ্রা—এরা যে সেই অগ্নিকুণ্ডের একেকটি অক্ষয় খড়ি (কাঠ) সেকথা এরা জানে কি? সঞ্জয়ের বুকের নোংরা ব্যারাকের কত নম্বর ঘরে পাপড়ির স্থান হবে তার খবর এদের জানা আছে কি? মেয়েকে পার করে দিয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়াই যদি তাদের উদ্দেশ্য তো তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেললে কি হয়?

তারপর নতুন প্যারাগ্রাফে লেখা ভাষাটা একটু ঘরোয়া। — আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বলেই কথাটা জানালাম। চিঠিটা লেখার ব্যাপারে আমাদের একটু দেরি হতে পারে, কিন্তু আপনাদের জন্য এখনও যথেষ্ট সময় আছে। চিঠিটির শেষে কারও নাম নেই।

প্রথমবার চিঠিটা পড়ার পর চৌধুরি একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন। এসব চিঠির কোন গুরুত্ব নেই। এই যে পাপড়িকে দেওয়ার জন্য তারা খাট, আয়না টি-সেট এনেছেন, এর সঙ্গে প্যাকিংয়ের খড়, থলে, ফাটা কাগজ ইত্যাদি ঢের আবর্জনাও এসেছে। আসবেই। তিনি ভাবলেন, চিঠিটা তৃপ্তির নামে না এলে, প্রথমে চিঠি খোলার সুযোগ পেলে তিনি চিঠিটা তৃপ্তিকে দেখাতেনই না। কিন্তু মুশকিল হল চিঠিটা তৃপ্তিই পেল এবং চিঠিটা পড়ার পর থেকেই গম্ভীর হয়ে গেল। আজ ওর ওবেলায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের লোকজনদের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করতে যাওয়ার কথা ছিল, গেল না। অন্য দিন গয়না আর কাপড় দেখতে আসা সবাইকে তৃপ্তি নিজে প্রত্যেকটা জিনিস এক এক করে দেখায় এবং তার সংশ্লিষ্ট বিবরণ পেশ করে— এই জোড়া অর্ডার দিয়ে বানানো, — এই সোনাটা নতুন কেনা, — এটা

---

* অসমীয়াতে লেখা "সরুমাও" এই নামের উচ্চারণ ভিত্তিক বানান "হরুমাও" হয়। এর বাংলা অর্থ 'ছোটমা'।

আগের আমি আর রেখে কি করব — ইত্যাদি; কিন্তু আজ পাপড়িকে সবার সামনে বসিয়ে চৌধুরির কাছে এলো। 'আপনি একবার যাবেন নাকি? অধিবাসের তত্ত্ব পাঠাতে এখনও ছ'দিন বাকি, একবার না হয় যান-ই।'

'কোথায়? ওদের বাড়িতে? না না—'

'আমার মতে, ওদের কথাটা জানানো ভাল। পারলে ওকেও চিঠিটা দেখানো উচিত।'

'ওকে মানে? সঞ্জয়কে? কি যে বল!' চৌধুরির মতে, সঞ্জয়দের চিঠিটা দেখানোর অর্থ ঐ চিঠিটা পাপড়িকে দিয়ে কপি করিয়ে তার নিচে পাপড়ির সই দিয়ে দেওয়া এক কথা।

অন্য দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে তৃপ্তি পাপড়ির সাথে ঠাট্টা তামাশা, তর্কাতর্কি, আলোচনা করে, এবং হঠাৎই একবার নিজের ঘরে এসে আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নেয়, কিন্তু আজ ও পাপড়ির কাছ থেকে দূরে দূরে থাকছে, যেন আজ পাপড়ির চোখে চোখ পড়লেই ও ধৈর্য রাখতে পারবে না।

তৃপ্তির কাছে চিঠির ব্যাপারটা হাল্কা করে দেওয়াটাই এখন চৌধুরির বড় কাজ।

ঘুমোতে চেষ্টা করে চৌধুরি ভাবলেন, এর বাইরে তার আর কি-ই বা করার আছে। মিছিমিছি কতগুলো বাজে কথা। সকালবেলা নেমন্তন্নের কথা বলে তৃপ্তিকে নিয়ে বেরোতে হবে এবং ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দিতে হবে। এখন ঘুমোতে হয়। ... শেষে গিয়ে যদি এ রকম একটা ঘটনা ঘটে... সঞ্জয় অনেক রাত অবধি ঘরে ফেরেনি, পাপড়ি ভাত না খেয়ে পথ চেয়ে বসে আছে, এগারটার* সময় সঞ্জয় ঘরে ফিরছে, পাপড়িকে দেখেই বিরক্ত হচ্ছে, পাপড়ি বারবার জিগ্যেস করছে, এত রাত অবধি সে রোজ কোথায় থাকে, সঞ্জয় বলবে, কোথায় আর — গৌরী, সাকিনা, হরুমাও, চন্দ্রা— । পাপড়ি তর্ক জুড়েছে, কর্কশ ভাষায় ভর্ৎসনা করছে, বালিশে মুখ গুঁজে গুমরে গুমরে কাঁদছে, রাত বারোটায় উন্মাদ হয়ে সঞ্জয় তাকে চড়াচ্ছে— এক চড়, দুই চড়, তিন চড় — ঠাস্ ঠাস্।

না, না, বলে জোরে আপত্তির ভঙ্গীতে বালিশের ওপর চৌধুরির মাথাটা নড়ে উঠল। ঠিক থাকা লেপটাকে একবার নাড়াচাড়া করে চৌধুরি একবার চোখ মেললেন আর তারপর এমন ভাবে চোখটা বুজলেন যেন এবার সব চিন্তা বাদ দিয়ে তিনি এখন ঘুমের সাধনা করবেন।

ঠাস্ ঠাস্ শব্দের চড়ের কথাই ওঠে না, পাপড়ির একুশ বছরের জীবনে চৌধুরি কখনও রাগের মাথায় ওকে একটা টোকা মেরেছেন বলেও তো মনে পড়ে না। অনেক

---

* অসমে অনেক জায়গাতেই শীতের প্রকোপ বেশি হওয়াতে তাড়াতাড়ি লোক শুয়ে পড়ে। অতি বড় মদ্যপও রাত দশটার মধ্যে ঘরে ফেরার চেষ্টা করে।

পুতুল, খেলনা, ফুঁসলানো, গান, শিয়ালের আক্রমণের ভয় দেখিয়েও যখন তৃপ্তি ওকে দুধটুকু খাওয়াতে পারতো না তখন হয়তো বিরক্ত হয়ে ওকে ধুপ ধাপ দুই একটা থাপ্পড় মেরেছে, কিন্তু সে থাপ্পড়ের কথা পাপড়ির নিজেরই মনে নেই। তার থেকে অনেক জোরে চৌধুরি তখন তৃপ্তিকে থাপ্পড় লাগাতেন এবং তৃপ্তি হাসতো। প্রথম সন্তান। কি উত্তেজনা, কি আয়োজনের মধ্যেই না ওকে আনা হয়েছিল। একদিন তৃপ্তিকে কেন্দ্র করে ঘুরছিলেন তিনি। হঠাৎ তৃপ্তির কক্ষ বদল হল, তারপর তারা দুজন পাপড়িকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে লাগলেন। সেই ইব্রাহিম ডাক্তার, উলের জুতো, ছোট রেলিং দেওয়া বিছানাটা, মামার দেওয়া প্রথম ভাত, ক মানে কলস, খ মানে খড়ম, রংয়ের বাক্স, হারমোনিয়াম, বাসন-মাজার মেয়েলোকটিকে দিয়ে দেওয়া ছোট ছোট পুরোনো ফ্রক, প্রমীলা দিদিমণি, রুমালের হেম সেলাই, লজ্জা, লকেট থাকা চেন, কাশ্মীরের সোয়েটার, দিল্লীর স্যান্ডেল, সায়েন্স না আর্টস, নতুন নতুন ডিজাইন, ম্যাথমেটিক্সে অনার্স? — এত রাতে কার সঙ্গে আসবি? — আমরাও জানি ও ভাল ছেলে। কিন্তু অন্য লোকের কিছু একটা ফস করে বলে দিতে কতক্ষণ? না না হয় না, হয় না—। মাসে দেড়শ টাকায় হস্টেলে চালাতে পারবি? বোকা! না খেয়ে শুকিয়ে মরতে যাচ্ছিস।

এই পাপড়িকে স্বামী ঠাস্ ঠাস্ করে চড়াবে? সে একবার বাড়িতে এসে স্বামীর কাছে ফেরার নাম করবে না এবং অনেক দিন থেকে যাবে? আস্তে আস্তে ও নীরব হয়ে যাবে? ওর চোখের কোলে কালি পড়বে? আর সঞ্জয় ওদিকে—

কারা এই স্নিগ্ধা, আলেয়া, হরুমাও, রুনঝুন গৌরীরা? কেমন তারা?

চৌধুরি পাশ ফিরলেন। ফিরে এসব বাজে চিন্তা করবেন না বলে ঠিক করলেন। ঘুম আনার জন্য একটা বড় ক্যালেণ্ডারের একটা পৃষ্ঠার কথা ভাবতে হয়— এক থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি সংখ্যার চেহারা পরিষ্কার ভাবে মনে করতে হয়; ওটা সতের, ওই তো একে আট আঠার, ওটা একে—নয়, ওটা নয়— উনি — ঘুম? — উনিশ, দুয়ে শূন্য —।

সেই যে মেয়েটি! কি নাম ছিল যেন ওর? এখন ঠিক মনে নেই। আশ্চর্য! ওর নামটাও এখন মনে নেই। হরুমাও হতে পারে। সম্ভবত হরুমাও। জ্যোতির্ময়দের ক্ষেতে ঠিকায় সরষে-আখের চাষ করত একজন লোক, বাবার বড় স্নেহের বিশ্বাসী মানুষ। সেই লোকের মেয়ে হরুমাও। এম-ই পরীক্ষা দিতে টাউনে এসেছে। জ্যোতির্ময়দের বাড়িতে রেখে ওর বাবা গাঁয়ে চলে গেল, এই সময় ক্ষেত ছেড়ে থাকা সম্ভব নয়। বেড়ায় তাঁতশালের সরঞ্জাম ঝোলানো, রাতে সাইকেল রাখার ছোট ঘরটার এক কোণে একটা পুরোনো টেবিলে খবর কাগজ পেতে তার ওপর ছেঁড়াখোড়া কতকগুলি বই-খাতা পেড়ে হরুমাও পরীক্ষার জন্য পড়া শুরু করল। কিন্তু সে যত পড়ে তার চাইতে বেশি জ্যোতির্ময়ের মায়ের সঙ্গে হাতে হাতে ঘরের

কাজ করে। একবার জ্যোতির্ময় জল চাইতে মা'র বদলে হরুমাও জল নিয়ে এল, গ্লাস দেওয়ার সময় তার দু-চারটে আঙুল জ্যোতির্ময়ের আঙুলে লাগল। জল কতটা খেল জ্যোতির্ময় তার হিসাব রাখল না। গ্লাসটা নেওয়ার সময় তার আঙুলগুলো একটা বিজ্ঞাপন পড়ল আর ফিরিয়ে দেওয়ার সময় একটা দরখাস্ত সাবমিট করল।

পরীক্ষার দু'দিন আগে হরুমাও ঘরের কাজ বাদ দিয়ে কেবল পড়া নিয়ে থাকল, জ্যোতির্ময় তখন এম-ই ক্লাশের পড়ার চাইতে অনেক বেশি পড়া জানে: ঐকিক, ত্রৈরাশিক, সুদ কষা, পৌনঃপুনিক। সে হরুমাওর টেবিলের কাছে বসে গেল। একবার হরুমাও নির্বাক, জ্যোতির্ময়ের চোখের দিকে তাকানোর ক্ষমতা হারাল, খানিকক্ষণ একটা ব্যাকরণের বই দিয়ে জ্যোতির্ময়ের থেকে গালটা আড়াল করে রাখল এবং শেষ-মেষ অনেক কষ্টে গলায় স্বর ফুটিয়ে বলল, পরীক্ষাটা শেষ হোক, তারপর। জ্যোতির্ময় অবশ্য পরীক্ষাকে বড় বেশি গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না।

পরীক্ষার পরে হরুমাও দশদিন মত ছিল। সেই সময়টাতে সে মোটা মার্কিন কাপড়ের টুকরোতে বড় করে একটা গোলাপ ফুল তুলল, ফুলের নিচের তিনটে পাতা জ্যোতির্ময়ের কাছে আঁকিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু তার একটা পাতা তুলতেই বাবা এসে পড়ল। শেষের দিন রাতে ঘুমের ক্ষতি করে কোন মতে ধার কটা সেলাই করে রুমালটা শেষ করল।

কি প্রকাণ্ড রুমাল! কি বিরাট ফুল! কি সেলাই! অনেক বছর পর চৌধুরি যেন রুমালটা ভাসা ভাসা দেখতে পেলেন। হরুমাওর শরীরটার কথা মনে পড়ল। ষোল বছর বয়সে বাপের সঙ্গে সরষে-আখের মধ্যে থেকে বাপের পিছন পিছন হেঁটে এম-ই পরীক্ষা দিতে আসা মেয়ে; শরীরে শুধু মাংস আর মাংস, টান টান, মজবুত। গপ্‌স মার্কিন কাপড়ের রুমালের মত। কোথায় যে গেল সেই মেয়েটা, এখন কোথায়ই বা থাকে।— বছর দশেক পরে একবার ওর বাবার সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের দেখা হয়েছিল। মেয়েটার নাকি ভাগ্য খারাপ। স্বামীটি নাকি চাষবাস ছেড়ে দিয়েছে; ভাং খায় ব্যান্ডপার্টিতে পেঁপা বাজিয়ে বিয়ে কীর্তনে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়।

কোথায় সেই হরুমাও, আর কোথায় সেই ...; তার আসল নামটা বরং উহ্য থাক। এই নামগুলির মধ্যেই কোন একটা নাম তাকে দেওয়া যেতে পারে। আলেয়া? হবে। চলতে পারে। এই সব নামের একটু এদিক সেদিক হলে কোন ক্ষতি নেই। কেবল একটা নাম নীলিমা— এই নামটা নিয়ে চৌধুরি কোন রকম হেলাফেলা করতে চান না। এই নামটা কোন তালিকায় দেখার ইচ্ছে নেই তার। বাকি নামগুলোর ক্ষেত্রে তার কোন বাছবিচার নেই। অবশ্য একটা কথা ঠিক, তার স্ত্রীর নাম তৃপ্তি।

আলেয়া। হরুমাওর আঙুলের প্রসঙ্গে মনে পড়ল। আলেয়ার সঙ্গে জ্যোতির্ময় রেলের একই কম্পার্টমেন্টে চড়ে এক দীর্ঘযাত্রা করেছিল। হিমালয়ের কোলে কোন

এক পার্বত্য নিবাসে ইতিহাসবিদ্‌দের বাৎসরিক অধিবেশন হয়েছিল। দুটি বিভিন্ন জায়গার প্রতিনিধি হিসাবে এসে জ্যোতির্ময় আর আলেয়া একই কামরায় সঙ্গী হল, পরিচিত হল আর দুজনে একই অধিবেশনের প্রতিনিধি জেনে উল্লসিত হয়েছিল। যাত্রার দ্বিতীয় দিন সকাল আটটায় কেবিনের অন্য দুজন যাত্রী নেমে গিয়েছিল। অন্য দুজন যাত্রী উঠেছিল বিকেল পাঁচটায়। ঘটনাক্রমে অন্য প্রতিনিধিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই কেবিনটাতে ঢুকে পড়ার জন্য জ্যোতির্ময়ের বেশ ভাল লাগতে শুরু করেছিল। ভারত থেকে ফিরে যাওয়া ডাচদের লেখা "ভারতের ইতিহাস" আর ভারতীয়র লেখা "ভারতে ডাচদের ইতিহাস" এর পার্থক্য, ভারতের মণিমুক্তোর অযথা দুর্গতি দেখে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কি মহান অনুকম্পার উদ্রেক হয়েছিল— এ সব কথা আলোচনা করে করে জ্যোতির্ময় বিরক্ত বোধ করছিল। হঠাৎ আলেয়ার নরম আঙুল সমেত হাতটা দেখেই বোধ করি জ্যোতির্ময়ের হস্তরেখা বিদ্যা আলোচনার আগ্রহ জন্মেছিল। বেলা দুটো নাগাদ নিজের ডান হাতের কিছু রেখা এক্সপ্লেন করার পর সে প্রথমে না ছুঁয়ে আলেয়ার বাঁ হাতের রেখাগুলো এবং পরে আলতো করে ধরে দেখা শুরু করল। একসময় আলেয়ার মুখ গম্ভীর হল। সে জ্যোতির্ময়ের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সামনের বার্থটায় সরে গিয়ে বসল। জ্যোতির্ময় তাকে কিছু মনে করেছে কি না জাতীয় অনেক প্রশ্ন করল। ঘণ্টা আধেক পর আলেয়া তার লালাভ থমথমে মুখটা জ্যোতির্ময়ের দিকে ঘুরিয়ে বরফ শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বেশি সময় ধৈর্য ধরে থাকাটা আপনাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, তাই না?'

'আপনাদের মানে?' নিরুদ্বেগ, নির্বিকার গলায় জ্যোতির্ময় জিগ্যেস করল, 'আমি এবং আর কে? অন্যের কথা জানি না, কিন্তু আমার কথা আপনি তো জানতেই পারলেন, ধৈর্য-টৈর্য আমার নেই। আর ধৈর্য ধরার কথা আমি ভাবিওনি। আপনার ভাল লাগেনি যখন, তখন আমি আর ওরকম কাজ করব না। আমি বুঝলাম আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, অতএব তার জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। ব্যস। সোজা কথা।' কথাগুলো বলে জ্যোতির্ময় উঠে দাঁড়াল। দরজায় ঠেস দিয়ে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল। পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই সে নেমে গেল। বুফে কারে বসে অনেকগুলো স্টেশন পার করে দিয়ে সে যখন নিজের কেবিনে ফিরল তখন সেখানে আরও দুজন লোক উঠেছে।

পরদিন সকালে আলেয়া অনেক আগে উঠে মুখচোখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে জানালার সামনে বসে ছিল। জ্যোতির্ময় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ কিন্তু সতেজ হাসি দিয়ে বলল, 'গুড মর্নিং'।

'গুড মর্নিং'। মুখে সিগারেট গুঁজে নিয়ে জ্যোতির্ময় উত্তর দিল। সে বালিশের নিচে দেশলাইটা খুঁজছিল।

'রাতে ঘুম হয়েছে?' একই সুরে আলেয়া জিগ্যেস করল।

'হয়েছে।'

'স্বপ্নে কারও হাত-টাত দেখছিলেন না কি?' ল্যাম্পের পল্‌তে বাড়িয়ে আলো বাড়ানোর মত হাসিটাকে আরেকটু প্রশস্ত করে দিল আলেয়া।

হাতের জ্বলন্ত কাঠিটা সিগারেট থেকে সরিয়ে নিয়ে জ্যোতির্ময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক পলক আলেয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'নাহ্ হাত দেখার স্বপ্ন দেখিনি। সমস্ত রাত ধরে স্বপ্নে দেখলাম যে আমার হাতটা এত নোংরা হয়েছে যে সারারাত শুধু ধুয়েই গেলাম আর ধুয়েই গেলাম, তবু পরিষ্কার হল না।'

একটা স্টেশনে অন্য দুজন একটু ক্ষণের জন্য নামার পর আলেয়া জ্যোতির্ময়কে বলল, 'আপনি দেখছি আমি যতটা ভেবেছি তার থেকেও রাগী, অভিমানী আর অহঙ্কারী।'

জ্যোতির্ময় উত্তর দিল, 'অন্য কথা বলুন। কাল আপনি যেন কি বলছিলেন? হ্যাঁ, ময়ূর সিংহাসন এবং কোহিনূরের কথা।'

ট্রেনের বাকি সময়টা এবং পার্বত্য নিবাসের দিনগুলিতে জ্যোতির্ময়ের মাঝে মাঝে আলেয়াকে নিঃসঙ্গ পাখির মত মনে হয়েছে। একদিন সে জিগ্যেস করল, 'কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?'

'এইদিকে মাইল তিনেক দূরে একটা শিবমন্দির আছে, সেটাই দেখতে গিয়েছিলাম— মানে সাইট সিয়িং বলতে পারেন।'

আলেয়া ক্ষীণ আহত কণ্ঠে বলেছিল, 'আমি আপনাকে খুঁজে মরছি। আমিও যেতে পারতাম জায়গাটা দেখতে।'

আরেকদিন সে বলল, 'ফেরার জন্য রেলের রিজার্ভেশন করে আসি চলুন। এত দূরের জার্নি আমি কিন্তু আলাদা কম্পার্টমেন্টে যেতে পারব না।'

সেই ঐতিহাসিক অধিবেশনের পর আলেয়া জ্যোতির্ময়কে দীর্ঘ দীর্ঘ চিঠি দিয়েছে। সোমনাথ মন্দিরের হারানো দুয়ার, কুতুব মিনারের দাম্ভিক উচ্চতা, বাহাদুর শাহের শেষ অবস্থা-- এসব কথার ফাঁকে ফাঁকে আলেয়া নিজের কথাও লিখেছিল—একটা কথা আপনি জানবেন চৌধুরি— হাতি কাদায় পড়লে বড় বিপদে পড়ে!

চৌধুরি ভাবতে থাকলেন, একটি হস্তিনী ধীরে ধীরে কাদায় ডুবে যাচ্ছে,— যাচ্ছে —যাচ্ছে; এক সময় সে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু কাদার ভেতর দিয়ে সে আবার আগের মত হয়েই বেরিয়ে এল— বড় মেঘ একটাকে পার করে বেরিয়ে আসা জ্যোৎস্নার চাঁদের মত; এবং বেরিয়েই বাবার হাত দিয়ে চিঠি পাঠাল— আমার প্রথমা কন্যা আলেয়া মামনির—

ঘুম আসো আসো হচ্ছিল না কি? হতে পারে? ঘুম আসার ঠিক আগে এরকম

ভাব হয়। চৌধুরির বেশ ভাল লাগল। একটুও নড়াচড়া না করে তিনি পড়ে থাকলেন।

কিন্তু হাতিটা ডুবে গেল! ময়ূর সিংহাসন থেকে নেমে গহ্বরে ঢুকে সেই দুঃসাহসী অভিযান; সেই দুঃসাহস জ্যোতির্ময়ের মনে এল কোত্থেকে? কে দিল সেই দুঃসাহস? একটা স্বপ্নিল ভাবের মধ্যে দিয়ে চৌধুরি পিছিয়ে যেতে থাকলেন। কে দিল এই দুঃসাহস?

সেই মেয়েটা? চৌধুরির আঠার বছর বয়সে দেখা হওয়া সেই মেয়েটির নাম হতে পারে চন্দ্রা। স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে সহ নিখিলদা পুরী যাবে, ঘরে থাকবে বুড়িমা আর এক রাঁধুনি। অতএব নিখিলদার বাড়িতে বুড়িকে দেখার জন্য জ্যোতির্ময়ের কয়েকদিন থাকতে হবে। চন্দ্রা আসার কথা ছিল, কিন্তু তাকে ডেকে পাঠিয়ে যে চিঠি দেওয়া হয়েছিল তার কোন উত্তর আসেনি। নিখিলদারা চলে গেল, জ্যোতির্ময় একরাত বুড়ির কাছে রইল, পরদিন চন্দ্রা এসে হাজির হল। বুড়ি জ্যোতির্ময়কে বলল, তুইও থেকে যা। জ্যোতির্ময় থেকে গেল। চন্দ্রা বড় যত্নে তার পরিচর্যা করল। দু'রাত পার হওয়ার পর চার বছরের বড় চন্দ্রা জানায়, রাতে জানলার কাছে কি যেন একটা খুটখাট করছিল, ওর বড় ভয় লেগেছে। সেইদিন মাঝরাতে চন্দ্রা জ্যোতির্ময়ের বিছানার কাছে এসে কোনমতে শোনা যায় এমন স্বরে জানাল, আমি তোমার সঙ্গে শোব; ওখানে আমার ভয় করে।

নিখিলদারা কিছু দিন পরে কিন্তু এলো না, এলো একত্রিশ দিন পরে। সুবিধা পেয়ে কাশীতেও গিয়েছিল। সেই একত্রিশ দিনের মধ্যে বিশটা রাত — প্রায় ত্রিশ বছর পর আজও চৌধুরি লেপের নিচে একবার যেন কেঁপে উঠলেন। রাঁধুনিটি সকাল আটটায় দুধ দোয়ায় আর নটার সময় এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে চন্দ্রা হাজির জ্যোতির্ময়ের কাছে। জ্যোতির্ময় মাথা তুলতে পারে না, চন্দ্রা ওর মোটা মোটা ঠোঁট দুটোতে হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বলে, তুমি মেয়ে হলেই ভাল হত।

সেই হরুমাওর সময় জ্যোতির্ময়ের একবার কাঁপ ধরেছিল মাত্র, কিন্তু এই চন্দ্রা তাকে একবারে চুষে নিংড়ে ক্লান্ত রুক্ষ করে তুলল। সেই শোষণে তার সূক্ষ্ম কোমল, রঙিন অনুভূতির তন্ত্রীগুলো নিষ্পিষ্ট, নষ্ট হয়ে গেল।

পরে একটা সময়ে নীলিমার দেখা না পেলে কি জানি জ্যোতির্ময় হয়তো একটা দুঃসাহসী জানোয়ার হয়ে যেতো।

চন্দ্রার মাংসল শরীরের সর্বগ্রাসী অন্ধকারে হারিয়ে গেল বই দিয়ে বুক ঢেকে স্কুলে যাওয়া মেয়ে স্নিগ্ধা। চৌধুরি একান্ত মনে, মনের সব শক্তি জড়ো করে চেহারাটা মনে করার চেষ্টা করলেন। কোমল, বড় কোমল। স্পর্শের কোমলতা নয়, দেখার কোমলতা। এমন নিবিড়ভাবে কিছু উপলব্ধি করতে পারাটা ঘুমিয়ে পড়ার মতই। চৌধুরি তন্ময় হয়ে পড়ে রইলেন।

বইয়ের কভারের মধ্যে চিঠি আসে — তুমি আজকাল কেমন হয়ে গেছ — আজকাল নিশ্চয় তুমি আমাকে ঘেন্না কর — কাল প্রসেসনে যাওয়ার সময় তুমি একবারও আমার দিকে তাকাওনি। আমি তো কোন দোষ করিনি —

কি অদ্ভুত সেই প্রেম। চিঠিগুলোকে, ধরা যাতে না পড়ে তেমন করে রাখাটাই, সেই প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র সমস্যা।

রত্না কাকিমা কথাটা কি একটু টের পেয়েছে? কদিন ধরে স্নিগ্ধা জ্যোতির্ময়ের চিন্তা ছেড়ে সকাল সন্ধ্যার কয়েক ঘন্টা রত্না কাকিমার সঙ্গে লেগে রইল; অতুলকে অঙ্ক শেখায়, কাঁঠাল বিচির খোসা ছাড়ায়। রত্না কাকিমার ব্লাউজে টিপবোতাম লাগায়। বিভিন্ন কৌশলে জানতে চেষ্টা করে কাকিমা কি জেনেছে, কতটুকু জেনেছে। সাতদিন পর কবিতাকুঞ্জ নামে এক বইয়ের কভারের মধ্যে চিঠি দিয়ে জ্যোতির্ময়কে জানিয়ে দেয়, কথাটা মিথ্যে। কিন্তু আমার বড় ভয় করে। বরং আমরা চিঠি লেখা কমিয়ে দিই, তুমি সোমবারে, আমি শনিবারে। হবে তো? —

চিঠি আর দেখা সাক্ষাৎ— প্রেমের সম্বল বলতে ওটুকুই। সন্ধ্যায় স্নিগ্ধা বাতি জ্বালিয়ে ঘরে ঘরে একটা করে রেখে যায়; জানালাগুলো বন্ধ করে। সামনের দিকের একটা ঘরের জানালা একেবারে শেষে বন্ধ করে। পর্দা সরিয়ে রাখা দড়িটাতে মুখ লাগিয়ে সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। এক সময় দূরের পুলটাও জ্যোতির্ময়ের সাথে সাথে আর দেখা যায় না। ঘুমিয়ে না পড়া অবধি সেদিনের সেই সময়টুকু তার বড় ভাল লাগে। মনে হয় মাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে আদর করে।

চৌধুরির মনটা এক গভীর প্রশান্তি আর সিগ্ধ আনন্দে ভরে গেল। সেই সব প্রেম ভোরের শিশিরের মত ঝরে। সূর্য উঠলে অদৃশ্য হয়। হবেই।

এইবার পাশ ফেরার সময় চৌধুরির মাথাটা একটু ধরে উঠল। তার চৌকিদারের ওপর রাগ হল। বিকট চিৎকারে বেটা লোকের ঘুম ভাঙায় আর দেখ গিয়ে এখন হয়তো কোন গুদামের বারান্দায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। সব চিন্তা দূর করে দিলাম, আর এই— ঘুমোনোর চেষ্টা করছি— বলে চৌধুরি চোখ বুজলেন।

অনেক দিন পর এক পুজোমণ্ডপে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে স্বামী পুত্র কন্যা সহ স্নিগ্ধার দেখা হয়েছিল। খোলামেলা হাসি আর সস্নেহ কণ্ঠে বলেছিল, ভাল আছেন তো? ছেলেমেয়েরা? বৌদিকে তো আমি দেখিই নি। আপনারা না কি এখানে চলে এসেছেন? নতুন বাড়ি করেছেন?

সেদিন জ্যোতির্ময়ের মনে একটা অস্বস্তি দানা বেঁধেছিল। কারণ ওর ভয় ছিল কখনও কোথাও দেখা হলে বোধহয় স্নিগ্ধা জিগ্যেস করবে, চন্দ্রারা কেমন আছে? জিগ্যেস করেনি দেখে খারাপ লেগেছিল।

আর কে বাকি থাকল? সাকিনা, রুনঝুন। না, এতকাল পরে চৌধুরির ঘুম নষ্ট

করার মত কোন ক্ষমতা ওদের নেই। ওরা রেস্তোরাঁর বারান্দার পানের দোকানে কি? বাসের দুজনের সিটে বসিয়ে নেওয়া তৃতীয় যাত্রী? ওদের ধরলে জ্যোতির্ময়ের তালিকায় না থাকা আরও অনেককে ধরতে হয়। সেই জেল থেকে জামিনে ছাড়িয়ে আনা দেশকর্মী কৃষ্ণা, বম্বের হোটেল মালিকের মেয়ে শকুন্তলা, রিচার্ডসন হাসপাতালের ডাক্তার পামেলা। এরা খারাপ আবহাওয়ার দরুন, যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য, ফোর্স ল্যান্ডিং করার এক একটা যুদ্ধকালীন এয়ারপোর্ট। এরা সম্ভবত এখন উঠে গেছে। না হয়তো সেখানে এখন মনুষ্য বসতি হয়েছে, নয়তো এগ্রিকালচারাল ফার্ম।

মোটের ওপর সেই সময় কোন এক অর্বাচীন ধোপা কারও রং-ওঠা কাপড়, কারও দামি সাদা কাপড়, কারো বা হোলিখেলা কাপড় সব একসঙ্গে ভাটিতে দিয়েছিল। কেউ কষ্ট পেল, কারও যথা লাভ ঘটল। কেউবা খুশি হল।

তবে হ্যাঁ। সেই গৌরী। ডেড ডার্টি ক্রিচার। ওকে আলাদা করেই ধরতে হবে। ঐ এক মেয়ে যে কাঁদলে চোখের থেকে কাজল বয়। মাটির প্রদীপে সে কলাপাতায় কাজল বানায় আর সেই কাজলে চোখের জলকে করে কালো। ঘরের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া শুকপাখিকে পোষা পাখি বলে উঠোনে চরে বেড়ানো কাকের সামনে বাহাদুরি করে। অদ্ভুত।

একদিন বলল, 'ও দাদা, আমি একটা গল্প লিখেছি, আপনি একটু দেখে দেবেন?'

'গল্প? আমি গল্পের কি বুঝি?' জ্যোতির্ময় প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিতেই চেয়েছিল।

'ইস্ জানেন না আবার! আপনি সব জানেন। মানে কি জানেন, আমি একটা মেয়ের মনের দুঃখের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি। খুব বাস্তবভিত্তিক করেছি। কিন্তু প্রথম লিখছি কি না, সেজন্য কেমন হয়েছে বুঝতে পারছি না। যেখানে যেখানে ঠিক হয়নি আপনাকে কিন্তু ঠিক করে দিতে হবে।'

তারপর একদিন সে জানাল, 'মা দেখি সেদিন থেকে কেবল আপনার কথাই বলে। সর্বদাই আপনার কথা একবার না একবার হবেই। আপনি দেখছি একদিনেই বাড়ির সবাইকে একেবারে আপন করে নিয়েছেন।' কথা কটা বলেই ও খিক্ খিক্ করে হাসতে শুরু করল।

এ কথায় কারো খিক্ খিক্ করে হাসার কি আছে? কথাটা ভেবে জ্যোতির্ময় মুচকি হেসেছিল। তারপর একদিন গৌরী কিছু একটা বলবে বলে জ্যোতির্ময়ের সামনে অল্পক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ওকে বড় চিন্তিত দেখাল। লজ্জায় ও মুখ তুলতে পারছিল না। কেবল ওর চোখ দুটো অস্থির ভাবে নড়ছিল।

'হয়েছে কি বল দেখি' বলে জ্যোতির্ময় ওকে সাহস দেওয়াতে ও মুখ নিচু করে জানাল, 'কথাটা সবাই জেনে গেছে।'

'কোন কথা?'

'এই আমাদের কথা। আমি বাইরে বেরোতে পারছি না।'

বিবস্ত্রা নারীর ছবির মত কাগজের গাদার মধ্যে রাখা গৌরীর গল্পটা সেদিন জ্যোতির্ময় ফেরৎ দিয়েছিল। এতদিন লজ্জায় ও এ কাজটা করতে পারেনি। সেই দিন গৌরীর গাল কাজলে কালো হয়েছিল।

সে সময়টায় নীলিমা জ্যোতির্ময়ের খুব কাছাকাছি ছিল। একদিন প্রশান্ত হাসিতে মুখ ভরিয়ে জিগ্যেস করল, 'আমাকে এ সব কথা বলনি কেন?'

'কি সব কথা?'

'এই যে বাইরে মানুষজন বলাবলি করছে।'

জীবনে প্রথম জ্যোতির্ময় অনুতপ্ত, উত্তেজিত এবং কাতর বোধ করেছিল। সে পরে টের পেয়েছিল, শহরের খবর যারা রাখে তারা সকলেই ইতিমধ্যে জেনেছিল গৌরীর সঙ্গে তার একটা আজীবনের সম্পর্ক হতে যাচ্ছে। এর মধ্যে একদল কাক চেঁচামেচি শুরু করল। কি বীভৎস চিৎকার।

নীলিমা আরও একদিন বলেছিল, 'আঃ, আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না। আমি সব বুঝি। বাদ দাও, বাদ দাও। চিয়ার আপ। একসময় সব চুপ হয়ে যাবে।'

একসময় সব স্তব্ধ হয়ে গেল। একদিন তৃপ্তি এল। সব তারা, চাঁদ, পাপীতারা ধূমকেতুর মত অদৃশ্য হয়ে গেল। নীল আকাশটা এক শূন্যময় ব্যাকগ্রাউণ্ড হয়ে থেকে গেল।

ঠিকই তো আছে। চৌধুরি মুহূর্তে তৃপ্তি আসার দিন থেকে আজ পর্যন্ত গোটা সময়টা একবার মনের ওপর দিয়ে পার করে নিলেন। কোথায়? কিছুই তো হয়নি। ঠিকই তো আছে। শান্ত, নিস্তরঙ্গ গতিতে তৃপ্তিকে কেন্দ্র করে ঘুরছিলেন তিনি। কখনও তো কোন উত্তাপের অভাব ঘটেনি। কোনদিন তো কোন রকম শীতলতা অনুভব করেননি। তারপরও তো তিনি আর তৃপ্তি পাপড়িকে কেন্দ্র করেই ঘুরে চলেছেন।

না, না, এ এমন কোন বড় কথা নয়। সঞ্জয়ের সঙ্গে থাকা তালিকাটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। সেখানে তো নীলিমার নামই নেই। অবশ্য হতে পারে হয়তো নীলিমা তালিকায় থাকার মানুষ নয়।

এ এমন কোন বড় কথা নয়। এ সব হয়, হয়েই থাকে।

কিন্তু তৃপ্তিকে বোঝানো যায় কি করে। সেই ইব্রাহিম ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন থেকে আরম্ভ করে সঞ্জয়ের স্মারণী পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে থাকা পাপড়ির জীবন, তার সঙ্গে এই তালিকা। নাহ্, ভদ্রমহিলা কি করে বসবেন ঠিক নেই।

চৌধুরি চোখ মেলে একবার জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে আলোটা দেখলেন এবং আবার পাশ ফিরে চোখ বুজলেন।

একটু পরে ওই বিছানায় থাকা তৃপ্তির গলার আওয়াজ পেলেন। তার মনে হল এ জেগে থাকা মানুষের গলায় আওয়াজ। তিনি ডাক দিলেন, 'তুমি জেগে আছো নাকি?'

'হ্যাঁ। আমার ঘুম কখন ভেঙেছে!' তৃপ্তি জাগ্রত আবস্থায় সাড়া দিল। চৌধুরি সন্ত্রস্ত হলেন।

'ক-খ-ন?'

'হুঁ। ওই রাতের পাহারাদারটা এমন জোরে চেঁচিয়েছিল। ওর চিৎকারেই আমার ঘুম ভেঙে গেল।'

চৌধুরি এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে বললেন, 'অনেকক্ষণ হল বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'ঘুমোনোর চেষ্টা করলে না কেন?'

'ঘুম এলে তো!' তৃপ্তি সামান্য বিরক্ত হয়ে জবাব দিল।

'কেন? চিঠিটার কথা ভাবছিলে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

একটু বাদে চৌধুরি ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলেন, 'ভেবে কি ঠিক করলে?'

তৃপ্তি সহজ কণ্ঠে জবাব দিল, 'আমি ভেবে দেখলাম, এ এমন কোন বড় কথা নয়, বুঝলেন?'

তৃপ্তি চুপ করে থাকল। চৌধুরির মনটা হাল্কা বোধ হল। আচম্বিতে যেন একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর তৃপ্তি বলল, 'এসব হয়। হয়েই থাকে। তবে — সময়ে সব ঠিক হয়ে যায়।'

তৃপ্তি আর কোন কথা বলল না। পাশ ফিরে লেপ দিয়ে কান দুটো ঢেকে নিল। ধীরে ধীরে চৌধুরির মনটা ভার হয়ে এল। সেই 'হুঁশিয়ার' চিৎকারটার পর থেকে ভেবে ভেবে তৃপ্তি এখানে পৌঁছল? আচম্বিতেই যেন একটা সমস্যার সৃষ্টি হল।

কৃতজ্ঞতা

আগে যখন শুনতাম, অমুকের ক্যান্সার হয়েছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠতাম, কি! সত্যি? যার মৃত্যুতে আমি কষ্ট পাব সেরকম কারো বিষয়ে এই খবরটা পেলে কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে থাকতাম। তারপর জিভ দিয়ে মুখে একটা ইস্ ইস্ শব্দ তুলে পাশের লোককে জিগ্যেস করতাম, কি হবে এখন? সে হয়তো বলে, কি আর হবে? যা হওয়ার তা তো হবেই। ইট ইজ সিম্প্লি এ ম্যাটার অব টাইম নাও।

আমার নিজের ক্ষেত্রে কিন্তু চমকে ওঠার সুযোগ পেলাম না। খবরটা আমার কাছে এলো আমার মনের সুদীর্ঘ পিছল রাস্তা ধরে একটা রোগগ্রস্ত দুর্বল কাঁকড়ার চালে। ওর এগিয়ে আসাটা আমি ধরতে পারিনি, কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম। কখনও মনে হয়েছে ও যেন একটা ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটাটার ওপর বসেছিল, আমি নিরন্তর কাঁটাটার দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম, সময় ঠিকই বয়ে চলেছিল। কিন্তু আমি কাঁটার গতিটা ধরতে পারিনি। তারপর একদিন যেন ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে ধীর স্থির শান্ত ভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলাম, নাও ইট ইজ সিম্প্লি এ ম্যাটার অব টাইম।

টাইম। সময়। কত সময়? তার মানে আর কত দিন? সে সম্পর্কে চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছি বলে ভাবলেও আমি ভিতরে ভিতরে অনেক খবরই হিসেব করে দেখেছি। কোন একজন মানুষের ক্যান্সার হয়েছে বলে জানার পর কত দিন সে বেঁচেছিল এ কথাটা আমি যথেষ্ট আয়াস সহকারে জানার চেষ্টা করছি। কাউকেই আমি জিজ্ঞেস করি না, কেবল মনে মনে জনে জনে প্রত্যেকের হিসেব নিই। হৃষিকেশবাবু রোগের কথাটা জানার পরও দু'বছর বেঁচে ছিলেন। একে তো রোগ, তায় আবার বাথরুমে পিছলে পড়ে ডান পাঁজরে বিশ্রী রকম ব্যথা পেলেন। ওই ঘটনাটা না ঘটলে, কি জানি হয়তো আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতেন। দেশপাণ্ডের মা-ও তো বছর তিনেক ছিলেন? না কি তিন বছরের কম? হিসেব করলেই বেরিয়ে যাবে। ও প্রথমবার যখন খবর পেয়ে বাড়ি যায় তখন গরমের ছুটিই

হয়নি। ও ছুটি নিয়ে গিয়েছিল। সেই ছুটি গরমের ছুটির সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল। পরের গরমের ছুটিতে ও বাড়ি থেকে এসে খবর দিয়েছিল মা ভাল আছে। এক বছর। তারপরের বছরও ও মাকে ভালই দেখে এসেছিল। এই হল দু'বছর। তারপর সেবার সে টেলিগ্রাম পেয়ে বাড়ি গেল। ঠিক ডিগ্রি ক্লাসের টেস্টের পর। মানে জানুয়ারি মাসে। তার মানে আড়াই বছর হল। ঠিক তিন বছর পুরো হল না? না না, এটা কোন কথা নয়। না হয় তিন বছরই ধরলাম। মাস কয়েকের এদিক সেদিক। এভাবেই আমি অনেক লোকের হিসেব বার করেছি। গণেশ উকিল, ফাইন্যান্সার সুকুমার চৌধুরি, কৃষ্ণানন্দের শ্বশুর, আগের রেভিনিউ মিনিস্টার পরমানন্দ মজুমদার, আমার তেনার দূরসম্পর্কীয় মামা, অনেক মানুষের হিসেব করে দেখেছি, রোগ সনাক্ত হওয়ার পরেও গড়ে প্রায় দু'বছর বেঁচে থেকেছে। কয়েকজনের কথা আলাদা। তাদের আমি হিসাবে ধরিনি, তাদের কয়েকজনের মৃত্যুর পরেই একমাত্র ডাক্তার বুঝতে পেরেছিল; রোগটা কি। আর বাকিদের ক্ষেত্রে রোগটা যখন ধরা পড়েছে তখন নাকি লাস্ট স্টেজ! অতএব কয়েক দিন, আর ওষুধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখলে বড় বেশি হলে কয়েক মাস। আমার নাকি সেই স্টেজ এখনও আসেনি। সেইজন্য অনেক লোকের গড় নিয়ে আমি ঠিক করেছিলাম, দুটি বছর আমি চারপাশটা দেখতে পাব।

আমার বন্ধুবান্ধবরা আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বলেছিল তাতে মনে হয় পৃথিবীর সব মানুষ মরে শেষ হয়ে গেলেও আমি বেঁচে থাকব। ও রকম কথা না বলে ওদের উপায় ছিল না। ওদের অবস্থাটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আমাকে সান্ত্বনা দেওয়া সবার কাছে কি পরিমাণ অস্বস্তিকর, সেটা আমি ভাল করেই বুঝেছিলাম। আমারই উল্টে ওদের সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছে করেছিল।

আমি চালাক লোক। এই দুটো বছর ঘড়ির কাঁটা আগে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুদ্ধিও বেড়েছে। আমার শরীরের ভিতরের রোগটার আচরণ আমার চারপাশের লোকজনের আচরণে প্রতিফলিত হচ্ছে। আমি প্রতিফলন চিনতে বুঝতে একটুও ভুল করি না। না না, চিন্তার কোন কারণ নেই, তবু নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য একবার থরোলি একজামিন করিয়ে নিতে আপত্তি কোথায়? বলে বন্ধুরা আমাকে শালীর ছেলের সঙ্গে দূরপাল্লার একটি ট্রেনে চড়িয়ে দিয়েছে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ধার পেতে এমনিই পঞ্চাশ ল্যাঠা, কিন্তু এবার ফর্ম ফিল আপ করার বাইরে আমার আর কিছুই করতে হল না। দু'তিন দিনের ভেতর নগদ টাকা আমার হাতে এল। আমাদের অ্যাসোশিয়েসন জরুরি সভা ডেকে পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য তোলা টাকা থেকে দু হাজার টাকা আমাকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। জীবনে কখনও দেখার সম্ভাবনা না থাকা এক বিরাট মহানগরে আমরা উপস্থিত হলাম। এবার ঘটনার প্রকৃত অর্থ আমি বেশ ভালই বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি বিহ্বল হয়ে

পড়িনি। আমি প্র্যাকটিকাল লোক। বিচলিত হলে কোন লাভ হবে না বুঝেছিলাম। আসলে এই মহানগরীর হাসপাতালের গেটে থাকা বিরাট সাইনবোর্ডটাতে কুৎসিত অক্ষরগুলো পড়ামাত্র সাধারণ লোকের পক্ষে আর্তনাদ করে ওঠার যুক্তি আছে। কিন্তু আমি অক্ষরগুলো থেকে চোখ সরিয়ে নিচ দিয়ে হড়কে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। আমার সেই নির্বিকার ভাব আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছি এবং অবিচলিত চিত্তে প্র্যাকটিক্যাল লোকের মত আচরণ করেছি। রোগটা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আমি উদ্‌ভ্রান্তের মত ছোটাছুটি করিনি। ঘরে ফিরে এসেছি, বিনি পয়সার আর কম দামের ওষুধ খেয়ে যাচ্ছি, শরীরটা একটু ভাল থাকলে চাকরি করার চেষ্টা করছি। অযথা টাকা পয়সা নষ্ট করছি না। জমানো পয়সা কটা যাবে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কটা যাবে, শ্বশুরের পয়সা খরচ করব, দাদার কাছ থেকে ধার করব আর শেষে আমার শ্রাদ্ধের জন্য পাঁঠার মাংস কিনতে আমার স্ত্রী টাকা ধার করবে; আমি তা হতে দেব না। পরে সময় পেলে আমি আমার স্ত্রী মায়াকে বলে যাব, এই সব শ্রাদ্ধ-পিণ্ড-ভোজ টোজের ব্যবস্থা না করতে। আমি মারা গেলে আমার কোন বন্ধু এখানে দৈ-রসগোল্লা, মাংস-ভাত খেতে আসবে না। এই পরিবারে আমিই একমাত্র উপার্জনশীল লোক। আমার মৃত্যুর পর এই বাড়িতে আর একটি পয়সাও কোত্থেকে আসবে আমি জানি না। তার কোন উপায়ও আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এজন্য আমি যতটা সম্ভব কম খরচের কারণ হতে পারি তার চেষ্টা করছি। সমস্ত ব্যাপারটাই যখন সিম্প্‌লি এ ম্যাটার অব টাইম, তখন অবিবেচক বা বিহ্বল হলে চলে না।

বিহ্বল আমি হই না। ক্লাশ ফোরে পড়া আমার বড় ছেলেটি বলে, ''বাবা, ক্লাশ সিক্সের পরে আমি আর এ স্কুলে পড়ব না। আমার সঙ্গের সব ছেলেরা মিশনারি স্কুলে পড়ে। আমিও ক্লাশ সেভেনে মিশনারি স্কুলে ভর্তি হব।' ক্লাশ সেভেনে উঠতে ওর দু'বছরের চাইতেও বেশি সময় বাকি। আমি জানি ও যখন ক্লাশ সেভেনে, তখন আমি হয়তো ধরাধামে আর নেই। কিন্তু ওর কথা শুনে আমি একফোঁটা চোখের জলও পড়তে দিইনি। আমার দ্বিতীয় সন্তান দু'বছরের রুমী আমাকে যখন বলে, 'বাবা আমি বড় হলে শাড়ি পরব না, মেখলা চাদর পরব', তখন তার কথা শুনে নিয়ম মত তাকে আমার ব্যাকুল হয়ে বুকে জড়িয়ে নেওয়ার কথা, আমি কেবল 'আচ্ছা' বলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিই। আমি বিহ্বল হলে চলবে না। যে কটা দিন থাকি, সে কটা দিন এই বাড়িটার শান্তি নির্ভর করছে আমার ওপর। আমি সুস্থ রসিক লোকের মত মন খুলে হাসলে মায়ার ভাল লাগে। আমি সেটা বুঝি। গলার স্বরটাই আমাকে একটু ঝামেলায় ফেলে, তবুও মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দিয়ে আমি কৌতূহলপূর্ণ দীর্ঘ কাহিনীর অবতারণা করি। একটা আরামকেদারায় বসি, হাতে উপলক্ষ্য হিসেবে খবর কাগজ, নয়তো ছবিওয়ালা

একটা ম্যাগাজিন থাকে, ও বিছানায় পায়ের দিকের মশারিটা একটু সরিয়ে পা তুলে বসে। অল্প দূরে রুবুল আর রুমা গভীর ঘুমে মগ্ন থাকে — এই অবস্থায় আমি গল্প শুরু করি।

এই গল্প বলতে আরম্ভ করলেই আমার বড় অসুবিধা হয়। আমার চল্লিশ বছরের এই জীবনের সঙ্গে যে পৃথিবীর সম্পর্ক তৈরি হল সেই পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণা যেন এক একটা জীবন্ত কাহিনী হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। শিক্ষককে বিদায় দেওয়ার দিন ছোট-বড় চেনা-অচেনা সব ছাত্র এসে যেমন জড়ো হয় তেমনই। বিদায়ী শিক্ষকের কাছে কি সুন্দরই না সেই ছাত্রদল, সহজ, সরল, বিচিত্র। কি বিচিত্র আমার এই পৃথিবীর বস্তুনিচয়। আমি এমনিতে আমার যত দিন আগেকার কথা মনে আছে বলে ভেবেছিলাম, মায়ার কাছে এভাবে বসে বুঝলাম, না আমার তার চেয়েও অনেক আগের কথা মনে আছে। মা'র কোলে উঠে একবার রাসলীলা দেখতে গিয়েছিলাম। বাবা মাকে বলেছিলেন, পারবে ওকে এতক্ষণ কোলে নিয়ে থাকতে? নামিয়ে দাও, একটু হাঁটুক। যদিও মা'র কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু পাছে আমি হারিয়ে যাই, ভয়ে মা আমাকে নামাননি। রাসলীলার মূর্তিদের বেশ কয়েকটার কথা আমার মনে আছে। এক জায়গায় শ্রীকৃষ্ণ পিচকিরি হাতে দাঁড়িয়ে আছে, কয়েকটি মেয়ে পালানোর ভঙ্গীতে স্থির হয়ে আছে, ওদের কিন্তু পালানোর কোন লক্ষণ নেই। কি সুন্দর ওদের গায়ের রং! কি সুন্দর ওদের কাপড়ের রং। সেই পালিয়ে না যাওয়া ভঙ্গী, আমি হারিয়ে যাব ভেবে মা'র সেই ভয় পাওয়া সুন্দর এক কাহিনীর মত। আরও কত জিনিস! গোপালদাদের একটা গ্রামোফোন মানে কলের গান ছিল; তাতে— 'কার অধরের হিঙুলে রাঙালে ঠোঁট-গাল ও রূপসী' গানটা বড় ঘন ঘন বাজতো। আমি চৌকাঠে দাঁড়িয়ে অধীর আগ্রহে গানটা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকতাম, সাউন্ড বক্স থেকে বার করে ফেলে দেওয়া পিনটার জন্য। গোপালদা যতই হিঙুলের গান শুনেছে আমার পুরনো পিনের সংখ্যা ততই বেড়েছে। এত আগ্রহে কেন যে জমিয়েছিলাম সেই অপ্রয়োজনীয় পিনগুলো! আজ গোপালদার সেই প্রিয় গানটির কথা মনে পড়লে আমার বুকে যেন সেই পিনগুলোর খোঁচা লাগে। কিন্তু সেই কথা মনে করে বলে যেতে পারার তৃপ্তির কাছে পিনের যন্ত্রণা কিছুই নয়।

আমি বলে চলিঃ আমাদের প্রতিবেশী মাসির বাড়িতে একটা ঢেঁকি ছিল, ঝুড়িতে ভেজানো চাল নিয়ে সেই ঢেঁকিতে পিঠের চাল গুঁড়ো করতে মা গিয়েছিলেন, আমার মনে আছে মা ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার সময় আমি ঢেঁকির গোড়ায় বসেছিলাম, এতে ঢেঁকিতে পাড় দিতে মা'র কষ্ট কম হচ্ছিল, কিন্তু গর্তের চালে ঠিক মত চাপ পড়ছিল না বলে মা মানা করছিলেন। আমার মনে আছে। অজস্র কথা মনে আছে। মনে আছে বলতে — কেন জানি না — মনে পড়ে

যাচ্ছে। অসংলগ্ন ঘটনা, অগ্রপশ্চাতহীন কথা। আমি চালাক লোক, সুতরাং এসব কথা মনে আসার কারণটা খুঁজতে গিয়ে মাঝে মাঝে মনে হয়, জীবনে আর নতুন কিছু ঘটার নেই তো, তাই পুরনো যা কিছু আছে তাদের নিয়ে নাড়াচাড়া করে দিন কাটানোই এখন আমার একমাত্র কাজ। না না, কথাটা ঠিক তা নয়— কথা হল— সেই মা'র কোলে চড়ে রাসলীলা দেখতে যাওয়া থেকে আজ পর্যন্ত— এ সময়টা আমার মতে একটি সুন্দর জীবন। এই জীবনটার যত বেশি কথা সম্ভব— আমার মায়াকে বলে যাওয়াটা দরকার। মায়া আমার জীবনে, আমার উনত্রিশ বছর বয়সে এসেছে। এগার বছর আমরা আমাদের নতুন কথার আসর জমিয়ে কাটাচ্ছি। কিন্তু আমি যখন মরব, তখন তো আর আমি এগার বছরের একটা লোক হিসাবে মরব না! চল্লিশ বছরের লোক হিসেবে মরব। সেই জন্যে এর আগের উনত্রিশটি বছরের গল্প করতে আমার বড় ইচ্ছে হয়। অন্তত মায়া আমার গোটা জীবনটার কথা জানুক। আরও একটা কথা, মায়া তো আমার পরেও অনেক দিন থাকবে। কত দিন? উনত্রিশ বছর? না না, তার চাইতেও অনেক বেশি। এই সুদীর্ঘ সময়ে মনে পড়বার মত আমার কথা মায়াকে যতটা পারি বেশি করে বলে যাওয়া দরকার।

এই সুদীর্ঘ সময়ে, ভাল কথা, মায়া কি করবে? এই কথাটা মনে পড়লেই বড় অস্থির হয়ে পড়ি। মায়ার শরীরের প্রতিটি অণু পরমাণু বোধ করি আমি চিনি। ওর মনের প্রতিটি অলি-গলি আমার মুখস্থের মত। ওর দেহ-মনের সেই মধুর উত্তাপটুকু; নির্জনতা—নিবিড়তার আগুনে প্রতিটি অণুতে পরমাণুতে জ্বেলে দেওয়া সেই উত্তাপ; সত্যি কি হবে সেই উত্তাপটুকুর? মৃত্যু তো হবে আমার, কিন্তু সেই উত্তাপের কি করে মৃত্যু হয়? আঃ। না না, অস্থিরতা-টস্থিরতার কথা নয়, এ তো উন্মাদ হয়ে যাওয়ার মত কথা। লুকিয়ে লাভ নেই, এ কথাটা মনে হলেই আমি ভিতরে ভিতরে পাগল হয়ে যাই। আর তখনই এক মহিলার কথা আমার মনে পড়ে যায়। আমার বয়স যখন বাইশ, তখন আমি সেই ভদ্রমহিলাকে দেখেছিলাম। তিনি তখন তরুণী গৃহবধু। কঠিন অসুখে তাঁর স্বামী বহুদিন থেকে বিছানায় পড়েছিলেন। ক্রমশ ম্রিয়মানা হচ্ছিলেন তিনি। একদিন স্বামীর শেষ অবস্থায় তাঁকে বলতে শুনলাম, কপালে যা আছে তা হবে, আমি এখন যে কোন অবস্থার জন্যই তৈরি হয়ে আছি। এর কদিন পর তাঁর স্বামী মারা গিয়েছিলেন। বহু বছর বাদে ভদ্রমহিলাকে একটি নেমন্তন্ন বাড়িতে দেখেছিলাম। জনা দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে কি একটা রগড় করে প্রাণ খুলে হাসছেন। বুঝলাম, বেশ আছেন।

কি কারণে যে সেই মহিলার কথা আমার বার বার মনে পড়ে যায় জানি না। মায়ার সাথে সেই মহিলার কণামাত্র মিল নেই। থাকলে হয়তো আমি একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম। একটু সাহস পেতাম। মায়া সততই ভিন্ন প্রকৃতির। মানুষ যে মানুষের সঙ্গে এতটা একাত্ম হয়ে যেতে পারে, মানুষ যে মানুষকে দেহ-মন উজাড়

করে দিয়ে এমন ভালবাসতে পারে, মায়ার দেখা না পেলে হয়তো সে কথা আমি বিশ্বাস করতাম না; আর সেজন্যই আমি চলে যাওয়ার পর মায়ার অবস্থা ভাবলে আমি পাগল হয়ে যাই। মায়াও যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। ও ঠিক আমার মত সব বোঝে। আমি যতই নির্বিকার হয়ে মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়ে আমার ছোটবেলার কথা বলি না কেন, ও যেন ঠিক বুঝতে পারে কেন আমি এসব গল্প শুরু করেছি। হঠাৎ যদি কোন এক অসতর্ক দুর্বল মুহূর্তে আমি বলে ফেলি, পৃথিবীটা বড় সুন্দর, না মায়া? তাহলে তৎক্ষণাৎ একটা ছুতো বের করে ও অন্য ঘরে চলে যায়। কিছু সময় পরে ও যখন ফিরে আসে, তখন ওর চোখ জোড়া দেখেই আমি বুঝতে পারি, ও ঘরে ও কি করছিল।

এ রকম সময় আমি অনেক দূরের, আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। কষ্ট করে ছবি-টবি এঁকে মায়াকে বোঝাবার চেষ্টা করি, চাঁদে মানুষ কিসে যায়। বোঝাই, এ রকম একটা মাল্টিস্টেজ রকেট থাকে, আর তার সামনে একটা ছোট ঘরে তিনটি প্রাণী থাকে, রকেটটা সেই ছোট্ট ঘরটিকে একটি কক্ষপথে ঠেলে দেয়।

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে মায়া কোন প্রয়োজন নেই এমনি ভাবে প্রশ্ন করে, 'রকেটটার কি হয়?'

'কি আর হবে? এই বিশাল আকাশের বুকে লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে ঘুরে একদিন নিঃশেষ হয়ে যায়।' আমি যে সিরিয়াস কথাবার্তা ছেড়ে দিয়ে এই রকেট-ফকেটের কথা নিয়ে আবোল তাবোল বকি, মায়া সেটাও বুঝতে পারে। বড়ই চালাক। ও অন্য দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। আমিও চুপ হয়ে যাই। যতই আবোল তাবোল বকি না কেন, আমি কিন্তু ভেতরে ভেতরে তৎক্ষণাৎ নিজের চিন্তায় ফিরে আসি। নিতান্ত ব্যক্তিগত কথায়। প্র্যাকটিকাল কথায়। মানুষ মহাকাশ জয় করল, চন্দ্র জয় করল, কিন্তু এই পৃথিবীর একটা রোগকে জয় করতে পারল না। আমি বিরক্ত বোধ করি। আমার রাগ হয়। রাগটা প্রকাশ করি কার কাছে? আমি তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করি। মায়ার সামনে কোন ধরণের উত্তেজনা প্রকাশ করার সাহস আমার নেই। এমন কি এই যে আমি একটু সময় ব্যক্তিগত কথা ভেবে চুপ করে থাকলাম, তাতেও মায়া শঙ্কিত এবং সন্দিগ্ধ হয়, বলে, 'কি ভাবছেন?' ভাবে, আমি হয়তো আমার রোগটার সম্বন্ধে সিরিয়াস কিছু ভাবছি।

একমাত্র আমাকে নিয়েই বেঁচে থাকা এই মহিলাকে আমি কিভাবেই বা সুখী করে যেতে পারি। অসহ্য। এই মহিলার এমন গভীরভাবে, এমন নিবিড়ভাবে আমার সঙ্গে জড়িত হয়ে না থাকার লক্ষণ যদি দু-একটা আমার চোখে পড়তো, তাহলে আমার হয়তো একটু ভাল লাগতো। ভাবামাত্রই একটা যন্ত্রণাও অনুভব করি, সত্যিই কি সেটা ভাল লাগতো আমার? এ সময় আমার বড় কষ্ট হয়। কখনও কখনও

অধৈর্য হয়ে ভাবি, চাই না — চাই না এই উপরি কটা দিন বেঁচে থাকতে, এখনই এই মুহূর্তেই আমি শেষ হয়ে যাই। মরে যাই। মৃত্যুটাকে কয়েকটা দিন এগিয়ে আনি। নিজেই শেষ করি নিজেকে। কিন্তু তা করার শক্তি আমার নেই। ইচ্ছেও নেই। কারণটা বড়ই ব্যক্তিগত। শুনতে কথাটা বড় স্বার্থপরের মত মনে হবে। পৃথিবীটা বড় সুন্দর। রুবুল- রুমী ওরা কত সুন্দর। যতদিন বেশি সম্ভব ওদের পাশে থাকতে বড় মন চায়। আরও একটা কথা। বড় আশা, যত বেশি দিন পারি বেঁচে থাকি, কি জানি যদি এর মধ্যে হঠাৎ এই রোগটার একটা ওষুধ বেরিয়ে যায়। আমার মৃত্যুর পরদিনই হয়তো ওষুধটা বেরিয়ে যেতে পারে। তাহলে? একটা দিন বেশি বাঁচলেও অনেক লাভ আমার। আর—কি জানি, যদি আমাকে পরীক্ষা করা ডাক্তারের কথাগুলি ভুল প্রমাণিত হয়! হতেও তো পারে! কত রোগের ক্ষেত্রে ভুল ডায়াগনোসিস হয়। মাঝে মধ্যে দেখি শরীরটা বেশ তরতাজা লাগে। সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের মত আমি এক পাক বেড়িয়ে আসি।

না না। আশার ফাঁদে বন্দী থাকতে কোন ক্ষতি নেই। আমিও যথেষ্ট আশাবাদী। ডাক্তারি বই আর ম্যাগাজিন পড়তে শুরু করেছি। এই রোগটাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর কোন্ ল্যাবরেটরিতে কি ঘটছে তার সমস্ত খবর আমি জানার চেষ্টা করি। এক সময় আমার মনে হয়েছিল, দীর্ঘদিন রোগশয্যায় থাকা, আমার মা'র চিকিৎসা করাতে গিয়ে আমি যত ওষুধের নাম জেনেছিলাম, তাতে করে একটা ফার্মেসি খোলা যেতে পারতো। এখন আমার মনে হয়, আমার রোগটা সম্পর্কে অনেক ডাক্তারের চেয়ে আমি বেশি তথ্য সংগ্রহ করেছি। আমি বেশি জানি।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি নিষ্প্রভ হয়ে আসছি। শরীরের ভিতরে আমার মনটা অসহ্য যন্ত্রণায় ফুটিফাটা হচ্ছে। কিন্তু মায়া, রুবুল আর রুমীর সামনে আমি ধীর, স্থির, শান্ত হয়ে থাকছি। পৃথিবীর সব সৌন্দর্য, জ্ঞান-গরিমা যেন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। আমার শরীর আমার সঙ্গে বিশ্বাস হন্তারকের মত আচরণ করছে। না, তা নয়, আসল কথাটা হচ্ছে, মায়া, রুবুল এবং রুমীর সঙ্গে আমিই বিশ্বাসঘাতকতা করছি। এজন্য আমি ওদের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকানোর সাহস হারিয়ে ফেলেছি। নিজেকে এমন অপরাধী মনে হয় যে বিছানার পাশে ওদের দেখলেই চিৎকার করে ওদের সরে যেতে বলতে ইচ্ছে হয়।

ওদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছি। মায়াকে আমার উনত্রিশটি বছরের কাহিনী বলা শেষ হল না। তবু বন্ধ করেছি। নির্বিকার ভাবে মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা টেনে কথা বলার শক্তি এখন আমার আর নেই। আমার মুখের একটা বাক্যেই এখন আমার চোখে ধুঁয়ো দেখায়। বাক্যটা শেষ করে আমি চোখে সর্ষে ফুল দেখি। স্বরটাও যেন কেমনতরো হয়ে গেছে। আমি স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলার চেষ্টা করি, কিন্তু মায়া নাকি কান্নার মত শোনে।

এইজন্যেই কথা বলা ছেড়েছি। মনটাকে অযুত কাহিনীর রাজপথ করেছি। আসছে, দাঁড়াচ্ছে চলে যাচ্ছে। সেই যে কবেকার আমাদের বাড়ির গলিটাতে পড়ে থাকা শুকনো পাতার রাশি! সেই যে কামরাঙা গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে বেড়ানো টিপসি পাখিগুলো! অম্বিকা পিসির পেতলের কলসীটা, 'ঝর্ণা' নামে আমার লেখা প্রথম কবিতাটা।

আচ্ছা, পৃথিবীটা কি আমার পরেও এ রকমই থাকবে? আমরা একটা হোস্টেলে প্রবল প্রতাপে বাস করতাম। হোস্টেলটা ছেড়ে আসার সময় আমাদের বিশ্বাস ছিল, একান্ত মনোবাঞ্ছাও ছিল, হোস্টেলটা আর আগের মত কখনই হবে না। একদম ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যাবে। বেড়ালের বাচ্চার খাঁচার মত অবস্থা হবে। অনেক দিন পর একদিন বাজারে হোস্টেলের রান্নার ঠাকুরের সঙ্গে দেখা। জিগ্যেস করলাম, কি ঠাকুর, হোস্টেল কেমন চলছে? বুড়ো ঠাকুর জানাল, ঠিকই চলছে বাবু। বলা বাহুল্য, বুড়োর উত্তরটা ভাল লাগেনি। কেমন করে ঠিক চলে? কখনই ঠিক চলা উচিত নয়।

আমি চলে যাওয়ার পর পৃথিবীটা কি ঠিকঠাকই চলবে? বড়ই অসহ্য। আমাকে যদি কেউ বলতো, তুমি আসার পর পৃথিবীটা অনেক পাল্টে গেছে খুব খুশি হতাম।

ধীরে ধীরে মনের রাজপথে কাহিনীর গতি শ্লথ হয়ে এল। চোখ বন্ধ করে চিন্তা করতে গিয়ে মনে হল যেন এককালে মিলিটারির মত প্যারেড করে আসার পরিবর্তে একটা দুটো গল্প জলের নিচে সাঁতরানোর মত ধীরে ধীরে ওঠানামা করছে। শব্দের উৎসগুলোও যেন আমার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। — 'মাছ রাখবেন মাছ?' আমার মাথার দিকের ত্রিশ হাত দূরের রাস্তা দিয়ে সেই পরিচিত গলা, যে কোন দিন আমার সঙ্গে মাছের দাম নিয়ে চেঁচামেচি করেনি, তার স্বরটা আমার মনে হচ্ছে যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। সবাই ওর কাছ থেকে মাছ রাখছে কি? মাছ! স্বাদটা যেন কিছুটা ভুলে গেছি মনে হয়। জানলা দিয়ে ছুড়ে দেওয়া খবরের কাগজটা ঐ যে মেঝেতে পড়ল। পড়ার শব্দটা আমি ভাল করে শুনতে পেলাম না। কি যে ছাপা হচ্ছে কাগজে! আগামী তিন বছরে অমুকটা সম্পূর্ণ হবে— আসছে বছর— আগামী দু বছরের ভেতর—!

এভাবে থাকতে থাকতেই একদিন যেন দূর থেকে আসা মায়ার গলা শুনতে পেলাম। পাশের ঘরটায় কয়েকজন ভদ্রমহিলা এসেছেন। আজকাল ও ঘরটায় লোক থাকেই। তাঁদের মায়া বলছে, কপালে যা আছে তা হবে। এখন আমি যে কোন রকম অবস্থার জন্যই তৈরি হয়ে আছি।

মুহূর্তে আমার সমস্ত শরীরে গোপালদার কলের গানের অসংখ্য পুরনো পিনগুলো বিদ্যুৎবেগে ছুটোছুটি শুরু করল। আমি ভীষণ জোরে চেঁচিয়ে উঠতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পরমুহূর্তেই আমি শান্ত হয়ে গেলাম। একেবারেই শান্ত। নিরুদ্বেগ।

বাকি দিনগুলো আমাকে পরিপূর্ণ শান্ত এবং স্থির হয়ে থাকতে হবে। একেকবার ভাবি, ওভাবে থাকতে বড় কষ্ট হবে, হলেও উপায় নেই। থাকতেই হবে।

মায়া এই পৃথিবীটাকে ভালবেসেছে। পৃথিবীর প্রতি ওর ভালবাসা গড়ে ওঠার জন্য আমি এই পৃথিবীর কাছে কৃতজ্ঞ। এই কৃতজ্ঞতাটুকু জানাতে পারার জন্যও আমি পৃথিবীর কাছে কৃতজ্ঞ।

এক তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার ভেতর আমি অনুভব করলাম, তিনটি প্রাণী সমেত একটি ছোট ঘর, একটা নতুন কক্ষে স্থাপিত হয়ে, আমি এই বিশাল মহাকাশে ক্রমে লক্ষ্যের বাইরে চলে যাচ্ছি।

গ্রহণ

এরা সম্ভবত আমাকে বোকা ভাবে। যদি ভেবে থাকে তো ভুল করে। ওদের বয়সে আমি, ওরা এখন যতটা চালাক, তার চেয়ে বেশি চালাক ছিলাম। এই যে একদিন গীতা এসে আমাকে বলল, 'বাবা, এই যে সুবোধদা— আমি যে আপনাকে বলেছিলাম— আমার বন্ধু সুরভিদের—' ইত্যাদি ইত্যাদি, আর আমি যে হেসে হেসে সুবোধকে সম্ভাষণ করলাম, তাতে মনে মনে গীতা ভাবল বাবাটা সরল, ভ্যাবলা, বোকা লোক, পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা বাকি ছিল, করিয়ে দিলাম, ল্যাঠা চুকল; বাবা আর এসব নিয়ে মাথা ঘামাবে না। কিন্তু আসলে আমি এতটা বোকা নই। আমি চালাক লোক। আমি ঠিক বুঝেছি, এই যে বাড়িতে সুবোধ এল, তার মানে একটা আপদ এল। ব্যাপারটা গোলমেলে। মেয়ের বান্ধবীর দাদা হিসাবে এসে বাবাকে শান্ত, নিরীহ, পৃথিবীর কোন ব্যাপারেই না থাকার ভঙ্গীতে প্রণাম জানানো— এই সব অতি পুরনো কাহিনী। আমাদের সময় এমন কি এসব কাহিনী নিয়ে গল্পও লেখা হয়েছে, একটা নয়, দুটো নয়, অজস্র। পরের দিকে তো এমন হয়েছিল যে আরম্ভ করে কোন্ প্যারাগ্রাফে এধরণের একটি তরুণের আবির্ভাব হবে তার অপেক্ষায় থাকতাম; আর সেই যুবকটির আবির্ভাবের পর গল্পটা শেষে কি দাঁড়াবে অনুমান করতে পারতাম। গল্পটা শেষ অবধি পড়তাম, কারণ আমার অনুমানটা মেলে কি মেলে না সেটা দেখার জন্য। বান্ধবীর দাদা, বন্ধুর বোন, পড়তে আসা ছাত্রী, পড়াতে আসা গরীব, ছেঁড়া পাঞ্জাবী পরা অথচ মহাগুণধর যুবক টিউটর— এসব আমার কাছে ঢেঁকিশাকের মত; কেউ কষ্ট করে ক্ষেত করে না; যেখানে সেখানে গজায়, পালং-বাবরি-চুকা-ধনে শাকের সঙ্গে কখনও কখনও রান্নাঘরেও প্রবেশ করে, খেতে খারাপ লাগে না, লাগলেও খারাপ লাগে বলার সাহস নেই, বললেই সকলে খ্যাক খ্যাক করে আসবে।

অথচ আমি যে সব বুঝি এটা এমন কি ওরা সন্দেহ পর্যন্ত করে না। 'বাবা, এই যে গরম কোটটা আমি যেটা অর্ডার দিয়েছিলাম', ঠিক সেই সুরে গীতা 'এই যে

সুবোধদা' কথাটা নিঃসংশয়ে নির্ভয়ে বলে ফেলল। গরম কোট কিংবা সুবোধ সম্পর্কে যেন আমার কিছু বলার নেই। অবশ্য এটা ঠিক যে গীতা যদি পিছনটা জেব্রার ছালের মত ডোরাকাটা আর সামনেটায় চিতাবাঘের ছালের মত চাক চাক, বোতামগুলোতে পরীদের ছবিওলা একটা কোটও এনে হাজির করে তবু আমি শুধু বলতাম, 'ভালই হয়েছে। কাপড়ের ডিজাইনে কি আছে, উত্তাপটাই আসল কথা। ওম আছে না নেই কাপড়টার? আছে? তাহলে ঠিকই আছে। তবে একটা কথা, ভাল করে রাখিস, আর মাঝে মাঝে রোদে দিয়ে ব্রাশ করবি। কোন ভাবে যদি পোকায় কাটে তো সর্বনাশ। ইয়ে করবি, পকেটে— ভেতরে পকেট আছে না, নেই দেখি — এই তো আছে— হ্যাঁ এর ভেতরে কটা ন্যাপথলিন ফেলে রাখিস।' এর থেকে বেশি কিছু বলতাম না।

এদের আমি বেশি কথা বলি না। 'বাবা বুড়োমানুষ। বাবার টেস্টের সঙ্গে আমাদের টেস্ট' ইত্যাদি বলে ওঘরে ওরা গজর গজর করবে; কথাগুলো আমি শুনতে না পেলেও আমার আত্মাটা শুনবে; আমি ফেলনা হব, ছোট হব, এমন একটা অবস্থায় পড়ার সুযোগ আমি ওদের দেব না।

সুবোধের ব্যাপারেও আমি কিছু বলিনি। গীতা পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর সে আমাদের সময়কার গল্পের নায়কের মত শান্ত, নিরীহ এবং পৃথিবীর সব ব্যাপারে উদাসীন ভঙ্গীতে প্রণাম করল। আমার দুটো হাত জুড়ে নমস্কাব সম্পূর্ণ করার প্রয়োজন নেই, আমি বয়স্ক লোক, গুরুজন, অসময়ে খারাপ স্বাস্থ্যের দরুণ অবসর নেওয়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, আমি ডান হাতটা কপাল অবধি তুললাম এবং নামানোর সময়ে চশমাটা চোখ থেকে খুলে আনলাম। অভ্যাসবশত বুকের ওপর জামার কাপড়ে চশমাটাকে ঘষলাম, তারপর আবার চশমাটা পরে দেখি গীতা আমার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর বোধ হয় মুহূর্তের জন্য হলেও, অমূলক হলেও একটু আশঙ্কা হচ্ছে— বাবাই বা প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে সুবোধদাকে কি ভাবে গ্রহণ করে। আমি চটপট সুবোধকে লক্ষ্য করলাম। চশমাটা মোছার সময়টুকুর নীরবতার জন্য অভ্যর্থনাটা শীতল হয়ে গেল কি? হয় না, হয় না, আমি এ রকম একটা ধারণার সৃষ্টি হতে দিতে পারি না। আমরা সুরুচিপূর্ণ সামাজিক আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত ভদ্রলোক। সুবোধের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অনেক দিন আগের বিস্মৃত পরিচয় বন্ধুর দেখা পাওয়ার কায়দায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আরে বোসো, বোসো বোসো। তোমার নাম তো আমি ওর মুখে সব সময়ই শুনি। তোমার তো অনেক আগেই আসা উচিত ছিল।' বলে আমি হাসলাম। সুবোধ বা গীতার বদলে আমি থাকলে আমার হাসিটাকে উদার বলেই বর্ণনা করতাম।

দেহ-মন দুটোকেই সঙ্কুচিত করে সুবোধ বসল। আমার কথার উত্তরে সে একটা লাজুক বিষণ্ণ হাসি দিল। তারপর একটু সময় কারো মুখে কোন কথা নেই। হঠাৎ

আমার মনে হল, এটা ভাল কথা নয়। আমি গৃহস্থ, আমারই কথাবার্তা বলে অতিথির জড়তা ভেঙে দেওয়া উচিত।

'আচ্ছা তাহলে', আমি শুরু করলাম, 'তুমি ভিক্টোরিয়া কলেজের — তুই ভিক্টোরিয়া কলেজেরই তো বলেছিলি, গীতা? হুঁ। তা কেমন? আজকাল কলেজের খবর-টবর কি? — হবেই তো, ভাল না হবে কেন! আসল কথা হচ্ছে বেসিক ফাউন্ডেশানটা। ফাউন্ডেশানটা ভাল হলে পরেও সব কিছু ভালই চলে। মাঝে মাঝে দু-একটা ছোট-খাটো, উত্থান পতনের ঘটনা থাকবেই, কিন্তু মেজর ক্রাইসিস বলতে তেমন কিছু হয় না। — হ্যাঁ মানে, সেই লাইব্রেরির কাছে এপ্রিল ফুলের গাছটা — তোরা যাকে অন্য কি একটা নামে বলিস — কি যেন বলিস গীতা? — হ্যাঁ কৃষ্ণচূড়া — কৃষ্ণচূড়া গাছটা আছে না নেই? কেটে ফেলেছে? ছি ছি ছি, এটা ভাল করেনি। তোমরা দেখেছ, না দেখনি? — ইস, তাহলে তোমরা আর কি করে বুঝবে? কি প্রকাণ্ড গাছ! তোমার — গুঁড়িটা — ঐ পেতলের ফুলদানিটা থেকে — নাহ্ আরও বড়—ঐ যে ফুলগুলো পড়ে আছে—ও গীতা ঐ ফুলগুলো নিয়ে যাসতো, শুকিয়ে গিস্‌লো, আমি তখন ফেলে দেব বলে বের করেছিলাম, বের করে অন্য আরেকটি কাজে গিয়ে ভুলে গেলাম, ওখানেই পড়ে আছে। ওগুলো ফেলে দিয়ে নতুন কিছু ফুল ফুলদানিটায় রেখে দিসতো, না হয় এক কাজ কর, সদাসর্বদা ফুল সাজিয়ে রাখতে যাওয়াটা একটা আন্‌নেসেসারি বদারেশান-- ফুলদানিটাকেই নিয়ে যা, ভেতরের আলমারিটায় ঢুকিয়ে রাখ।

— হ্যাঁ। তোমার ঐ ফুলগুলো থেকে এই পর্যন্ত — এত মোটা ছিল গাছের গুঁড়িটা। আর গাছটার মাটির ওপর বেরিয়ে থাকা শিকড়গুলোই আমাদের কজনের কমনরুম, বুঝলে? একবার কি হল — প্রিয়তোষবাবু — তোমরা হয়তো তাঁর নামই শোননি, প্রিয়তোষবাবুর ছিল হিস্ট্রির ক্লাশ। ক্লাশে তিনি ভীষণ বকাঝকা করতেন বুঝেছ? — আমাদের কি মনে হল কে জানে — ঠিক করলাম — করব না ক্লাশ। এলাম, এসে বসলাম গাছের শেকড়ের ওপর। কয়েক মিনিট মাত্র গেছে, এমন সময় দেখি ওদিক থেকে প্রিন্সিপ্যাল ডব্‌সন্ সাহেব পিছনে দুটো হাত দিয়ে গুরুগম্ভীর চালে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে আসছেন। দেখামাত্রই বসার শেকড়গুলো আমাদের কাছে অজগর সাপের মত মনে হতে লাগল। চট করে সবাই উঠে গাছটার ওপিঠে চলে গেলাম। প্রকাণ্ড গাছ—আমাদের কেন আরও দশজনকে সচ্ছন্দে লুকিয়ে রাখতে পারে। আমরা ভাবলাম গাছটা আমাদের ভাল বাঁচিয়েছে। তারপর ইকনমিক্স ক্লাশে গিয়ে বসেছি, প্রফেসার রোল কল শেষ করেছেন। এমন সময়ে পিয়ন এসে প্রফেসারের হাতে একটা চিরকুট দিয়ে গেল। কাগজটায় আমাদের সবকজনের নাম--প্রিন্সিপ্যাল ডাকছেন। বুঝেছ ব্যাপারখানা? আমিও তো প্রিন্সিপ্যাল ছিলাম। ছাত্রদের চিনতে পারা তো দূরের কথা কলেজটায় ছাত্র সংখ্যা

কত জিগ্যেস করলে চট করে বলতে পারব কি হেড ক্লার্ককে ডাকব তার ঠিক নেই।'

তারপর আমি সুবোধকে প্রিয়তোষবাবুর একটা বর্ণনা দিলাম। কেমন গোঁফ কি রকম চোখ পাকাতেন আর কি জ্ঞান। প্রসঙ্গক্রমে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল লেভিনের ছাত্রদের গির্জায় নিয়ে যাওয়ার কথা এল, স্বদেশী আন্দোলনের সময় নিবারণবাবুর সাহেব প্রিন্সিপ্যালের নিচে চাকরি করবেন না বলে ইস্তফা দেওয়ার কথা এল আর এসব কথার ফাঁকে-ফোকরে কলেজের সেই দিনগুলোতে আমার ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কথা উঁকিঝুঁকি মারতে থাকল। আমার দুটো ধুতি ছিল, একটা বুধবার বিকেলে ধুতাম, একটা রোববার। আমার গাঁয়ের বাড়ির উঠোনের ছোট ছোট গোল গোল পোকায় খাওয়া পায়ের তালু কলেজ খোলা থাকাকালীন সেরে যেতো, আবার ছুটিতে বাড়ি এলে পোকায় খেতো। কথাগুলো বলতে আমার খুব ইচ্ছে হল।

'বুঝলে' আরম্ভ করতে গিয়ে গীতার চোখে চোখ পড়তেই আমি থেমে গেলাম। শুকনো ফুলের গোছাটা নিয়ে গীতা বেরিয়ে গিয়েছিল, আমি নিবারণবাবুর কথা বলার সময় ঘরে এসে একবার এদিক ওদিক ঘুরে গেছে, তারপর এই দ্বিতীয়বার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে।

সুবোধকে বলতে চাওয়া কথাটা আরম্ভ না করে আমি গীতার চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করলাম। আমি বিরক্তিকরভাবে বেশি কথা বলছি কি? হঠাৎ ঘড়ি দেখে বিরক্তিকর আলাপ শেষ করার চেষ্ট করা অথবা মানুষ তাড়ানোর আরেকটা বুদ্ধি আছে বলে আমি জানি। আমাকে দুর্বল ভেবে গীতা আবার সেটাই আমার ওপর প্রয়োগ করছে না তো? না না, আমি সেটা হতে দিচ্ছি না। কোথায়, আমি তো তেমন কোন দীর্ঘ বক্তৃতা ঝাড়িনি; কিন্তু গীতা দ্বিতীয়বার এলো— এদিক ওদিক দেখল— ঐ দ্যাখ ঘড়ি দেখছে; তাহলে ও কি পরে সুবোধকে বলে বসবে 'বাবাটা আজকাল বড় বোর করে।' ছি ছি ছি, তা কখনই হতে দেব না।

আমি ঝাটিতি বললাম, 'ইয়ে মানে গীতা, ওর জন্য চা-টা বানিয়েছ তো?'

'সব হয়ে গেছে, আমি চা ঢালব বলে বসে আছি।' গীতা জানায়।

'ও তাই নাকি?' আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'তা তুই বলিসনি কেন? আমি ভাবলাম তুই ভেতরে গিয়ে ব্যবস্থা করবি, এতক্ষণ ও একা একা বসে বোর ফিল করবে, তাই। যাও বাবা, তোমরা ঐ ঘরে যাও। ওখানে চা খেতে খেতে কথা বলতে পারবে। —আরে না না, আমার হবে'খন, আমি সারাদিন ধরেই চা খাই।' আমি বড় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম, দ্বিতীয়বার যাতে সুবোধের সঙ্গে কথায় মগ্ন হয়ে না পড়ি সেই উদ্দেশ্যে আমি ওকে একেবারে বিদায় করলাম, 'ইয়ে মানে, সময় সুবিধা পেলে চলে আসবে।'

'এ বাড়িকে তুমি তোমার নিজের বাড়ি বলেই ভাববে' জাতীয় কিছু বলা বোধ

হয় দরকার ছিল। কিন্তু প্রথম দিনই ও রকম কথা বলব কিনা ঠিক করতে না পেরে চুপ করে রইলাম।

গীতার পিছন পিছন সুবোধ বেরিয়ে গেল। আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। এখনকার সময়টা পেলাম; কিন্তু সুবোধের সঙ্গে কথা শুরু করেছিলাম কটার সময়? ছি ছি ছি, বোর হওয়াটা আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি। তরুণ বয়সে, উঁহু, তার চেয়েও আগে, এই শহরে স্থিতু হওয়ার দিন থেকে এখানকার অলস এবং বিরক্তিকর কথা বলে ধৈর্যচ্যুতি ঘটানোর উপক্রম করা প্রত্যেকটি বৃদ্ধের জীবনচরিত, কথা বলার ঢং, চালচলন, মুদ্রাদোষ আমাদের কয়েকজনের রসালো আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। আমরা যথেষ্ট চালাক ছিলাম। প্রতাপ মজুমদারের গলা হুবহু নকল করতে পারতো সদানন্দ। 'ঠিক আছে যাও, তোমরা কাজের লোক, ধরে রাখব না' বলার পর যে গিরীশ গোঁসাই দু-তিন ঘন্টার আগে কথা বন্ধ করে না সে কৌশলটা কমলাপতি আমাদের ওপর তামাশা করে প্রয়োগ করেছিল। আমার তো প্রায় প্রত্যেক দিনই বিপদ হচ্ছিল। আমি যে বাড়িটায় থাকতাম তার কয়েকঘর এদিকে ঘনকর্তার বাড়ি। বাড়ির সামনের বারান্দায় ইজিচেয়ার আর ঘন কর্তা,* এই দুটো আমরা সমার্থক মনে করতাম। কখনও জরুরি কাজে কোথাও যাওয়ার হলে আমি ভয়ে ভয়ে চেয়ারটার দিকে তাকাতাম, ভাগ্যক্রমে কখনও কর্তা চেয়ারে না থাকলে, মাথার তেল লেগে লেগে তৈরি হওয়া কালো গোল দাগটাকেই কর্তা ভেবে সন্ত্রস্ত হতাম, থমকে ভাল করে একবার ঠাহর করতাম, না কর্তা নয়, গেল দাগটাই বটে! তারপর তাড়াতাড়ি তার বাড়ির সীমানা পার হতাম। তার বাড়ির সামনের দিকে সুন্দর ফুলের দশটা ফুলগাছের একটা সার ছিল। গাছগুলো ঝাড়মতন, রাস্তা দিয়ে যারা যায় তারা একবার ঘন কর্তার চোখের আড়াল হয়, আরেকবার দৃশ্যমান হয়। প্রথম দুটো গাছের মাঝখানে লোকটা আসামাত্র ঘন কর্তা সোজা হয়ে বসতেন সূর্যের আলোর রকমফের অনুযায়ী কখনও দ্বিতীয়, কখনও তৃতীয়, কখনও বা চতুর্থ ফাঁকে তিনি মানুষটাকে সনাক্ত করেন এবং তারপর আহ্বান করেন। আমি প্রায়ই রাস্তার ওধার দিয়ে, যেন ওধারের বাড়িগুলোর বেড়ার গায়ে কোন ছবির প্রদর্শনী চলছে এবং তাই দেখতে দেখতে যাচ্ছি এমন ভাবে চটপট পা চালাতাম আর মনে মনে হিসাব করতাম— একটা ফাঁক গেল, বাঁচলাম— দুটো ফাঁক গেল— বাঁচলাম —তিনটে — 'এই যে, নীরেন না কি হে?'

'হ্যাঁ দাদু।'

'এদিকে শোনতো দেখি —'

---

* 'বুঢ়া' শব্দ অসমীয়াতে সম্মানার্থে বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাই 'বুড়ো'র পরিবর্তে 'কর্তা' ব্যবহার করা হল।

'দাদু আমি একটু বাজার যাচ্ছি, বাড়িতে একজন অতিথি এসেছেন—'

'আরে যেও'খন বাজারে। বাজারটা কি উঠে যাবে? এসো তো দেখি। তোমার আবার অতিথি এল কোত্থেকে?'

অতিথি বলে যারই নাম করব, কর্তা তাকে কিংবা তার বংশের কাউকে না কাউকে চিনবেনই। আর সেই লোকটিকে কেন্দ্র করে তিনি মানব জাতির ইতিহাস, আমাদের দেশের ভূগোল, এই লোকালয়ের ক্রমবিকাশ, মাধব মাস্টারের বাড়ির উত্থান, হরিহর কেরানির পতন— এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা শেষ করে যখন আমাকে সদরে এগিয়ে দিয়ে গেটটা ভাল করে বন্ধ হয়েছে কি না পরীক্ষা করেন, ততক্ষণে আর আমার বাজারে যাওয়ার আগ্রহ থাকে না; আর যখন গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা শেষ করেন এবং আমায় বিদায় দেন, তখন বোধ করি বাজার সত্যিই উঠে যায়। তীব্র বিরক্তিতে তখন আমার ঘরে ফিরে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

আর আমি সেই মানুষটা এখন লোকেদের কথা বলে বিব্রত করব? না না, করব না। আমি বুড়ো হয়েছি,। কিন্তু এখনও আমার প্রখর বুদ্ধি আছে। শুধু মানুষকে কথায় বিব্রত করা নয়, বৃদ্ধ বয়সে প্রত্যেকটি বিষয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উদার বিবেচনা শক্তির পরিচয় দেওয়ার ইচ্ছা এবং সুচিন্তিত কার্যসূচী আমার যৌবনেই ছিল। এমন কি আমি আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম, 'আমরা একটা কাজ করব, বুঝেছ। আমরা বুড়ো হলে এই বুড়ো-বুড়িদের মত টিপিক্যাল বুড়ো-বুড়ি হব না। এই যে দেখছ এই বুড়োদের সর্বদাই ছেলেমেয়েদের নিয়ে অশান্তি হয়, আমরা তেমন কোন অশান্তি হতে দোব না। অতুল গীতারা আমাদের অশান্তি দেওয়ার কোন সুযোগই পাবে না, বরং আমাদের সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের তরফ থেকে ওদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না! কোন দিন যদি মনে হয় ওরা আমাকে বোঝা বলে ভাবছে তাহলে হাতে টাকা পয়সা থাকলে দুজনে মিলে কোথাও চলে যাব, যদি টাকা পয়সা না থাকে তাহলে কিছু একটা করে দুজনে মরে থাকব।

আমার স্ত্রী আবার আমার ঠিক বিপরীত; একেবারেই বোকা। আমি কলেজে পড়াতাম বলে, আর সঙ্গের কোন দুষ্টু মেয়ে সম্ভবত শিখিয়ে দিয়ে থাকবে ও আমাকে বিয়ের পর 'স্যার' বলে সম্বোধন করেছিল। হাসতে হাসতে আমার পেটে খিল ধরার উপক্রম হয়েছিল। কথাটা মনে পড়লে আমার এখনও হাসি পায়।

আমি ওভাবে মরে থাকব বলাতে ও 'ছিঃ বলতে নেই' জাতীয় কিছু একটা বলেছিল।

আমি যেটুকু শুনতে পেয়েছিলাম তার সূত্র ধরে বললাম, 'বলতে নেই কেন? কেন বলব না? তুমি কি ভেবেছ আমরা ওদের চৌকিদারি করব এবং তারপর একদিন ওরা আমরা 'একলাই পারব, আমাদের চৌকিদারির দরকার নেই' বলে

আমাদের বিসর্জন দেবে আর মায়া এড়াতে পারি না বলে আমরা বিশ্বস্ত চৌকিদারের মত বারান্দায় বসে বসে জীবন কাটাব? না। ওটি হবে না। বরং আমরা গৃহস্থের মত থাকব, প্রয়োজনে ওরা এসে আমাদের সাহায্য চাইবে, পরামর্শ চাইবে, ওরা যখন নিজের মুখে বলবে "আমাদের চৌকিদার দরকার" তখন আমরা চৌকিদারি করব। 'ফুটবল খেলা দেখতে হবে না। পাটিগণিত খুলে বস, অঙ্ক কর—' 'সেদিন না জুতো কিনলি এর মধ্যেই আবার কিনতে হবে?' — 'দেখি গীতা মাথার এখনটা বড় কুট কুট করছে, এখান থেকে দুটো চুল তুলে দে তো—' এসব কাণ্ড আমার দ্বারা হবে না ওদের আমি ছেড়ে দেবো, ছেড়ে দিয়ে দেখব ওদের গতিবিধি। আমাদের গাঁয়ের পিসিদের বাড়িতে মনে নেই সেই ময়নাটার কথা? তার খাঁচার দরজা সর্বদাই খোলা থাকে, সকালে সে বাইরে বেরোত আর সন্ধ্যাবেলায় আপনা আপনিই খাঁচায় এসে ঢুকত। মনে পড়ে, সে কেমন পিসির কাঁধে উঠে পিসির মাথা খুঁটে দিত আর পিসির চোখ বুজে আসতো? এটা কেন হতে পেরেছিল জানো? জাত, ভাল জাতের পাখি বলে।

ওরা যদি আমাদের সন্তান হয়, তবে ওরা ভাল হতে বাধ্য। গীতা নিজে এসে আমাকে বলবে, 'ইস দেখেছ বাবার কত চুল পেকেছে! দাঁড়ান, আমি একটা একটা করে সব তুলে শেষ করব আজ।' ঘন্টা খানেক পরে আমি বলব, 'হয়েছে ছাড়। একভাবে মাথাটা কাত করে রেখে ঘাড় ব্যথা করছে।' ও বলবে, 'একটু দাঁড়ান, এই হয়ে গেল, আজ এদিকটা শেষ করে রাখি, কাল ওদিকটা করব।' প্রতিবাদ করা বৃথা জেনে আমি আবার চোখ বুজে পড়ে থাকব।

আমার মনে আছে এসব কথা বলার সময় এক পবিত্র অনির্বচনীয় আনন্দে আমার চোখ ছলছল করে উঠেছিল। একটু পরে চোখের কোণে জল জমেছিল। আমি হাত দিয়ে মুছে নিয়েছিলাম।

কিন্তু কথাগুলো শেষ করে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, বক্তৃতাটা আমার বোকা স্ত্রীর পক্ষে একটু বেশি কড়া হয়ে গেল। সে-কারণেই নিজেকে অভিভূত অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে আমি হাল্কা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলাম। বলেছিলাম, 'ছোটবেলায় বড়ই বিপদে পড়তাম বুঝেছ? নামঘরের* কাছে কদম গাছের নিচে গুলি খেলার জন্য জড়ো হওয়া ছেলেদের চিৎকার মনে যেন পাখার মত এসে জুড়ে যেত, মনটা উড়ু উড়ু করত, এদিকে পিতৃদেব বলতেন, পাকা চুল বাছ, পায়ের পাতাটা টিপে দে, আঙুল কটা মটকে দে। ভেবে দেখ কি রকম কষ্ট হয়। পরে জেনেছিলাম, সব বাবাই নাকি ছেলেমেয়েদের এসব কাজে লাগায়, কেউ কেউ আবার দশ পনের গাছা চুলের জন্য একটা করে পয়সা বরাদ্দ করত। না না,' এ

* হিন্দু বৈষ্ণব অসমীয়ার উপাসনার মন্দির।

বাজে কথা। আমার ছোটবেলার নিজের বিরক্তির কথা মনে আছে। ছেলেমেয়েদের এভাবে জ্বালাতন করা ঠিক নয়।

আসলে আমি করিও নি। স্ত্রীর সঙ্গে বসে একদিন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তা আমি আজও মেনে চলছি। আমার স্ত্রী মারা গেছেন, এখন মাঝে মাঝে আমার পায়ের গাঁটগুলো ব্যথা করে; কিন্তু আমি ছেলেমেয়েদের আমার পা টিপে দিতে কখনও বলিনি। অতুল বড় হয়েছে সে চাকরি করে; তাকে পা টিপতে বলার কোন প্রশ্নই আসে না; গীতাকে অবশ্য বলা যায়, কিন্তু আমি তাকেও বলি না। আমি মানুষের মন বুঝি। আমি বুদ্ধিমান।

কিন্তু আমার অসুবিধাও অনেক। স্ত্রীর মৃত্যুতে আমি ভীষণ আঘাত পেয়েছি। একজন হাবাগোবা মহিলা চলে যাওয়াতে মনে হল যেন পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীবিত প্রাণী আমার কাছ থেকে সরে গেছে। আর কেউ নেই। একেবারে নিঃসঙ্গ। কিছুদিন তো আমার কথা বলতেই ইচ্ছে করত না; বলতে চাইলেও স্বরাটা যেন গলার কাছে এসে আটকে যেত, বেরোত না।

আলটপকা হলেও আমার কানে এল। আমি অফিস আর বইয়ের মধ্যে ডুবে থেকে আমার স্ত্রীর চিকিৎসায় অবহেলা করেছি, না হলে না কি ভদ্রমহিলা মারা যেতেন না। কথাটা কদ্দূর সত্যি ভাবতে ভাবতেই আমার অনেক দিন গেল। পরের দিকে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ল, একদিন কলেজের গভর্নিং বডির কাছে অবসর চেয়ে দরখাস্ত করলাম, জোর করে দরখাস্তটা মঞ্জুরও করালাম।

বইপত্র পড়া আমি ছেড়ে দিলাম। ভাল লাগে না। ফলে আমার অনেক অসুবিধা হচ্ছে। একসময় স্ত্রীকে জানিয়েছিলাম, 'বুড়ো বয়সে সময়গুলো কেমন করে কাটাব, ভাবি দাঁড়াও। হ্যাঁ পেয়েছি, একটা ভাল উপায় ভেবে পেলাম। গীতাকে তো বিয়ে দিয়ে দেব। অতুলের জন্য কম পড়াশুনা করা, ধরে নাও এই ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়া লক্ষ্মীশ্রী যুক্ত একটি মেয়ে ঘরে আনব। তাকে আমি দুপুরবেলা পড়াব। দেখবে ন বছরের মধ্যে আমি তাকে ডক্টরেট বানিয়ে ছাড়ব।'

কিন্তু কিছুই হল না। আর হবেও না বোধ করি। 'বিয়ে করিয়ে পাঠানো'— লক্ষ্মীশ্রী যুক্ত মেয়ে আনা— এসব ঘটনা ঘটার আশা আর নেই। গীতা আর অতুলকে লক্ষ্য করেই আমি এটা উপলব্ধি করেছি। আমি বুঝি। সবই বুঝি। কিন্তু আমি যে বুঝি সেটা এরা বোঝে না। অথচ ওদের মূর্খামি দেখে আমারই খারাপ লাগে। এই তো গীতার কাছে সুবোধ আসে, গীতার সঙ্গে আসে তার বান্ধবী অনু। অনু নাকি ওর অতীব ভালবাসার দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বান্ধবী। ওরা চারজন যখন ওই ঘরটায় প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে আড্ডা দেয়, তখন আমি কি এটুকুও বুঝি না যে ওরা মানে অনু আর অতুল এবং গীতা আর সুবোধরা দুটো জোড়া মিলিয়েছে। হঠাৎই কিছু দিন ধরে আমাকে একঘরে করে অতুল আর গীতা ওদের

দুজনের মধ্যে ভ্রাতা ভগ্নীর এক আদর্শ স্নেহের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে। এর অন্তর্নিহিত অর্থ কি, আমি কি না জেনে আছি? আমি খুব ভাল করেই জানি আজ অতুল সুবোধের সঙ্গে একটু খারাপ ব্যবহার করুক; কালই অনু আর গীতার মধ্যে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বন্ধুত্বের আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়বে।

আমি কিছু বলব না। যুগ যুগ ধরে নাকি বোকা মা-বাবারা পুত্রকন্যাদের প্রেমের পথে হ্যাঙারের * মত দাঁড়িয়ে ওদের দুজনের অশান্তি, বিরহ বেদনার কারণ হয়েছে। ওদের অভিশাপের পাত্র হয়েছে। আমি হব না। ওদের কিছু একটা বলব ওরা আমাকে সেকেলে, ছোট মনের মানুষ বলে আড়ালে তর্জন গর্জন করবে, আমি তা হতে দিতে পারি না। আমি ওদের প্রেমের খেলা যা দেখব, উদার মুক্তমনে তা লক্ষ্য করব। যা শুনব তাও উদার মনে বিচার করব। ওদের জন্ম দিয়েছি বলেই আজীবন ওদের লাগাম ধরে থাকাটা আমি সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয় বলে ভাবি। ওটা আমার দায়িত্ব নয়।

দায়িত্ব—। দায়িত্ব কথাটা মনে এলে আমার বুকের কোন জায়গায় কি একটা যেন খচখচ করে; একটা যন্ত্রণা অনুভব করি। আমার স্ত্রী জীবিত থাকলে সে আমার কাছে একটা চেয়ারে বসে — ও না তিনি আবার অদ্ভুত ধরনের পতিভক্তি সম্পন্না মহিলা ছিলেন তিনি চেয়ারে বসতেন না— তার একটা ছোট মোড়ায় বসার কথা— মোড়াটায় বসে তিনি মাঝে মাঝে মেয়েকে সুপাত্রের হাতে তুলে দেওয়ার কথা, ছেলেটার জন্য একটি লক্ষ্মী মেয়ে ঘরে আনার দায়িত্বের কথা বলে চলতেন নাকি? এ জাতীয় কিছু করাটা নেহাৎই উচিত কি? হয়তো বা উচিত। আমি কিছুই ধরতে পারছি না। একথা ভেবে আমি কেবল যন্ত্রণাই পাই।

দিন কেটে যাচ্ছে। ওদের দুটি জোড়ের ও ঘরের গুঞ্জন আরও নিবিড়, আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে। আমি আরও নিঃসঙ্গ, আরো দুর্বল, আর অসহায় হয়ে পড়ছি। প্রায়ই আমার মন চায় বলি, শুনে যা অতুল— দেখি গীতা একবার এদিকে আয় তো। একটু কথা বলি। কিন্তু ডাকি না। ওদের সময় কম। আমি চুপ চাপ বসে থাকি।

কিন্তু একদিন যখন টের পেলাম, আমার এই নিশ্চুপ বসে থাকাটাও ওদের সহ্য হচ্ছে না, সেদিন বড় দুঃখ পেলাম। অতুল একদিন আমায় বলল, 'বাবা, আপনি বিকেলে একটু বেড়ালে ভাল হবে। একটু হাত পা চললে আপনার স্বাস্থ্যটাও ভাল হবে। অনবরত বসে থাকলে' ইত্যাদি।

আমি প্রথমে তার পরামর্শ সরল-সহজভাবে গ্রহণ করেছিলাম; কিন্তু পরে যখন বিকেল হলেই ঐ কথা বলতে শুরু করল এবং একদিন গীতাও তার সঙ্গে যোগ

'হ্যাঙার'-এর মূল অসমীয়াতে অর্থ আড় করে বাঁশ রেখে বাধার সৃষ্টি করা, উচ্চারণ 'হ্যাঙার'

দিল, তখন হঠাৎ আমি আসল কথাটা বুঝতে পারলাম। এরা আমাকে বোকা বলেই ভেবেছে। আসল কথাটা আমি বুঝিনি বলে মনে করেছে। ওদের বিকেলের প্রেম এমনই নিবিড় হয়ে উঠেছে যে এই ঘরে আমার প্রায় নিষ্প্রাণ উপস্থিতিও ওদের জন্য বাধা স্বরূপ। আমার বাড়িতে থাকা চলবে না।

ঠিক আছে। যাব বেরিয়ে। উঠতে গিয়ে আমার গোটা শরীরটা মনটা একটা ঝাঁকুনি খেল। আমি টের পেলাম আমার চোখ দুটো ভিজে আসছে। চশমা খুলে ধুতির খুঁটে চোখের কোণা দুটো মুছে নিলাম। কলেজের বিদায় সভায় উপহার দেওয়া এবং কখনও ব্যবহার করব না বলে রেখে দেওয়া ছড়িটা হাতে নিলাম। কেমন করে ছড়িটা ধরলে সুবিধা হয়, বারবার বিভিন্ন ভঙ্গীতে ধরে দেখলাম; তারপর সুবিধেমত ছড়িটাকে খামচে ধরে নিলাম। রাস্তায় বোরোনোর সময় আমার শরীরটা কেঁপে উঠল।

অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। কিন্তু আমার পায়ের গাঁট ব্যথা করে, হাঁটুতে আমার কষ্ট হয়। কি করি? কোথাও তো একটু জিরোতে হবে। কোথাও একটু বসার সুবিধা নেই। রাস্তার পাশে লোকেদের ঘর আছে। সবাইকেই আমি চিনি, আমাকেও সকলে চেনে, আমি যে কোন একটা বাড়িতেই ঢুকে যেতে পারি। কিন্তু আমি যে আগে ভেবেছিলাম— বৃদ্ধ হলে বিনা কাজে লোকের বাড়িতে যাব না, সন্ধ্যায়, সন্ধ্যায় লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানো খুব বদ অভ্যাস। সে সব কথা আমার মনে আছে; আমার সেই প্রখর বুদ্ধিও আছে। কিন্তু সত্যি সত্যিই আমার পায়ের গাঁট ব্যথা করতে শুরু করেছে। একটা বাড়িতে আমাকে ঢুকতেই হবে। কার ঘরে যাই। অচ্যুত, প্রদীপ, রমা না রামপ্রসাদের ঘরই ঠিক আছে। সাধারণ মানুষ, কখনও যে আসেনি, যে কারও বাড়িতে যায় না, তেমন কোন মানুষকে দেখলে খুব যত্ন করবে। আমার অনুমান সত্যি হল। রামপ্রসাদ নিজে, তার স্ত্রী, মেয়ে, ছেলে সবাই আমাকে নিয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। চা? লাগবে না। সরবৎ? লাগবে না। এই সন্ধ্যাবেলায়! একগ্লাস জল হলেই হবে।

জল একগ্লাস খেয়ে খুব শান্তি পেলাম। আমার দুই একটা কথা বলতে ইচ্ছে করল। লোকেরা সুবিধা পেলেই আমার পত্নীর গুণগান আরম্ভ করে দেয়; এই ভয়ে আমি অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম। শহরের জল সরবরাহের কথা, এই জায়গায় কুয়োতে একটা ঘোড়ার পড়ে যাওয়ার গল্প, ঘোড়ার ল্যাজের চুল কি কি কাজে লাগে তার কথা— অনেক গল্প। অনেক কথা বললাম। অনেকক্ষণ পরে যখন রামপ্রসাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম, কেন জানি না, মনটা বড় খোলামেলা মনে হল, বুকটা অনেক হাল্কা ঠেকতে লাগল।

পরদিনও ঘুরে-টুরে রামপ্রসাদের বাড়ি গেলাম, তারপর দিন, তারপর দিনও। পরের দিকে কখনও রামপ্রসাদ ঘরে থাকে না, কখনও তার স্ত্রী রান্নাঘরে, ছেলেটা

প্রায়ই হয় খেলতে নয় বেড়াতে নয় তো বাজারে যায়; শেষে একদিন টের পেলাম, রামপ্রসাদ সন্ধ্যের সময় বাড়িতে দেরি করে ফেরে; তার ছেলেমেয়ে দুটোর পরীক্ষা; ওরা বিকেলে পড়তে বসে; আর রামপ্রসাদের স্ত্রীর ঢের ঘরকন্নার কাজ।

ওদের সদর থেকে ফিরে আমি এদিক ওদিক তাকালাম। কার বাড়িতে একটু বসি। অচ্যুত আমাকে বড় সম্মান করে, তাহলে ওর ওখানেই যাই? হ্যাঁ ওখানেই যাই।

প্রদীপও ভাল লোক, রমাও কিছু খারাপ নয়। পরে ওদের বাড়িতেও গেছি আরও অনেক, অনেকের বাড়িতে।

এর মধ্যে একটা খুব আনন্দের ঘটনা ঘটল। যাব না যাব না করেও একদিন এক সভায় গেলাম। সভায় 'উপস্থিত শ্রোতাদের তরফ থেকে কেউ দুকথা বলবেন কি' বলে সভাপতি জিগ্যেস করাতে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। অনেক দিন পর মানুষের সামনে বক্তৃতা দিতে উঠলাম। একটা অদ্ভুত শক্তি আমার নিজের ভেতর অবিষ্কার করলাম। আমি বললাম; অনেক কথাই বললাম; আর লক্ষ্য করলাম, আমার বক্তব্য লোকেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে; বার বার শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠছে; দু একজন করে কিছু লোক সভা থেকে চলে যাচ্ছে — নিশ্চয় বাইরে গিয়ে আমার বক্তৃতা নিয়ে আলোচনা করতেই। সভার শেষে আমার বক্তৃতাটা বেশ দীর্ঘ হয়েছে বলে অনেকে প্রশংসাও করল। আমি ঠিক করলাম অন্তত সভাগুলোতে আমি যাবই। এবং যাচ্ছিও। প্রায় সব সভাতেই।

ইতিমধ্যে একটা বড় রকমের দুর্ঘটনাও ঘটে গেল। সুবোধ আর অনুর নাকি বিয়ে হয়ে গেছে। আমি বিশেষ কিছু জানি না। গল্প। আমাদের কালের গল্পের মত হয়ে গেল। আমার হাসি পেল।

হঠাৎই গীতার হোম সায়েন্স পড়ার প্রতি তীব্র আগ্রহ জন্মাল। আমি সবই বুঝলাম; সে বিরহ যন্ত্রণায় ভুগছে। তাই পালাতে চাইছে। আমাদের কালের গল্প।

গীতার চলে যাওয়ার দিন আমি অদ্ভুত এক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছিলাম। আমার চোখ ফেটে জল এসেছিল।

অতুল ম্লান এবং নিষ্প্রভ হয়ে গেল। আমার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারে না। আমার সমগ্র চেতনাকে জড়ো করে আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। ওকে দেখে দেখে আমার আশ মেটে না।

একদিন আমার বোনঝির মুখে শুনতে পেলাম আমাদের বাড়ির ক্লাবটার, মানে বাড়ির সম্পর্কে সকলের মুখে যাতা শুনে তার খুব খারাপ লেগেছে।

মানে বদনাম? না তো, এতে আর বদনামের কি আছে? বুড়বকদের আর কাজ নেই। কিন্তু একটা কথা, এই লোকগুলো যে আমার কাছে আসে না, পথে ঘাটেও আমার সঙ্গে ডেকে বেশি কথা বলে না, সে কি বাড়ির মিথ্যে বদনামের জন্য? না

না, তা তো হতে দিতে পরি না। আমার বাড়ি একটা সম্ভ্রান্ত বাড়ি। একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের বাড়ি, একদল স্বাধীনচেতা লোকের বাড়ি। ঠিক আছে আমি একটা কাজ করব, আমি সবার সঙ্গে সাক্ষাতে কথা বলে দেখব, দেখব তাদের আমাদের প্রতি কি মনোভাব; আর তাদের মনোভাবে মন্দ কিছু আভাষ পেলে আমি প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দেব, আমার জীবনদর্শন কি।

কিন্তু মানুষজন কেউ দেখি ঘরেই থাকে না। প্রায় লোকের বাড়িতে সকালে চেষ্টা করে দেখেছি, দুপুরে চেষ্টা করে দেখেছি, সন্ধ্যায় চেষ্টা করে দেখেছি, নেই, যাকেই খুঁজি, কারুকেই বাড়িতে পাই না। সবাই-ই 'কোথায় যেন বেরিয়ে যায়'। উত্তরগুলো বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা দেয়।

পায়ের গাঁটের ব্যথাটাও আমার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। সেইহেতু একটা আরামকেদারায় বসে থাকি।

কিন্তু কথাগুলো জিভের ডগায় লক্‌লক্ করতে থাকে। অনেক কথা। আমার যে অনেক কথা বলার আছে। অনবরত আমার একজন লোকের দরকার। না হলে আমি বড় কষ্ট পাই। মানুষ না থাকলেই, গলায় আওয়াজ না হলেই, নিঃসঙ্গতার সুযোগ পেলেই, একটা সম্পূর্ণ জীবনের বেদনা আমাকে চেপে ধরে। যন্ত্রণায় আমি হাহাকার করে উঠি।

আমার মানুষ দরকার! ওই যে —

'এই যে, ও কে , ধীরেন না কি হে?'

'হ্যাঁ স্যার—'

'দেখি এদিকে শোন তো'

'স্যার আমি বাজারে এসেছিলাম, একজন অতিথি এসেছে—'

'আরে যেও'খন বাজারে। বাজার কি চলে যাচ্ছে না কি? আরে এসো, এসো। তোমার আবার অতিথি এল কোত্থেকে?'

যৌতুক

এই যে পাটের পাঞ্জাবি পরে একজন লোক বর সাজে, পরে তার ঐ পাঞ্জাবিটার কি হয়? বিয়ের বিকেল থেকে তিনি তো ঐ পাঞ্জাবি পরেই থাকেন; পরদিন খবরাখবর নিতে গেলে দেখা যায় বিয়ের আগের দু'দিনের গায়ে হলুদের সুতির পাঞ্জাবি দুটোর একটা পরে আছে। ভাঁজ না খোলা নতুন কাপড়ের মত পত্নীটিকে নিয়ে, আরেক হাতের মুঠোয় টর্চলাইট ধরে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে বেড়ানোর সময় তিনি পাটের পাঞ্জাবিটি পরে যান। কদিন পর ব্যান্ডপার্টির বাকি টাকাটা নিতে আসা লোকেরা দিনের যে কোন সময়ে তাকে সুতির পাঞ্জাবি পরা অবস্থাতেই দেখতে পায়। বাড়িতে একজন যুবতী মহিলা আছেন, তার সামনে কেবল গেঞ্জি পরে থাকতে, গায়ের বেশির ভাগটা খোলা রাখতে তার খারাপ লাগে।

কিন্তু কখন, কিভাবে ঐ মানুষটি, একটা যেখানে সেখানে ফাটা ধুতি দুভাঁজ করে কোমরে জড়িয়ে, দুটো বড় বড় অসাবধান গিঁট মেরে খালি গায়ে ঘুরে বেড়ানোর মত অবস্থায় এসে যায়? ঠিক কখন থেকে মানুষটা পিঠে লোম আর চর্মরোগের চকচকে দাগ নিয়ে বড় বড় কিছু লোম থাকা বুকের ওপর কুলের বিচির মত মাংসপিণ্ড উন্মুক্ত করে, খালি গায়ে দল বেঁধে যাওয়া ঊনিশ কুড়ি বছরের মেয়েদের সামনে, স্ত্রীর বান্ধবী প্রতিবেশিনী মহিলাদের সামনে নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়ানোর অবস্থায় চলে আসে?

এই বিষয় নিয়ে দীননাথ একটা গল্প লিখতে শুরু করেছেন। কদিন আগে গল্পটা লেখা শেষ করে তিনি মেয়ে সুরভিকে কপি করতে দিয়েছেন। কপি করতে দিয়ে বলেছেন, 'সাবধানে মন দিয়ে করিস।' তারপরের কদিন তিনি তেমন করে মেয়ের মুখোমুখি হননি। গল্পটা কপি করে শেষ করার সময় বোধ হয় হয়ে গেছে; কিন্তু কাজটা হল কি না তার খবর নেননি।

দীননাথের সাহিত্যকর্মের ইতিহাস মেয়ে ছোট থাকতে তার বাঁধিয়ে দেওয়া

খাতার মত। অফিস থেকে আনা একপিঠে অনেক জটিল জটিল কথা, মরচে রঙের কাগজে বাঁধানো প্রকাণ্ড খাতা, খালি পাতাগুলো লিখে লিখে মেয়ে খাতাটা শেষ করল। কিন্তু কথা বিশেষ কিছু ছিল না। কোন পৃষ্ঠায় ঈশ্বর বড় দয়ালু, কোন পৃষ্ঠায় একটা কচুপাতা, কোন পৃষ্ঠায় কাটাকুটি খেলা। একটা পৃষ্ঠায় যদি রঙিন পেন্সিলের দাগ তো অন্য পৃষ্ঠায় কাঠ পেন্সিলের, তার পিছনের পৃষ্ঠায় হয়তো কালি দিয়ে বোলানো, বিচিত্র রং বিচিত্র সম্ভার। উচ্ছৃঙ্খল, অবিবেচক শিশুর হাতে উপদ্রুত পাতাগুলো ফালা ফালা হয়ে গেছে, কেবল অনড় অচল হয়ে থেকে গেল দীননাথের দেওয়া মোটা বেতের বাঁধনটা। বড় মজবুত ছিল সেই বাঁধন। আর সেইজন্য শেষ পর্যন্ত টিকে থাকল শেষ হয়ে যাওয়া ব্যাঙ্কের চেকবইয়ের কাউন্টার- ফয়েলের মত বাঁধুনির ভাঁজে ভাঁজে অল্প অল্প কাগজের টুকরো। দীননাথের সাহিত্যকর্মের ইতিহাস ঠিক এই খাতাটার মত।

রায়বাহাদুর গগনেন্দ্র মজুমদারের প্রাসাদোপম বাসভবনের সামনের বাগানে এক পথহারা বিকলাঙ্গ ভিখারী, বাঁশির সুরে সবাইকে মুগ্ধ তন্ময় করে রাস্তায় রাস্তায় বাঁশি বেচে বেড়ানো উদাস, যাযাবর যুবকের প্রতি ধনীর দুলালীর অনুকম্পা, রাক্ষসী হেন মাসিমাকে, আর তার হাতের পুতুল বাপের হাতে অত্যাচারে জর্জরিত যুবক চিত্রশিল্পীর বিষময় জীবন, এরকম এক কাহিনী নিয়ে দীননাথ একসময় অনেক গল্প লিখেছিলেন। কি এক তীব্র নেশার বশবর্তী হয়ে তিনি গোটা দিনটা যেমন ভাবে অফিসে কেরানির কলম পিষতেন, ঘরেও কখনও কখনও মধ্যরাত্রি অবধি তেমনি ভাবে গল্পের কলম চালিয়েছিলেন। কিন্তু দীননাথের কয়েকটা ব্যাপারে বড় অসুবিধা হচ্ছিল। যে পত্রিকার জন্য তিনি বড় যত্ন করে একটা গল্প কপি করতেন সেই পত্রিকার পরের সংখ্যাটা আর বেরোত না, পত্রিকাটা বন্ধ হয়ে যেত। যে আলোচনাচক্রে তিনি ত্রস্তে ব্যস্তে জামার পকেটে গল্প ঢুকিয়ে নিয়ে পড়ার জন্য যেতেন, তিনি পড়তে পাওয়ার আগেই সেই আলোচনাচক্র শেষ হয়ে যেত। আর যে পত্রিকার সে মুহূর্তে বন্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না, সেই সব পত্রিকা তার গল্পের ভাব বড় দুর্বল, পুরনো ধাঁচের, বহুব্যবহৃত, অভিনবত্বহীন বলে ফেরত দিত।

দুর্বল? পুরনো? অফিসের চেয়ারে বসে বাঁ হাতের তালুতে মাথা রেখে দীননাথ কথাগুলো চিন্তা করেছিলেন। কোন এক সময় পাশের কেরানি বন্ধু হৃদয়ানন্দকে গোপনে জিগ্যেস করেছিলেন, 'হ্যাঁ হে, শহরটাতে বাগানের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে; আর বিকলাঙ্গ ভিখারীর সংখ্যা তার চাইতেও বেশি হারে বেড়েছে; অতএব বাগানে ভিখারীর চোখের জল ফেলার ঘটনাও নিশ্চয় বেড়েছে; তবে যে ওরা সবাই বলে গল্পের কাহিনী হিসেবে নাকি এসব ঘটনা দুর্বল হয়ে গেছে — পুরনো হয়ে গেছে।'

হৃদয়ানন্দ বেশ মেজাজি এবং বাকপটু ব্যক্তি, দীননাথের প্রশ্নের উত্তর

দিয়েছিলেন জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার কায়দায়। বলেছিলেন, 'দ্যাখ বাপু, সামনে যখন দশ রিম কাগজ লেখার জন্য থাকবে, তখন এই কলমটা বড় দুর্বল, যখন দশ লরি কাঠ চেরার কথা হবে তখন তোমার কুড়ুলটা দুর্বল, যখন তোমার দশটা বদমাশ মস্তানকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করতে হয়, তখন তুমি বড় দুর্বল পিতা। এই মিথ্যা কথা বলা লোকের কথাই ধর না কেন। মিথ্যে কথা বলা লোকের সংখ্যা কি পরিমাণ বেড়েছে। বেড়েছে কি না। সেই অনুপাতে তো আজ রাস্তার খুঁটিতে খুঁটিতে সর্বদা সত্যি কথা বলিবে বলে লিখে রাখা দরকার ছিল। কিন্তু আসলে তা হচ্ছে কি? আজ 'সর্বদা সত্য কথা বলিবে' বাণীটি পুরনো, বস্তাপচা হয়ে গেছে। হাঃ হাঃ হাঃ! নিজের বক্তৃতার সারমর্ম নিজেই সবচাইতে বেশি বুঝে হৃদয়ানন্দ উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করল।

দীননাথ গল্প লিখে সম্পাদকের কাছে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। সকাল সন্ধ্যায় অন্য কোন কাজ না থাকলে কোন সময় টুকটুক করে কিছু লিখতেন, আলোচনা চক্রে শেষ সারিতে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে শুরু করেছিলেন, পকেটে কোন গল্প-টল্প নিতেন না। পরের দিকে তিনি লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। লেখার অভ্যাসও চলে গিয়েছিল।

অনেক বছর পর এই গল্পটা তিনি লিখলেন, এটা লিখতে তার তিন মাস সময় লেগেছে। লিখতে যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে।

বাবার কাছে গল্প কপি করার হুকুম পেয়ে সুরভিও অবাক হয়েছে। বাবার হল কি? হঠাৎ গল্প? সুরভি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নামী দামি লেখকের গল্প-উপন্যাস অনেক পড়েছে। বাবা আবার এটা কি লিখল! পাছে কোন পত্রিকার সম্পাদকের কাছে বাবা গল্প পাঠিয়ে ছোট হয়ে যান ভেবে সুরভির মনে আগে ভাগেই ভয় হল। আবার কোনভাবে কোন নিচু মানের পত্রিকায় গল্পটা ছাপা হয়ে গেলে বন্ধুবান্ধবীর সামনে ভারি লজ্জা পেতে হবে।

কপি করা ব্যাপারটা এমনিতেই ভারি শক্ত কাজ। তার ওপর আবার এসব কথা! তবু সুরভি মনের বিরক্তি প্রকাশ করেনি। আজকাল বাবার কোন কথায় ও না করে না। যা করলে বাবা খুশি হন কষ্ট হলেও ও তাই করে। বর্তমানে ও প্রেমে পড়েছে। অন্য এক শহরে প্রমোদ নামের কেরানির চাকরি করা একটা ছেলে অফিসের কাজে এই শহরে এসেছিল। সুরভির বাবার অফিসে প্রায় একমাস ধরে ছেলেটাকে কি সব করতে হয়েছিল। ওই এক মাসে সুরভিদের বাড়ির সঙ্গে ওর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ছেলেটি নিজের শহরে ফিরে যাওয়ার আগে সুরভি বুঝতে পেরেছিল, তাদের দুজনের মধ্যে একটা ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এরপর থেকে এ শহরে প্রায়ই ছেলেটার কোন না কোন কাজ বেরোতে লাগল। আর এটা বাড়িতে অযাচিত ঘটনা — পিয়ন সুরভির মায়ের নামে চিঠি দিয়ে যেতে

লাগল। লেফাফার ভেতর পূজনীয়া কাকীমাকে লেখা একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি আর সুরভিকে লেখা একটা দীর্ঘ পত্র। সুরভিকে লেখা চিঠিটা ঘরের সবাই পড়তে পারার মত চিঠি; কিন্তু তার বাড়ির অন্য সবাই বোঝে এক রকম, আর সুরভি বোঝে অন্য রকম। শব্দ, বাক্য, ভাষার বিচিত্র ছদ্মবেশ। দুটো শব্দের মধ্যে এক একটা ইঞ্চিখানেক দীর্ঘ সরলরেখা থাকে, সেই সহজ সরল রেখাটি অনেক দীর্ঘ একটা বাক্যের চাইতেও বেশি কথা বলে দেয়।

আজ থেকে প্রায় ছ'মাস আগে সুরভি আর প্রমোদ ঠিক করে ফেলেছে, ওদের প্রেম কালজয়ী, অবিনশ্বর, অক্ষয়। ওদের দুজনের বিবাহপাশে আবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করাটা এখন একটা অপরিহার্য কর্তব্য।

দীননাথ কথাটা টের পেয়েছেন। যেদিন টের পেলেন, সেদিন থেকেই দীননাথ বড় গম্ভীর হয়ে পড়েছেন। ভদ্রলোক সুরভির মাকেও এ বিষয়ে কিছু বলেননি। সুরভিকে তো বলেনইনি। কিন্তু বাবার এই মৌনতা সুরভির পক্ষে খুবই রহস্যজনক—প্রমোদের চিঠির সেই দীর্ঘ সরল রেখাগুলির মত। কোন্ দিন বাবার এই গাম্ভীর্যের বিস্ফোরণ ঘটে, কোন্ দিন থমথমে হয়ে থাকা আবহাওয়া বজ্রবিদ্যুৎসহ নেমে আসে, সে কথা ভেবে সুরভি শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। বাবা মেজাজি লোক; হঠাৎই কোন দিন 'খবরদার ওর সঙ্গে যেন এ বাড়ির কুটোগাছারও লেনদেন না হয়' বলে হুঙ্কার তুললে সুরভির জীবনে দুর্যোগ নেমে আসবে।

এজন্যই গত ছ'মাস সুরভি বাবার একান্ত অনুগত হয়ে দিন কাটাচ্ছে। পা ধোওয়ার জল, পা মোছার গামছা, দাঁত মাজার কাঠকয়লা, গোড়ালি ঘসার জন্য ধুন্দুলের ছোবা, সাবান, ভাঙা পেয়ালায় জল, পুরোনো আয়না ইত্যাদিতে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে দাড়ি কাটার সরঞ্জাম— এ সবের কোন অভাব বাবাকে অনুভব করতে দেয় না সুরভি। যতই কঠিন কাজ হোক গল্পটা সে কপি করে দেবে। রাতে ভাত খেয়ে উঠে, ল্যাম্পটা ঝাঁকিয়ে কতটা তেল আছে তার একটা আন্দাজ করে একদিস্তা মুগা রঙের কাগজ সামনে রেখে সুরভি গল্পটা কপি করতে বসল।

বাবার হাতের লেখা ভাল। পাতাগুলোতে যদিও অনেক কাটাকুটি, তবু পড়তে অসুবিধে হবে না। সুরভি শুরু করল। কিন্তু প্রথম বাক্য কটা পড়ে ও একটু থমকে রইল, আর তারপর ও কপি করার আগে গল্পটা শেষ অবধি একবার পড়তে লেগে গেল, প্রায় অজ্ঞাতসারেই।

বাবা গল্পটা প্রথম পুরুষে লিখেছেন।

... আমার বিয়েতে আমি তিনটে পাঞ্জাবি বানিয়েছিলাম, একটা পাটের আর দুটো সুতির। পাটের জামাটায় তিনটে সুতির দাম লেগেছিল। শুধু সুতির হলে আমি ঐ টাকায় পাঁচটা পাঞ্জাবি বানাতে পারতাম। কিন্তু দরকার না হলে আমি একসঙ্গে পাঁচটা জামা কখনই করাতাম না। আমার হিসাবে ঐ পাঁচটা জামা আমি তিন বছরে

বানাতাম। তাও এত ভাল কাপড়ের জামা বানাতাম না। আগে কখনও বানাইওনি।

বাবা একেবারে নিজের কথা বলার মত করে ঘরোয়া ভাষায় গল্পটা আরম্ভ করেছেন। এরপর কি লিখেছেন কে জানে! অশ্রুধারা, মৌন আকুতি, মৃদু শিহরণ, নিবিড়— আরও নিবিড়, —বিখ্যাত লেখকদের মত এসব শব্দ বাবা কি করেই বা ব্যবহার করবেন? কথাটা ভেবে সুরভি আবার পড়তে শুরু করল।

পাটের জামাটা পরে অবশ্য আমার খুব ভাল লেগেছিল। শরীরটা বেশ হাল্কা মনে হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনটাও হাল্কা লাগছিল। বিয়ের কনেটি সুসজ্জিত ছিল, পাটের জামাটায় আমিও তার পাশে মানিয়ে গিয়েছিলাম বলে আমার মনে হয়েছিল। প্রথম অবস্থায় আমি রাতের ভাত না খাওয়া পর্যন্ত জামাটা খুলিনি, মেয়েটির পাশে মানিয়ে থাকতে আমার খুবই ভাল লাগছিল। বিছানায় শুতে যাওয়ার সময়ও একটা সুতির জামা পরেই শুতে গিয়েছিলাম। মেয়েটির সামনে জামা না পরে থাকাটা আমার ভাল মনে হয়নি। এটাকে লজ্জার ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল।

ধীরে ধীরে একটা টর্চলাইট নিয়ে মহিলাটিকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় লোকের বাড়ি ঘুরে বেড়ানোর দিন ফুরিয়ে এল। প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতেই একবার করে যাওয়া হয়ে গেল। তারপর আমি সন্ধেবেলায় অল্প সময়ের জন্য খুচখাচ কাজে বেরোতাম, পাটের জামাটা পরেই। দিনের বেলায় তো জামাটা পরতেই পাই না। সন্ধেতে শখটা পূরণ করি। একদিন অফিসে জামাটা পরে গিয়েছিলাম, কিন্তু হৃদয়ানন্দ নামে আমার এক কেরানি বন্ধু আমাকে খুব ঠাট্টা করল, 'বুঝলে বাপু, এটা একটা থিয়েটারের ড্রেস মাত্র, এটা সর্বদা পরার জামা নয়। আর এটা পরে তুমি তো কলম পিষতেও পারবে না! রেখে দাও, রেখে দাও ভাঁজ-টাজ করে তুলে রেখে দাও; আমাদের মত দুভার্গা কেউ যদি থিয়েটার করে তো ভাড়া করে আনব।' তারপর থেকে জামাটা অফিসে আর পরে যাইনি। সন্ধেবেলায় বেরোলে পরে যাই। একদিন মুদির দোকানে গিয়েছিলাম। ঐ দোকানটা থেকে আমি বিয়ের জন্য ময়দা, চিনি, ঘি ইত্যাদি অনেক জিনিস বাকিতে এনেছিলাম, দোকানের মালিক বেশ কিছুদিন যাবৎ আমাকে পয়সাটা দিতে বলছিলেন। সেদিন তার অন্য কারও ওপর রাগ ছিল কি না বলতে পারি না, পয়সার কথাটা একটু রূঢ়ভাবেই বললেন। বলতে গেলে আমাকে তিনি একপ্রকার গালমন্দই দিলেন, আমার গায়ের ফিনফিনে পাটের পাঞ্জাবি আর ওর মুখের গালি দুটোকে আমি কোন মতেই খাপ খাওয়াতে পারলাম না। সেইদিন আমি ঘরে ফিরে জামাটা খুলে, ভাঁজ করে বাক্সের নিচে রেখে দিলাম।

মানুষের বাঁকা কথা, একটু আধটু রূঢ় কথা আমি বিয়ের সাতদিন পর থেকেই শুনতে শুরু করেছিলাম। ব্যাগুপার্টির লোকটা এসেছিল, বিয়েতে একটা বাস ভাড়া

করেছিলাম — সেই বাসের মালিক এসেছিল, গ্রামের একটা লোক দু'মণ দৈ দিয়েছিল, সেও এসেছিল। সবাইকেই দশ টাকার জায়গায় ছ' টাকা দিয়ে বিদেয় করেছিলাম। তখনও বিয়ের প্যান্ডেলের খুঁটিগুলো একজায়গায় ডাঁই হয়েছিল, খুঁটির গর্তগুলো মাটি দিয়ে বোজানো বাকি ছিল, আমার গয়ে ধবধবে সুতির জামা ছিল, ভেতরে কনেটি আছে এটা সামনের দিকে যারা এসে কথা বলত তারাও বুঝতে পারত, তাই বোধ করি লোকগুলো আমাকে উচুঁ গলায় কিছু বলত না। 'একেবারে পুরোটা দিয়ে দিলেই ভাল হত, আমাদেরও তো নানান ঝামেলা' বলে একটু অনুযোগ করত। কিন্তু মুদি দোকানের মালিকই প্রথমে আমার গা থেকে পাটের পাঞ্জাবিটা খসিয়ে দিয়েছিল।

অতএব এবার সুতির জামা দুটোকেই সম্বল করলাম। বিয়ের আগে যে ভাল জামাটা ছিল তাই দিয়ে হোলি খেললাম। হাজার হোক বিয়ের পরের হোলি, অন্য বছরের মত ফাটা কাপড়ের পোঁটলা খুঁজে জরাজীর্ণ জামা বার করা আর হল না। হোলি খেলা জামাটার আয়ুও ওইদিনই শেষ হল। লাউয়ের গলা দিয়ে ছাঁচ তৈরি করে তাতে আলকাতরা ঢেলে কেউ আমার বুকে পিঠে ছাপ দেগে দিল— মূর্খ—মূর্খ—মূর্খ—মূর্খ ...! বোতামগুলো কেটে রেখে আমি জামাটা ওকে দিয়ে দিলাম অন্য কাজে লাগাতে। ধোপাকে দিলে জামা তাড়াতাড়ি ফাটে। ফাটবে না কেন? আছাড় দেওয়া কাজটা সম্ভবত এই ধোপারাই করে। সেইজন্য আমি জামা দুটো ধোপাকে ধুতে দিইনি। নতুন স্ত্রী প্রথম দিন জামা ধুতে নিলে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। অবশ্য জামা দুটো ওর ধুতে খারাপ লাগেনি। জামা দুটো যথেষ্ট পরিষ্কারও হয়েছিল। ধোপায় ধোওয়ার অর্থ কি? ইস্ত্রির জন্য তো! সে কাজটিও ভদ্রমহিলা করেছিলেন। বাবার আমলের বড় চ্যাপ্টা তলার কাঁসার বাটির একটায় আঙরা দিয়ে আমি যে জামাটা পরে যাইনি, সেটা ইস্ত্রি করে রেখেছিলেন।

আমি জামা দুটো খুব সাবধানে ব্যবহার করতাম। আমি জানতাম দুটো জামা একসঙ্গে ফাটলে আবার দুটো জামা চট করে করাটা আমার পক্ষে খুব কঠিন হবে। আমার সব মিলিয়ে মোট এক হাজার একশ পঁচিশ টাকা ধার আছে। বিয়ের জন্য করেছিলাম। আটজন মানুষের কাছে এই ধারটা আছে। এই আটজনের মধ্যে দুজন যদি কোন কারণে আমার কথা ভুলে থাকে তো বাকি ছজন সপ্তাহে একবার করে আমার খবর নেয়। খবর মানে আমার কুশল সংবাদ নয়, পয়সার খবর। এই ছজনের দুজন যদি অল্পদিনের জন্য আমাকে রেহাই দেয় তো, আমার কথা ভুলে থাকা দুজন সক্রিয় হয়ে ওঠে।

যাদের থেকে টাকা ধার করেছি তাদের থেকে আমার মুখের হাসির বড় শত্রু আর কেউ নয়। এই আটজন শত্রুর মধ্যে থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আমার মুখের হাসিটি নববধূকে দেখাতে যে কত কষ্ট হয়, তা আর বোঝাই কি করে?

আমি পদে পদে সাবধান হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। ঘরে জামা পরে থাকাটা একদিন ছেড়ে দিলাম। জামা কটার অন্তত একটু হলেও আয়ু বাড়ুক। আর নিজের স্ত্রীর কাছে খালি গা হয়ে থাকাটা এমন কি কথা? এই তো আমার শরীর— আমার বুকে এবং পিঠে ছুলির দাগ আছে— পিঠের জায়গায় জায়গায় লোম আছে। বুকে কুলের বিচির সমান একটা মাংসের দলা আছে; তাতে কটা বড় বড় লোমও আছে —

বাবা একেবারে নিজের শরীরেরই বর্ণনা দিয়েছেন। সুরভি কথাটা চিন্তা করে থামল। বাবা কি সবই নিজের কথা বলে গেছেন নাকি? সুরভির মনটা একটু ভার ভার ঠেকল।

এই তো শরীর। এখানে তো আর ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের গুলি খাওয়ার দাগ নেই। আর যে মহিলাটির গোটা জীবনটাই শূন্য হয়ে গেছে তার সামনে খালি গায়ে থাকাটা এমন কি বড় কথা। অবশ্য আব্রু একটা রাখতে পারলে ভালই ছিল। একটা আব্রু থাকলে একটা মোহ থাকে। কিন্তু জামা নেই যখন, তখন আর কি করা যাবে। একদিন সকালে উঠে মনে পড়ল একটা জামা ও কেচে দিয়েছে আর এই জামাটা মাত্র কালই অফিসে পরে গিয়েছিলাম, এখনও অনায়াসে দুদিন পরা যাবে, সুতরাং জামা না পরেই পুরো বেলাটা কাটিয়ে দিলাম। তেমন তো কিছু খারাপ লাগল না।

ফাটা হোক, ছেঁড়া হোক একটা গেঞ্জি কদিনের জন্য গায়ে ছিল; কিন্তু পরে যখন রান্নাঘরের দিকে একটু জায়গা বার করে নিয়ে লঙ্কা আর বারোমেসে বেগুনের চারা লাগানোর ব্যবস্থা করলাম, তখন থেকে গেঞ্জি পরাও ছাড়লাম। গায়ে ধুলোবালি লাগলে, গা ধোব পরিষ্কার হয়ে যাবে। গেঞ্জিটার হেনস্থা করি কোন্ কম্মে? মিছিমিছি সাবান খরচ।

তারপর অনেক বছর পার হয়ে গেছে। আমি আজকাল ঘরে ঢুকেই গা খালি করে ফেলি। শরীর-মন দুইই হাল্কা লাগে, স্ত্রীর সাথী পাড়া প্রতিবেশী বৌরা আসে, ওরা ওদের মত কথাবার্তা বলে যায়, আমি আমার কাজ করে যাই। সামনের দিকে ঘরের ভিটের ধারে কয়েকটা বড় লাই, চুকা, ধনেপাতা লাগিয়েছিলাম, বিকেলে ওগুলোর একটু যত্ন আত্তি করি, রাস্তা দিয়ে দল বেঁধে উনিশ কুড়ি বছরের মেয়েরা যায়, আমার একটুও অস্বস্তি হয় না। অস্বস্তি লাগার মত আমার জীবনে এখন আর কোন জায়গা নেই। কচুপাতায় যেমন জল পড়ে থাকার উপায় নেই— ঠিক তেমনি।

অস্বস্তি লাগলেও তাকে ঢাকার আমি কোন ব্যবস্থা করতে পারলাম না। আমি দিনে দিনে বড় দরিদ্র হয়ে গেলাম। আমার বিয়ের সাতশ আশি টাকা ধার শোধ করতে করতেই আমার প্রথম কন্যাটির জন্ম হয়েছিল। ধারটা বেড়ে তখন দাঁড়াল এগার শ'য়ে। সেই এগার শ' টাকার সাতশ টাকা শোধ করতেই বাবা মারা গেলেন। আমার মৃত্যুর পর পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও বাবা আমার যতটা খেতেন, বাবার শ্রাদ্ধে

আমাকে তার থেকেও বেশি খরচ করতে হল। আমার কচি মেয়েটাকে একটু জল মেশানো দুধ খাওয়ানোর জন্য আমি হাহাকার করতাম, কিন্তু বাবার শ্রাদ্ধে আশি টাকা দিয়ে গোদান করেছিলাম। তারপর আমার শাশুড়ি মারা গেছেন, শ্বশুর মারা গেছেন। আমার আরও দুই পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। আর এই জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমি ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছি। যে মহিলার সামনে একসময় আমি অনাবৃত শরীর বার করতে লজ্জা করতাম, সেই মহিলার শরীরটাকে ঢেকে রাখতে না পারার লজ্জা আজকাল আমি লজ্জা বলে ভাবাই ছেড়ে দিয়েছি। আমার সঙ্গে শক্তি বাগানে কাজ করার সময় তিনি কখনও কখনও বিয়ের যজ্ঞে পরা মেখলাটা পরে থাকেন। না পরলে উপায় নেই। আর আমার ছেলেদের আমি ছোটবেলা থেকেই খালি গায়ে থাকতে শিখিয়েছি।

এখন আমার প্রথম কন্যাটি বড় হয়েছে। ঘরে না রাখতে পারার মতই বড় হয়েছে।

সুরভি ল্যাম্পের আলোটা বাড়িয়ে দিল। এর মধ্যে একটা মশা পায়ে কামড়েছে, এখন চুলকোচ্ছে। ও সবে টেবিলের নিচে হাত নিয়ে মশা কামড়ানোর জায়গাটা চুলকোতে গিয়েছিল, কিন্তু হাতটা সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসল।

প্রথম সন্তান বলেই কি না জানি না কন্যাটিকে আমি বড় স্নেহে লালন করেছি। অবশ্য শুধুই স্নেহ দিতে পেরেছি, অন্য আর কিছুই দিতে পারিনি। ওকে কি কি দিয়ে বড় করা উচিত ছিল, এই কথাটা ভাবলেই আমার মনে হয়, মেয়েটার কোন বড়লোকের ঘরে জন্ম নেওয়া উচিত ছিল। এক সময় আমি একটা অনধিকার চর্চা করেছিলাম— কখনও কখনও সন্ধেবেলায় একটা সাহিত্যচক্রে গিয়ে বসতাম। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে এসে প্রায়ই দেখতাম আমার স্ত্রী একহাতে মেয়েকে কোলে নিয়ে অন্য হাতে হাঁড়ির শক্তি সামলাচ্ছে। ক্ষিদেতেই কিংবা চোখে ধোঁয়া লাগার জন্যই হোক মেয়েটা চিৎকার করে কাঁদত। এই দৃশ্যের সঙ্গে সাহিত্যচক্রের কোন সম্পর্ক বা তুলনা চলে না। আমি আলোচনা চক্রে যাওয়া বন্ধ করলাম। এখন যদি কেউ বলে ওর জন্যই আমার সাহিত্য চর্চা গেছে, আমি আপত্তি করব না। পুরো সন্ধ্যা আমি ওকে কোলে নিয়ে শান্ত করে ওর সঙ্গে তামাশা করে অনেক দিন কাটিয়েছি। এখনও ওকে আমার কোলে নিতে ইচ্ছে করে, ওর সঙ্গে তামাশা করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এখন ও অনেক ভারি হয়েছে, আমার রঙ্গ তামাশা ওর কাছে এখন বড়ই পুরনো। ওর দেহ মনের সম্মুখে আমি দিনে দিনে বেশি অক্ষম, বেশি অপদার্থ হয়ে পড়ছি।

এই অবস্থায় আজ আমার একমাত্র আনন্দের কথা ওর একটি যুবার সঙ্গে মনের মিল ঘটেছে।

সুরভি নিঃশ্বাস ছাড়তেও ভুলে গিয়েছিল। তীব্র গতিতে ও অক্ষরগুলো গিলে চলছিল।

আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। এই দুর্বল শরীরে টো টো করে ঘুরে একটি পাত্র জোগাড় করার দুশ্চিন্তা থেকে ও আমাকে রেহাই দিয়েছে। নাই বা দেবে কেন। ও আমার কষ্ট বুঝতে পারা মেয়ে যে!

কিন্তু আমার সব দুশ্চিন্তার অবসান হয়নি। আমি তাকে ছেলেটার হাতে তুলে দোব কি ভাবে? আমার প্রথমা কন্যার বিবাহ। তার কপালের মধ্যিখানে একটা লাল টিপ থাকবে, সেই টিপের দু'পাশ দিয়ে দু'গাল বেয়ে ছোট ছোট টিপ নেমে যাবে; গলা, কান, হাত, কপাল সব জায়গায় সোনার মধ্যে থেকে অসংখ্য দামি পাথর জ্বলজ্বল করতে থাকবে। একসময় ও আমাকে প্রণাম করতে আসবে। কড়কড়ে কাপড়ের ভেতর থেকে হাতটা বার করতে অন্যদের সাহায্য করতে হবে। প্রণাম করতে গিয়ে ও আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে। ওর বিয়ে বলে আমিও একটা নতুন পাঞ্জাবি পরব। সেই জামার আস্তিনে আমি চোখের জল মুছব। সেই সময় দূরে ব্যান্ডপার্টির বাজনায় দুঃখের সুর শোনা যাবে।

এসব ভাবি ঠিকই। কিন্তু আমি জানি এসব ভেবে লাভ নেই। আমার বিয়েতেও ব্যান্ডপার্টি আনিয়েছিলাম। কিন্তু পরের দিনগুলোতে আমার মনে হয়েছিল যেন কেউ আমার জীবনের ছাল ছাড়িয়ে তাই দিয়ে একটা ঢোল বানিয়েছে, এবং অতি নিষ্ঠুর হাতে দিনে রাতে সেই ঢোল বাজিয়ে চলেছে। আজ থেকে তিন বছর আগে আড়াইশো টাকার কিস্তি দিয়ে আমি যে ধার থেকে মুক্ত হয়েছি তাতে একটা টাকা হলেও আমার বিয়ের ধার ঢুকেছিল। কি দরকার আমরা একজোড়া মানুষ আমাদের সংসার পাতবার দিন আমাদের ঘা হওয়া ঘাড়ে আজীবন জোড়া ধারের যোয়াল তুলে নেওয়ার? আমার বয়স্থা কন্যাটিকে সামনে রেখে আমার বিয়ের কথা ভেবে আজ আমার খুব বিরক্তিই হচ্ছে। অফিসের কেরানি বন্ধু এক কাপ চা খাওয়াতে বললে দশটা জোড়াতালি যুক্তি খাড়া করে মুখ ফেরাই, আর আমার বিয়েতে ধার করা টাকায় আমি পাঁচশ লোককে রসগোল্লা লুচি ভেজে খাওয়ালাম। আমি তো ওই টাকায় একটা জমি করতে পারতাম। একটা ঝুপড়ি তুলে আমরা একজোড়া প্রাণী নিজের ঘর বলে মাথা গুঁজে থাকতে পারতাম।

আর আমার আত্মীয় বন্ধুগণ আমাকে পনেরোটা সরা আর সাতটা পানের বাটা উপহার দিয়ে কেটে পড়ল। ওই সরায় আমি দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কাউকে আবাহন করার সুযোগ পাইনি। একটা বাটাও নিয়ম মত পান-তাম্বুলে সাজিয়ে রাখতে পারিনি।

মিথ্যে। এসব মিথ্যে। আজকাল এখানে ওখানে ফাটা ধুতি দুভাঁজ করে দুটো বড় গিঁট দিয়ে কোমরে বাঁধার সময় আমি সর্বদাই ভাবি — ঠিক, আমার বন্ধু হৃদয়ানন্দের কথাই ঠিক—ভুয়ো সাজ পরে জীবনের একটা সত্যি নাটকের অভিনয় করার কোন প্রয়োজন নেই। আমি বড় কষ্ট পেয়েছি। অবর্ণনীয় কষ্ট। আমার

সন্তানের এমন কষ্ট হতে দিতে আমি চাই না। আমি থিয়েটার করব না।

এইজন্যই আজ আমি আমার মেয়েকে কাছে বসিয়ে নিয়েছি। আমি লজ্জা পাচ্ছি না। একজন পিতা হিসেবে গোটা জীবনটাই ওদের সামনে এমন লজ্জিত হলাম, ওদের এত লজ্জা দিলাম, যে আজ আর আমার কোন লজ্জা নেই। হাতে কাগজ কলম তুলে দিয়ে তাকে আমি একটা চিঠি লিখতে বললাম— ওর মন দেওয়া নেওয়া করা ছেলেটিকে। চোখ বুজে নিয়ে আমি বললাম, আমি বলে যাচ্ছি তুই লিখে যা —

'পূজনীয় দাদা,

আমাদের বিয়ের কথা আপনি কি ভাবছেন আমি জানি না। আপনি বোধ করি খুব কষ্ট করে পয়সা জমাচ্ছেন। বিয়ের খরচের কথা ভেবে আপনি বোধহয় এরই মধ্যে অনেক শখ আহ্লাদ ত্যাগ করেছেন। মনের সাধ পূর্ণ করে বিয়ের ব্যবস্থার জন্য অনেক কিছু ভাবছেন। কিন্তু বিয়ের শখ পূরণ হওয়ার পর এখন আপনি যে সমস্ত শখ ত্যাগ করেছেন সে সব ফিরিয়ে আনতে পারবেন কি? আমার বাবা বলেন তার নাকি আজ পর্যন্ত শখ বাদ দিতেই গেল। এখন নাকি তার একটাই শখ বাকি, আমাদের বিয়েটা না দেখার সাধ।'

সুরভির বুকটা মোচড় খেল। সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল।

'বুঝলেন দাদা, একটা কথা বলতে আজ আর আমার একটুও লজ্জা নেই। কথাটা হল, আমার বাবার মত নিঃসম্বল, দুর্ভাগা প্রাণী পৃথিবীতে খুব কম আছে। এই কথাটা আপনার জেনে রাখা ভাল। আমার মা যখন কারুকার্য খচিত কাপড় পরে বাবার কাছে প্রথম এসেছিলেন, তখন বাবা মনে মনে ভয় পেয়েছিলেন, ভেবেছিলেন এই সুন্দর দামি কাপড় পরা মহিলাটিকে আমি কোথায় রাখব? কিন্তু ধীরে ধীরে মা'র হতদরিদ্র চেহারাটাই বেরিয়ে পড়েছিল। বাবাই মা'র সেই রূপ বার করে নিয়েছিলেন। এখনও মা কারুকার্যময় মেখলাটা পরেন; কিন্তু অন্য কাপড় ঠিক সময়ে শুকোয় না বলেই পরেন।

তার মানে দাঁড়ায় বাবা আমাকেও পর্যাপ্ত পরিমাণে দিতে পারেননি, না হলে মা আমার কাপড়টাই পরতে পারতেন। মাকে বুঝতে বাবার যেটুকু সময় লেগেছিল, আমি আপনার জন্য সেই সময়টা কমিয়ে রাখলাম। একটা পরিচিতি আজই দিয়ে রাখলাম। থিয়েটারের ড্রেসের মত সাজ করে একদিন আপনার সামনে দাঁড়ানোর জন্যে খরচের তামাশা না করলেই কি নয়?

শুনুন দাদা, আজ বাবা আমার সামনে চোখের জল ফেলেছেন। আসলে কোন মেয়েই বাবার চোখের জল সইতে পারে না। বাবা বলেছেন, মা তোকে পরের ঘরে পাঠানোর জন্য আমি নিশ্চয়ই কিছু পয়সার জোগাড় করেছি, কিন্তু সে কটা পয়সা আমি কেন লোককে রসগোল্লা খাইয়ে নষ্ট করি বল? তার থেকে ভাব একদিন আমারা এই বুড়োবুড়ি দুজন যদি তোদের বাড়ি যাই এবং তোরা যদি তখন আমাদের ধার না

করা পয়সায় দুটো রসগোল্লা খাওয়াতে পারিস, আমরা কত খুশি হব!

দাদা, রসগোল্লা খাওয়ানো বিয়ের আয়োজন করতে তো বাবা চানই না, উপরন্তু একজন রেজিস্ট্রার ডেকে একটা কাগজে সই করার কথাও তিনি ভাবেন না। কারণ আমাদের মনের চাইতে কোন হাকিমের কাগজই বড় নয়। এমন কি আমরা যদি সুখী হব ভেবে থাকি তবে আপনার কাছে পালিয়ে গেলেও বাবা কিছু মনে করবেন না। কারণ আমি সুখী হব এই গ্যারান্টি দিয়ে বাবাও কোন পাত্র খুঁজে বার করতে পারেন না। আর দ্বিতীয় কথা, লোকেরা রসগোল্লার স্বাদ আর আমার পলায়নের কাহিনী — এই দুটো একই সময়কালে ভুলে যাবে।

তাহলে দাদা, আমাকে পার করার জন্য বাবা যে কটা পয়সার জোগাড় করেছেন, আমাকে গ্রহণ করার জন্য আপনি যা কিছু জমিয়েছেন সেই দুটো একসঙ্গে জুড়ে আমরা একটা সংসার পাতি না কেন? আমাদের দুজনের বিয়ে, তাহলে অযথা একটা থিয়েটার করে নিঃসম্বল, পঙ্গু হই কেন?

এই কথা কয়টা বলার জন্যই এই চিঠি লেখা? আমি একদিন বেড়ানোর ছল করে বেরিয়ে যাব। বাবা এবং মা আমাকে হৃদয় উজাড় করে আশীর্বাদ করবেন। আপনাকেও করবেন। তারপর আপনার সঙ্গে আমি এক অতি দীর্ঘ সুন্দর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ব। এর চাইতে বেশি হুলুস্থুল করে আমরা যেন আমাদের যাত্রার শান্তি নষ্ট না করি।

আপনি যদি আমাকে ভালবেসে থাকেন তাহলে আপনি আমার এ কথাটা রাখবেন। আমাদের ভবিষ্যৎকে, আমার জরাজীর্ণ দেহ মনের বাবাকে রেহাই দিতে এ কাজটা আপনি আশা করি করবেন। এই আমার মিনতি। আমাকে নিয়ে যেতে একদিন আসবেন।'

খুব ধীরে ধীরে চিঠির শ্রুতলিপিটা দিলাম। আমার মেয়েটা মাথা নিচু করে লিখে গিয়েছিল। মাঝে কাগজের ওপর টপটপ করে তার চোখের জল পড়েছে। শেষে আমি তাকে বললাম, 'নে হয়েছে। দে এখন সইটা দে। শুনছিস মামনি? সইটা দে। দে।'

গল্পটা শেষ হল। সুরভি অনেকক্ষণ অনড় হয়ে বসে রইল। এক সময় সে মুগারঙের কাগজের দিস্তাটা নিজের দিকে টেনে নিল। আস্তে আস্তে, গোটা গোটা অক্ষরে সে গল্পটা নয়— কেবল শেষের চিঠিটা কপি করল। মাঝে কাগজের ওপর টপটপ করে তার চোখের জল পড়ল। কপি হয়ে যাওয়ার পর ও বাবার গল্পটার শেষ পংক্তিতে আবার চোখ বোলাল। 'দে এখন, সইটা দে। শুনছিস মামনি? সইটা দে। দে।'

সুরভি চিঠির শেষে সইটা দিল। পরের দিন প্রমোদের নামে চিঠিটা ডাকে দিল।

সমাধি

পুবে মাংসের দোকানের মোড়টা আর পশ্চিমে মদের ভাটি, এর মাঝখানের অঞ্চলটার রাস্তায় দীনের ডিউটি পড়েছিল। রাস্তার ধার দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সে একবার মাংসের দোকানের কাছে গেল এবং একবার ফিরে মদের ভাটিতে পৌঁছল, কিন্তু বেশির ভাগটা সময় সে মাঝের পুজামণ্ডপের কাছেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটাল। পূজামণ্ডপের কাছে বাস স্ট্যান্ড। বিভিন্ন চেহারার, বিভিন্ন রঙের, বিভিন্ন নামের বাসগুলোর যাত্রা স্ট্যান্ডটার আশপাশ থেকে সময় সময় আরম্ভ হচ্ছে, সময় সময় শেষ হচ্ছে। আধঘণ্টা আগে যদি কদমতলা থেকে মা শীতলা নামের বাসটা এসে দাঁড়ায়, আধঘণ্টা পরে ভাগ্যলক্ষ্মী নামের বাসটা পলাশনির দিকে যাত্রা করে। ইতিমধ্যে হয়তো দীপক নামের বাসটার হ্যাণ্ডিম্যান কুরুয়াধরা পর্যন্ত গোটা রাস্তাটার পাশে পাশে থাকা গ্রামগুলোর নাম চিৎকার করে মুখস্থ বলে যাচ্ছে। এই স্ট্যান্ডে সাধারণত সারাদিনে চারটে মাত্র বাসের যাত্রা আরম্ভ এবং শেষ হয়। তার বাইরে শহরটায় যে কটা বাস থাকে, সে কটার হ্যাণ্ডিম্যানরা বাসগুলোকে কাছের যখিনীমরা নামের নদীটার পাড়ে নিয়ে যায় এবং ওপর নিচ ভাল করে ধোয়। এই ছ'দিন পূজো বলে স্ট্যান্ডটার চাঞ্চল্য বড় বেশি রকম বেড়ে গেছে; যখিনীমরার পাড়ে কোন বাস যাচ্ছে না। প্রত্যেকটা বাসই অসুস্থতা-জড়তা-বার্ধক্য ত্যাগ করে চারদিকের গ্রামগুলোর সঙ্গে শহরটার একটা উৎসবসূচক যোগাযোগ রক্ষা করছে।

প্রত্যেকটা বাস স্ট্যান্ডের কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গে দীন পুজামণ্ডপ থেকে একটু এগিয়ে এসে যাত্রীদের লক্ষ্য করছে। শহরটার চারদিক ঘিরে পনের কুড়ি মাইল ধরে এই অঞ্চলটাতে জনমজুর জাতীয় লোক এবং চা-বাগানের মজুরদের সংখ্যা অনেক; আর শহরের পুজো দেখার আকাঙ্ক্ষা এদেরই বেশি; ফলে বাস থেকে মূলত ওরাই দলে দলে নামল। রঙিন রেশমি শাড়ি পরা, মুখে তেল ঘসে চকচকে হয়ে, আঁটো শরীরের কালো কালো যুবতীর দল, কোলে-পিঠে বোঁচকা করে

বাচ্চা ঝুলিয়ে মাঝবয়সী স্ত্রীলোক, পাট করা চুলে সোজা সিঁথি কেটে গলায় রুমাল বেঁধে মুরুব্বী চালে আসা যুবক, 'আগের কালের সেই পুজো আর কোথায় দেখতে পাবি?' বলে যুগপৎ আক্ষেপ এবং বাহাদুরি ফলানো বৃদ্ধ ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের যাত্রী। এদের মধ্যে লখিমী এবং হরুমাও আছে কিনা সেটাই দীন প্রত্যেকটি বাস আসার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করছিল, এবং ওদের দেখতে না পেয়ে হতাশও হল, আবার আশ্বস্তও হল। আরেকটা বাস না আসা পর্যন্ত সে মাংসের দোকানের মোড় থেকে মদের ভাটি পর্যন্ত অঞ্চলটুকুতে পায়চারি করল এবং তারপরে পূজামণ্ডপে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় কাটিয়ে দিল। সে না থাকা কালীনই হয়তো একটা বাস এসে গেল এবং তাতে লখিমী এবং হরুমাও থাকতে পারে ভেবে প্রতিবারই ফিরে এসে স্ট্যান্ডটার আশপাশ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল, না ওরা আসেনি।

দীনের খুব বিরক্তি লাগছিল। এমনিতে সে হেঁজি পেঁজি গরমকে পরোয়াই করে না, তায় আবার আজ তেমন গরমও নেই। তবু তার বারে বারে হাঁটা বন্ধ করে পূজামণ্ডপের ছায়ায় বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল। বগলে ঝুলিয়ে রাখা হুইসেলটার পাশ দিয়ে ঘামে খাকী রঙের জামাটা ভিজে গেছে। বারদুয়েক খুলে সে দেখেছে টুপিটার তেলচিটে পড়া ভেতরের দিকটা ভিজে গেছে। মনে হল পায়ের পট্টি, জুতো, কোমরের বেল্ট— সব খুলে একেবারে মুক্ত হয়ে টুপিটা দিয়ে হাওয়া খায়।

অন্যদিনের মত রাস্তার পাশের দোকানির সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে দু-একটা খিলিপান খেয়ে ফুর্তি করে ডিউটিও করতে পারছে না। সামান্য কথাতেই তার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে, মেজাজ খিটখিটে হয়ে পড়ছে। হঠাৎই একটা রিক্‌শাওয়ালা চিৎকার করে ঝগড়া জুড়ে দিল, দীন এগিয়ে গেল; কি হয়েছে? হয়েছে মানে— শক্তিধারিণী শ্রীশ্রীদূর্গাপূজা উপলক্ষে অল্প চোলাই খেয়ে শক্তি সঞ্চয় করে পূজো দেখতে আসা দুটো বাগানের পশ্চিমালোক রিক্‌শায় উঠে গোটা শহরটা ঘুরেছে, এখন নামার সময় রিক্‌শাওয়ালা ভাড়া চেয়েছে দেড়টাকা, আর লোক দুটো দিতে চাইছে চার আনা। রিক্‌শাওয়ালার মতে, ওরা দেড় ঘণ্টা ধরে রিক্‌শা থেকে নামেইনি আর লোক দুটোর বক্তব্য ওরা ইহজীবনে মোটমাট বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের বেশি রিক্‌শাই চড়েনি। দীন লোক দুটোকে এমন এক ধমক দিল যে তাদের নেশা কেটে যাওয়ার পক্ষে তা যথেষ্ট এবং ওদের একটাকা দিতে বাধ্য করল; টাকাটা দিয়ে 'গোটা দুনিয়াটাই বেইমান' জাতীয় কিছু একটা বিড় বিড় করতে করতে লোক দুটো কেটে পড়ল। ঘটনাটা ওখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু হল না। দীন রিক্সাওয়ালাটাকে 'আগে ভাড়া ঠিক না করে প্যাসেঞ্জার ওঠাস কেন' বলে ছোট লাঠিটা কয়েকবারই ওর নাকের সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে আনল, একবার তো ওর হাতে একটা গুঁতোই দিল। তারপর চলে যাওয়া রিক্‌শাটার পিছনে দুম করে একটা লাঠির বাড়ি দিয়ে বলল, 'যা ভাগ্।'

দীনের আসলে আজকে ডিউটিই ছিল না। পনের দিন আগে সে ওপরওয়ালাকে অনুরোধ করে রেখেছিল এবার যেন পূজোর কদিনে একদিন সে ছুটি পায়। অগত্যা যদি পাওয়া না যায় তবে যেন তার ডিউটি রাতে পড়ে। মায়ের অসুখ, আধির জমির গণ্ডগোল সামলানো, বোন হরুমাওর জন্য একটা ছেলে দেখতে যাওয়া আর মাঝে মাঝে যে ঠিক লখিমীকে দেখতে যাওয়ার জন্য তা নয় এমনিই ঘরে যাওয়া, এ সমস্ত ঝামেলায় তার প্রাপ্য ছুটি শেষ; না হলে সে ওপরওয়ালাকে ডিউটি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অনুরোধ করত না। অনেক নিচে থেকে প্রমোশন পেয়ে পেয়ে ওপরে ওঠা ওপরওয়ালাটি ভয়ঙ্কর কড়া লোক; সিপাহির ডিউটির এদিক ওদিক হওয়া আর এ পায়ের জুতো ও পায়ে পরা তার কাছে এক কথা, সম্ভব হলেও অনিয়ম, অশোভন। তবু তিনি কথা দিয়েছিলেন, ঠিক আছে, একদিন না হয় দিনের বেলাটা দীনকে রেহাই দেওয়া হবে। কিন্তু যে কোন একদিন হলেই তো হয় না, ঠিক কোন্ দিন সে অবসর পাবে সেটা জানা দীনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কারণ তবেই সে আগাম বন্দোবস্তগুলো করতে পারবে। শেষে ঠিক হয়েছিল — নবমী পূজোর দিন রাত দশটা পর্যন্ত তার ডিউটি থাকবে না। এ বন্দোবস্ত হওয়ার পরদিনই সে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে ঠিক করে এল নবমীর দিন দুপুরবেলা লখিমী আর হরুমাও শহরে গিয়ে পৌছবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সে তাদের শহরের সব পূজো দেখাবে, তারপর নিজে সন্ধ্যাবেলায় ওদের বাড়িতে পৌঁছে দেবে, ফিরে এসে যদি দরকার পড়ে তো রাত্রে ডিউটি দেবে। এইটুকু যাতায়াতে তাদের কোন অসুবিধা হবে না, কারণ পূজোর কদিন ওদের গ্রামের রাস্তায় মাঝরাত অবধি লোক চলাচল করে।

হরুমাও অবশ্য একটা অসুবিধার কথা বলেছিল, একেবারে সঙ্গে কাউকে না নিয়ে দুজন মেয়ে একা একা টাউনে যাওয়া —

'না না সে আবার কি কথা? দিনেদুপুরে মাত্র বিশ মাইল রাস্তা, ওই তো ওখানে বাসে উঠে বসবি, আর একবারে টাউনে গিয়ে নামবি, আর ওখানে তো বাসস্ট্যান্ডে আমি থাকবই।' দীন শহর আর ওদের গ্রামটাকে জানালা দেওয়া একটা বেড়ার এপার ওপারের মত মনে করে কথাটা উড়িয়ে দিল।

ফেরার পথে দীনের মনে একটা অস্বস্তি দানা বেঁধেছিল, কি জানি লখিমী যদি আবার কোন অসুবিধার কথা বলে, এ ব্যাপারে একবার বোনকে একটু জিগ্যেস করবে নাকি? কিন্তু জিগ্যেস করল না। বারে বারে বোনের সামনে লখিমীর নামটা উচ্চারণ করতে তার লজ্জা হল। উপরন্তু সে জানে হরুমাও বললে, বিশেষ করে ব্যবস্থাটা ওর করা শুনলে লখিমী আপত্তি করবে না।

লখিমীর সামনে আজকাল সত্যিই দীনের বড় লজ্জা হয়। মুখোমুখি হলে একটা দুটো কথা বলতে ওর কোন অসুবিধা হয় না, দুর্দান্ত সাহসী সেপাই, কত মহিলা,

যুবতী মেয়েকে সে আফিং বেচা, গয়না চুরি করা, ভেতর থেকে দরজা খুলে দিয়ে চোর ঢোকানোর কথা স্বীকার করাতে দাবড়ে কাঁদিয়ে ছেড়েছে, তবু একটা কথা জিজ্ঞাসা করার পর লখিমী যে রকম করতে থাকে, দীন লজ্জা পেয়ে যায়, দ্বিতীয়বার কথা বলতে গিয়ে তোতলাতে থাকে। একবার শহুরে বন্ধুর কাছে শেখা রসিকতা করে সে সাত বছরের লখিমীর ফ্রকের ছেঁড়া জায়গায় আঙুল দেখিয়ে ঠাট্টা করেছিল, 'কি রে, বাতাস লাগানোর জন্য বুঝি মা ফ্রকে জানলা লাগিয়ে দিয়েছে?' সেবার লখিমী ঝটিতি ঘুরে গিয়ে ফাটা জায়গাটা দীনের চোখের আড়াল করেছিল।

কিন্তু এখনও লখিমী দীনের মুখোমুখি হলে, গোটা শরীরটাকে ঢাকার জন্য চাদরটা এমন টানাটানি করে, মনে হয় যেন ছিঁড়েই ফেলবে। ওর মনে হয় যেন সবার জন্য বোনা চাদরটা কেবল ওর গায়েই ছোট হয়ে যায়। দীনের ঠাট্টার সেই জানালাটা এখন লখিমীর মনে সর্বদাই খোলা থাকে, তাই দীনকে দেখলেই ও লজ্জায় রাঙা হয়ে বোবা হয়ে যায়।

লখিমীর বাবা-মা মারা গেছে, ও ওর ঠাকুমার সঙ্গে থাকে, দূর সম্পর্কের এক মামা লখিমীদের জমিটা দেখাশোনা করে, দেখাশোনা করে অর্থে বছরের চাল-ডালটা যোগায়, আর বাকিটা নিজে হজম করে। লখিমীর কোথাও বিয়ে হলে, বুড়ি বিদায় নিলে, চাল-ডাল যোগানোর ল্যাঠা চুকে যাবে, মামা সেদিনটির অপেক্ষায়। দীনের সঙ্গে লখিমীর কথাবার্তা চলার মত একটা কিছু হচ্ছে খবর পেয়েই একদিন তিনি ব্যস্ত অভিভাবকের মত একেবারে শহরে সোজা থানা অবধি দৌড়ে এসেছিলেন; দীনকে জিগ্যেস করেছিলেন, 'তবে আর শুভ কাজে দেরি করে লাভ কি?'

দীন সসম্ভ্রমে জানিয়েছিল, অন্য আর কিছু নয়, কেবল বোনের একটা ব্যবস্থা আগে করতে পারলে ভাল হয়। মামা 'নিশ্চয় নিশ্চয়' বলে খুব মাথা নেড়ে গেলেন, এবং ফিরে গিয়ে আর উচ্চবাচ্য করলেন না।

এর বাইরে লখিমীর আর কোন অভিভাবক নেই। হরুমাও বেশি সময় ওর সঙ্গেই থাকে, হরুমাওর মা-ও সর্বদাই বুড়ির খবরাখবর নেন। বুড়ি মাঝে মধ্যে লখিমীকে উপদেশ দেন, 'এখন ওর সঙ্গে বেশি মেলামেশা করিস না, গাঁয়ের লোকজন খারাপ বলবে।'

গাঁয়ের লোকজন অবশ্য দীনকে খুব ভাল চোখেই দেখে, ওকে বেশী মেলামেশা যদি করতেও দেখে কেউ কিছুই ভাববে না। এই আজ যে ওরা শহরে যাবে, যাওয়ার সময় বুড়ি একবার বলবে, 'দিন থাকতে ফিরে আসিস' আর বাসে ওঠার সময় মাঝবয়সী দু-একজন বলবে, 'যাচ্ছিস যা, তাই বলে আবার ওখানে থেকে যাস না। আর আসার সময় আমাদের জন্য মিষ্টি-ফিষ্টি নিয়ে আসিস।' এ জাতীয় দু-একটা কথার বাইরে আর কিছু বলে না।

এই সুবিধাটুকু আছে বলেই অনেক দিন থেকে দীনের মনে একটা শখ বাসা বেঁধেছে, যদি কোন এক উৎসবের দিনে লখিমীকে সারা শহরটা একবার ঘুরিয়ে দেখাতে পারত। এই শহরে কোথাও একটা দেখার জিনিস দেখলেই ওর লখিমীর কথা মনে পড়ে, ইস্ ওকে যদি একবার কোনভাবে এটা দেখানো যেত। শহরে সভা-সমিতি, তিথি-উৎসব কিছু একটা হলেই লাঠি নিয়ে কেবল গণ্ডগোলের গন্ধ খুঁজে বেড়ানো বড় কর্কশ ব্যাপার। তার মধ্যে একা একা লোকেদের রঙ্গতামাশা দেখতে আরও খারাপ লাগে। ডিউটি না করে ঘরে বসে থাকাটা আরও বিরক্তিকর। ঘর বলতে তো ঐ একটা লম্বা চওড়া কামরা, তাতে গায়ে গা লাগিয়ে ফেলে রাখা দশখানা কাঠের তক্তপোশ। রাত্রে গোটা পাঁচেক লোক শোয় আর বাকি কটা খালি পড়ে থাকে। কামরাটার চারপাশে জঞ্জাল, মশারির দড়ি, কাপড় রাখার দড়ি, বেল্ট রাখার দড়ি, টুপি রাখার গজাল। তাছাড়াও সময়ে সময়ে তাসের টুয়েন্টিনাইন। বিড়ির গন্ধ, মারপিট, চুরি ডাকাতির তাজা খবর, নতুন শিক্ষার্থীর বাঁশির প্যানপ্যানানি, প্রত্যেকটি তক্তার জোড়ায় অসংখ্য ছারপোকার দুর্বিসহ অত্যাচার। বাইরে দুর্গাপূজা চললে ঘরের মধ্যে এসব সহ্য করা দীনের পক্ষে বড় কষ্টকর। প্রায়ই সে ভাবে এমন একটা দিনে যদি লখিমী আসে, আর সেদিনটা যদি তার ডিউটি না থাকে।

এবার সে ঠিক এ ব্যাপারটাই করতে চেয়েছে। ওর ডিউটি থাকবে না, লখিমীরা আসবে, ওরা ধীরে-সুস্থে ঘুরে ঘুরে পূজো দেখবে, হোটেলে চা খাবে, ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমা দেখবে, দু-একটা শখের জিনিস কেনাকাটা করবে, আর পরে যদি দেখে লখিমীর লজ্জা ভেঙেছে, তাহলে দুজনের একটা ছবি তুলবে। এর জন্য দীন পয়সা জোগাড় করে রেখেছিল, খাকী প্যান্টে কেমন একটা ডিউটি ডিউটি ছাপ থেকেই যায় দেখে সে ধোপার কাছ থেকে সাদা প্যান্টটা ধুইয়ে এনে রেখেছে। এমন কি লংপ্যান্টটার হুকের কাছের দাগটা তুলতে পারেনি দেখে ধোপাকে দুটো ধমকও দিয়েছে। ধোপাও জংয়ের দাগ কি করে যাবে বলে তাকে উল্টে কথা শুনিয়েছিল।

কিন্তু হল না। কাছের একটা গ্রামে কোন এক ভ্রাম্যমান সিনেমা কোম্পানি পূজোর কটা দিন সিনেমা দেখাতে এসেছিল, কাল অষ্টমী পূজোর রাতে সেখানে মারপিট হল, মারপিটের আগুন রাতেই নিভল, কিন্তু কিছু বদমাশ লোক নাকি তাকে উসকে দেওয়ার ধান্দায় আছে, অতএব ওই অঞ্চলে কয়েক দিনের জন্য কিছু সেপাই মোতায়েন করতে হল, ফলে শহরে সেপাইয়ের সংখ্যা কমে গেল এবং দীনের ডিউটি পড়ল।

দীন খবরটা শুনেই ওপরওয়ালার কাছে দৌড়ল, গিয়ে অনেক কাউমাউ করল, তিনি জানালেন, অন্য এক ওপরওয়ালা দীনকেও ওই গাঁয়েই পাঠাতে চেয়েছিলেন, তিনিই বুদ্ধি করে তাকে শহরের ডিউটিতে রেখেছেন। তার উপর পূজোর কদিন

এমার্জেন্সী। ফলে দীন পূবে মাংসের দোকানের মোড় এবং পশ্চিমে মদের ভাটির মাঝখানের অঞ্চলটুকুতে ডিউটি করে চলেছে। আর মাঝে মাঝে অস্থির ভাবে পূজোর মণ্ডপে ফিরে এসে, যাত্রীদের মধ্যে লখিমী আর হরুমাওকে খুঁজে চলেছে। পূজোমণ্ডপের কাছেই বেশি গণ্ডগোল, এই স্বকল্পিত যুক্তির আশ্রয় নিয়ে এদিকেই বেশি ঘোরাঘুরি করার সুযোগ নিচ্ছে। প্রতিটি বাসে যখন খুঁজে লখিমীদের দেখছে না তখন হতাশ, আবার আশ্বস্ত হয়ে ভাবছে আজকে না এলেই ভাল, কোন কারণে যদি না আসতে পারে তাহলে ভালই হয়। ওরা এসে পড়লে ও কি করবে? ওর ডিউটি কখন শেষ হবে? তারপরেও লখিমীদের দেখানোর জন্য পূজো থাকবে নাকি? আবার ওদের রেখেও আসতে হবে। না না, দরকার নেই, ওদের আজ আসার দরকার নেই।

কিন্তু পরমুহূর্তেই দীনের মনটা বিষাদে ভরে গেল। নিজেকে বড় অসহায় মনে হল তার। আজকের এই দিনটার জন্য সে বড় আশা করেছিল। তার সাদা প্যান্টের ভাঁজ না ভেঙে এখনও স্যুটকেসে তোলা আছে; এই বুকপকেটে দেড়কুড়ি টাকা জমা আছে। ফটোর দোকানে একটা ফটো তুলতে দশটাকা লাগবে বলে ও জেনেছে, বানোয়ারীলালের দোকান আজ খোলা থাকবে সে খবরটাও ওর নেওয়া আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা আজ লখিমীর মুখের দিকে অনেকটা সময় ধরে তাকিয়ে থাকার একটা সুযোগ হবে বলে ওর আশা আছে; এই শহরটাকে আরেকবার আজ নতুন করে দেখতে ওর বড় সাধ।

দীন ধীরে ধীরে মদের ভাটির দিকে এগিয়ে গেল। মদের ভাটির দিক থেকে ফিরতে গিয়েই তার মনে হল পিছন দিক থেকে একটা বাস আসছে। বাসটা ওকে পেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে ও একবার মুখ তুলে দেখল আর দেখতেই দেখে জানালার কাছে লখিমী। বাসটা দ্রুত পার হয়ে গেল। দীনের শরীরটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল, ওর হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেল, তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে হুইস্‌ল্‌টা বার করে যত জোরে পারল ফুঁ দিল। বাসটা একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এরকম পূজোকাটালের দিনে বাসগুলো নানা রকমের অপরাধ করে থাকে একথা বাসের ড্রাইভার হ্যাণ্ডিম্যান ভালই জানে, এই জন্য ওরা একটু থতমত খেল, কি জানি আবার কি ল্যাঠা লাগল। যাত্রীতে ঠাসাঠাসি বাসটার পিছনের দরজায় কোন মতে দাঁড়িয়ে নিয়ে দীন ভাবল, বাসটা দাঁড় করানোর ও কি কারণ দেখাবে? ও প্রথমে গম্ভীর ভাবে হ্যাণ্ডিম্যানকে বাসটা চালাতে বলল, তারপর চারদিকে এমন ভাবে তাকাতে থাকল যেন ও কোন একটা পলাতক আসামীকে কেবল এই বাসটাতেই নয় প্রত্যেকটা বাসেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের ভীড় পার করে ওর হরুমাওদের কাছে যেতে খুব ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ইচ্ছেটাকে ও জোর করেই দমন করল।

বাসস্ট্যান্ডে নেমেই লখিমী একবার লাজুক দৃষ্টিতে দীনের দিকে তাকিয়ে হাসল। দীন ওকে একবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল। মাস দুয়েক আগে দীনের দেওয়া সিল্কের চাদরটা ও পরে এসেছে। শহরের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন ওর চেহারার একটা খোলতাই এসেছে। ওর গাল, বাহু, হাতের গোছা—মোট কথা সমস্ত দেহ জুড়েই একটা ভরভরন্ত ভাব, ওর মুখের ফর্সা রঙটা কবেই যেন পড়ন্ত সূর্যের রঙ মেখে নিয়েছে, এসব ও এতদিন খেয়ালই করেনি।

হরুমাওরা এসে পড়ামাত্র দীন ওর দুঃখের কথা শোনাবে বলে ভেবেছিল, কিন্তু লখিমীর দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ ফেরানোর মুহূর্তে হরুমাওর চোখে চোখ পড়ে যাওয়াতে হকচকিয়ে জিগ্যেস করল, 'তোদের এত দেরি হল কেন? দাঁড়িয়েই আছি, দাঁড়িয়েই আছি। পরে ভাবলাম তোরা আর আসবিই না।'

হরুমাও উত্তর দিল বাসে সিটই পাওয়া যাচ্ছিল না, ওরাও ভেবেছিল ওরা বোধ করি আর আসতে পারবে না।

'আয়' বলে দীন ওদের রাস্তার ধার দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল। কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে? দীনের মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। এমন সময় হরুমাও জিগ্যেস করল, 'তোর কি এখন ডিউটি আছে?'

'আর বলিস না' দীনের মুখে চোখে বিরক্তি ফুটে উঠল। গায়ের খাকী জামাটা ওর কাছে যেন কাঁচা বাঘের ছালের মত কুৎসিৎ দুর্গন্ধময় মনে হল, কোমরের বেল্ট, হুইসেলের ফিতে, মনে হল যেন লোহার শেকল। মাথার টুপিটা অসহ্য ভারি মনে হল। ও বলল, 'এই গুণ্ডা বদমাশগুলোর জ্বালায় আর শান্তি নেই। কোথায় কে মারপিট করল আর এদিকে আমার ছুটিটা মারা গেল।'

গুণ্ডা বদমাশের কথা শুনে হরুমাও এবং লখিমী দুজনেই দীনের মুখের দিকে তাকাল, গুণ্ডা বদমাশ তো দূরের কথা সাধারণ ঝগড়া-ঝাটিতেই ওরা ভয় পায়। লখিমীর আবার রক্তের নাম শুনলেই মাথা ঘোরে। হরুমাও জানতে চাইল, 'কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?'

দীন কথাটা উড়িয়ে দিল।

'তোর ডিউটি কখন শেষ হবে?' হরুমাও জিগ্যেস করল?

'কি জানি! কিছুই জানি না। নিয়মমতে ছটার সময় শেষ হওয়া উচিত।' বিরক্তিতে দীনের ভেতরটা বোতলে জিয়োনো মাছের মত ওঠানামা করছিল।

লখিমী নিচু গলায় হরুমাওকে কিছু একটা বলল, হরুমাও 'ঠিক' বলে মাথা নাড়ল। লখিমী এপর্যন্ত কোন কথাই বলেনি, তাই দীন সাগ্রহে জিগ্যেস করল, 'কি হল?'

'কিছু হয়নি, ও বলছে আজকে আমরা না এলেই ভাল হত।'

দীন ত্রস্ত হয়ে বলল, 'না না, তাতে কি হয়েছে? আমার এখানেই ডিউটি, আর

ডিউটি মানে তো রাস্তায় রাস্তায় পূজো দেখে ঘুরে বেড়ানো; কোন অসুবিধা হবে না। আয়।'

'দাঁড়া! আমরা এত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারি নাকি?' হুকুমাও অভিযোগ করে।

দীন থমকাল। সে খুব জোরে হাঁটেনি, তবুও অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। পায়ে পা মিলিয়ে সে অনেক হেঁটেছে, কিন্তু তাই বলে লখিমীদের মত পায়ের চালের সঙ্গে পা মেলানোর অভ্যাস তার কোন দিনই নেই। তার একবার লখিমীর পায়ের দিকে নজর গেল। শহুরে মেয়েদের ধীর, হাল্কা, আলগোছ চলা সে অনেক দেখে থাকে, সেই একই রকম চলা। ওর মনটা হঠাৎই একধরনের প্রসন্নতা এবং সন্তুষ্টিতে ভরে উঠল, কেবল নিজের ভারি বুটজুতোর কর্কশ আওয়াজে সে বড় বিব্রত বোধ করতে থাকল।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা পূজামণ্ডপের কাছাকাছি এসে পড়েছে, এমন সময় দীনের সঙ্গে একটু বেশি খাতির রাখা চালানী আমের ব্যবসায়ীটি সেই মনোহর প্রসাদ রাস্তার ওপার থেকে আধা ইঙ্গিতে ইশারায় দীনকে ডাকল। দীন দাঁড়াল, লখিমীরা এগিয়ে গেল। রাস্তার ওপারে মনোহর প্রসাদ গোপন কথা জানার মত করে জিগ্যেস করল, 'কি হল?'

প্রত্যুত্তরে দীন জিগ্যেস করল, 'কোথায় কি হল?'

মনোহর প্রসাদ চোখের ইঙ্গিতে লখিমীদের দেখাল।

পলকে দীনের মাথায় একটা রক্তের ঢেউ এসে যেন ধাক্কা দিল; ও মনোহর প্রসাদের কথা সম্পূর্ণ হতে না দিয়ে বলে উঠল, 'এ আমার বোন এবং ঐ মেয়েটি ওর বন্ধু। আমাদেরই গ্রামের।'

মনোহর প্রসাদ তক্ষুনি আশ্রমিক কন্যাদের তত্ত্বাবধানে থাকা, বৃদ্ধ ঋষির মত সৌম্যমূর্তি ধারণ করল, ছাঁচি পান, কিমাম আর জর্দার দৌলতে রক্তাক্ত দাঁতগুলো বার করে সে একবার হো হো করে হাসল এবং তারপরে বলল, 'পূজো দেখতে এসেছে? দেখাও দেখাও। আমাদের ওদিকে বড়বাজারের কাছে একটা বড় পূজো হচ্ছে দেখেছ তো; ওদিকেও নিয়ে যেও একবার।'

দীন গম্ভীর মুখে হাঁটা দিল।

দীনরা সাধারণত গণ্ডগোলে লিপ্ত থাকা লোকেদের পিছু ধরে প্রায়ই থানায় পৌঁছয়। এ জাতীয় পূজো-পাজার দিনে গাঁ-গঞ্জ থেকে আসা অভিভাবকহীন মেয়েরা বিপদে পড়ে; আর এদের ত্রাণকর্তা রূপে কিছু লোক তো আছেই, শহরের চারদিকে অনবরত ঘুরঘুর করে বেড়ায়।

পূজোটা পার হোক, তারপর ওকে একবার ধরতে হবে — দীন মনোহর প্রসাদের নামে দাঁতে দাঁত ঘসল।

কোথাও একটা মোটর সাইকেলের ভট্-ভট্ শুনে দীন কান খাড়া করল। নাহ্,

এটা অন্য থানার ও সি-র। ওদের থানায় একটা মোটরবাইক আছে। ওটার শব্দ ও চেনে।

সে লখিমীদের প্রায় ধরে ফেলেছিল, কিন্তু ঠিক তখনই তার পায়ের গতি কমে গেল। এভাবে লখিমীদের সঙ্গে সঙ্গে চলার অন্য একটা অসুবিধাও আছে। কোনও কারণে যদি তার ওপরওয়ালা কেউ এদিকে আসে। বিশেষ করে ঐ তিওয়ারি! সাতশ মাইল দূরে পুত্র কন্যা রেখে কেবল পোস্টকার্ড, মনিঅর্ডারের ওপর ভরসা করে মহাসুখে বছরের পর বছর চাকরি করে যাচ্ছে; ও যদি লখিমীদের সঙ্গে নিয়ে দীনকে ডিউটি করতে দেখে তবে কি আর এমনিই ছেড়ে দেবে?

আগে আগে যাওয়া লখিমীদের দিকে দীন করুণ দৃষ্টিতে তাকাল। চলার ছন্দে যেন ওর গোটা শরীরটাই নাচছে। ওর কিনে দেওয়া চাদরটা ঐ নাচের তালে তাল দিচ্ছে যেন। দীনের ইচ্ছে হল ও লখিমীর পিঠে, চাদরে হাত বোলায়। ও লখিমীদের সঙ্গ ধরতে জোরে পা চালাল। যা হয় হবে। ও বেড়াবে এবং ডিউটিও করবে। তারপর সন্ধেবেলায় ডিউটি শেষ হলে ওদের বাড়িতে রেখে আসবে। কিন্তু মাংসের দোকান আর মদের ভাটি, এর মধ্যে বেড়ানো!

একটু আমতা আমতা করে মিনমিনে গলায় লখিমীকে উদ্দেশ্য করে হরুমাওকে দীন বলল, 'আসল টাউন বলতে গেলে এ জায়গাটাই বুঝলি? ভাল ভাল দোকানপাট যা কিছু সব এখানটাতেই। ওদিকে আরও একটা রাস্তা আছে, ওদিকটায় কাছারি, সিনেমা হল, আমাদের থানা, এই সমস্ত, বড় হুলুস্থুল এমনিতেই; এই জন্য পূজোর এ কয়টা দিন ভদ্রলোকরা ওদিকটায় যাতায়াত ছেড়ে দিয়েছে।'

শহরটা ছোট অবশ্যই; কিন্তু দীন যেমন বলল, অত ছোট নয়। কথাগুলো বলে দীনের নিজেরই খুব খারাপ লাগল। কোন কারণে যদি এই মুহূর্তে ইমার্জেন্সি শেষ হয়ে যায়; এই মুহূর্তে যদি গাঁ থেকে সেপাইরা ফিরে আসে; আর তারই একজন সেপাই যদি ওকে এক ঘণ্টার জন্য ডিউটি থেকে রেহাই দেয়।

তার কোন সম্ভাবনাই নেই, এদিকে হাতে পাওয়া ঘণ্টা কটাও পার হয় হয়, সুতরাং ও যা যা করতে চায় শুরু করে দেওয়া উচিত।

'তোদের ক্ষিদে পায়নি?' আরও খানিক এগোনোর পর দীন জিগ্যেস করল। কথাটা জিগ্যেস করে সে লখিমীর দিকে তাকাতেই লখিমী চোখ নামাল। হরুমাও কোন জবাব দিল না।

'চল, তাহলে' বলে হোটেলের কথাটা বলতে গিয়েও দীন থেমে গেল। দূরে কিছু লোক জটলা পাকিয়েছে। জটলাটার থেকে একটা গণ্ডগোলের আওয়াজও ভেসে আসছে।

'খানিকক্ষণের জন্য তোরা এক কাজ কর' দীন ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'চল তোরা কিছুক্ষণ ঐ পূজোর প্যান্ডেলে প্রতিমা দেখতে থাক। আমি চট করে ওখানে কি

হচ্ছে একটু দেখে আসি।'

পূজোর চালাটার নিচে হরুমাও এবং লখিমীকে ছেড়ে দিয়ে দীন সিপাহীর চালে জটলাটার দিকে এগোল।

তেমন কোন গণ্ডগোল নয়, একটা লোক দু'টাকার ছুরি কাটারি হঠাৎ আট আনায় বেচার কথা বলায় গ্রাহকের মেলা পড়ে গেছে আর তারই ফাঁকে একজন একটিও পয়সা না ঠেকিয়ে চারটে ছুরি নিয়ে কেটে পড়েছে। কে নিয়েছে কে জানে, কিন্তু উপস্থিত ক্রেতাদের কাউকে সন্দেহ করলে ওর ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে বলে সবাই ওকে শাসাচ্ছে, ঠিক এই সময় দীন গিয়ে পৌঁছল। বেশি বাছবিচার করার ধৈর্য দীনের নেই; সরকারি রাস্তায় কাপড় পেতে দোকান করার অপরাধে ও লোকটার মাথার ওপর বারদুয়েক ডাণ্ডা ঘুরিয়ে, ছুরি কাটারি সমেত কাপড়টাকে পোঁটলা করে রাস্তার পাশে একটা বারান্দায় ধপাস করে রেখে দিয়ে আবার পূজোমণ্ডপে ফিরে এল।

পূজোমণ্ডপে লখিমী এবং হরুমাও প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়েছিল; ওদের কাছেই বেঞ্চ ছিল, কিন্তু বেঞ্চে ওরা বসেনি। কে জানে কার বেঞ্চ, কে বসার জন্য রেখেছে!

দূর থেকে ওদের দেখে দীনের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওদের মুখ দুটো শুকিয়ে মলিন হয়ে গেছে। দীনের মনে হল ওরা যেন ভয় পেয়েছে, ওরা যেন ক্লান্ত। চারদিকের লোকজন কেউ বা সোজাসুজি, কেউ বা বাঁকা চোখে, কেউ বা আড়চোখে ওদের দুজনকে দেখছে। দীনের নিজেকে অপরাধী মনে হল। নাহ্, এখন থেকে ও ওদের দুজনের কাছে কাছে থাকবে।

কিন্তু ও পারল না। সূর্য ডোবার সাথে সাথে নবমীর বিকেলটাকে প্রাণবন্ত করে তোলা ছাড়া গোটা শহরটার মানুষদের যেন আর কোন কাজ রইল না। দোকান-পাট, রাস্তা ঘাট ধীরে ধীরে মানুষে ভরে গেল, আর লোকজনও ধীরে ধীরে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে উঠল।

একবার দীন রাস্তার পাশে লখিমীদের একটু দাঁড়াতে বলে পূর্বনির্দিষ্ট চায়ের দোকানে মেয়েদের বসার জন্য ঘেরা জায়গাগুলো উঁকি দিয়ে এল। একটাও খালি নেই, প্রত্যেকটাতে বেটাছেলেরা বসে আছে। পরে এসে আরেকবার দেখবে ভেবে নিয়ে দীন লখিমীদের মাংসের দোকানের দিকের চৌমাথাটা ঘুরিয়ে আনল। লখিমীদের গতি শ্লথ হয়ে আসছিল, বেগতিক দেখে, পরের বারও কেবিনগুলো ভর্তি দেখে দীন সাহস করে ওদের খোলা জায়গাতেই একটা টেবিলে বসিয়ে দিয়ে নিজে উল্টোদিকে বসল। বসে সসঙ্কোচে একবার চারপাশের লোকজনদের দেখে নিল। আর প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই তার চোখাচোখি হয়ে গেল। ঘুপচি ঘরটাতে এমনিই দমবন্ধ অবস্থা, তার মধ্যে খাকী কাপড়ের ভারে দীন ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠল।

'তোদের পা ব্যথা করছে নাকি?' নিজের দোষ ঢেকে দীন হরুমাও আর লখিমীকে তোষামোদ করতে চেষ্টা করল। হরুমাও ক্ষীণস্বরে না না ব্যথা করছে না জানাল। লখিমীর মুখটা লাল হয়ে গেছে। ওর চোখে চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দীনের বুকের ভিতরটা এক অদ্ভুত অনুভূতিতে কেঁপে উঠল যেন। এত কাছাকাছি, এমনভাবে লখিমীকে ও এর আগে আর কখনও দেখেনি। ডিউটির জ্বালা আর লখিমীর সান্নিধ্য — এ দুয়ের মাঝখানে পড়ে দীনের কথাবার্তা সব গুলিয়ে গেল। চা-টা টেবিলে এসে পড়ামাত্র সে শহরের পুজো, পুলিশের দায়িত্ব, ওরা কিছুদিনের মধ্যেই থাকার জন্য ছোট বাড়ি পাবে, এখন কোনমতে থাকতে হয় তাই আছে— এ ধরনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেক উল্টোপাল্টা কথা বলে গেল। পরের দিকে ধীরে ধীরে লখিমীর চোখও চক্‌চক্ করতে লাগল।

মিষ্টিটা খেয়ে দীন কেবল সিঙাড়ায় কামড় বসিয়েছে, এমন সময় অল্প দূরে হঠাৎ গাড়ির জোরে ব্রেক কষার একটা আর্তনাদের মত শব্দ হল। অবশিষ্ট সিঙাড়াটা হাতে নিয়ে দীন কান খাড়া করল। সে একবার ভাবল, থাক, যা হয় হোকগে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার অস্বস্তি বোধ করল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার অস্বস্তিটা কর্তব্যবোধে পরিণত হল; আর 'তোরা খেতে থাক, আমি এক্ষুণি আসছি' বলে সে বেরিয়ে গেল।

দীন পৌঁছনোর আগেই চৌরাস্তার ওপর এক ট্রাক ডাইভার এবং জিপের ড্রাইভার গাড়ি দুটোকে প্রায় ছুঁই ছুঁই অবস্থায় রেখে কোনটা মেন রোড তাই নিয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছে, ট্রাকের বাঁদিকটা জিপের ডানদিকের মাথাটা প্রায় ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে।

জিপ ড্রাইভারের চোখ লাল, ট্রাক ড্রাইভারের চোখের রঙ দেখার জন্য ভাল করে চোখ মেলতেও পারছে না। অন্যদিন হলে এ দুজনকে হুড় হুড় করে থানায় নিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন যুক্তির ধার ধারতো না, আজ কিন্তু কাজ বাড়াল না, গাড়ি দুটোর নম্বর লেখার ভান করে দুটোকে দুদিকে পাঠিয়ে দিল।

লখিমীরা চা-টা খেয়ে চুপচাপ মাথা নিচু করে বসেছিল, দীন আবার চেয়ারটাতে এসে বসল। বাকি চা মিষ্টিটা খেতে ওর ইচ্ছে হল না। হরুমাও জিগ্যেস করল, 'ওটা খাবি না?'

'বাদ দে, আর খাব না।' বিরক্তি চাপা রেখে দীন উত্তর দিল।

'চল তাহলে বেরোই।' হরুমাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠল।

'কেন? বস না কিছুক্ষণ এখানে, হেঁটে হেঁটে তোদের শরীর খারাপ লাগছে না?'

'লাগলেও, এখানে বসে থাকতে ভাল লাগছে না, চল।'

দীন একটু অবাক হয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসে সে আবার হরুমাওকে জিগ্যেস করল, 'কেন কি হয়েছে বল তো?'

হরুমাও একটু লজ্জা পেলেও ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, 'লোকগুলো বড় বাজে, কেমন গুণ্ডা গুণ্ডা।' বলে লখিমীর দিকে তাকাল, লখিমী লজ্জা আর ভয়ে ছাওয়া মুখ নিচু করল।

দীনের মাথায় যেন দপ করে আগুন জ্বলল। ওর মনে হল একবার দোকানে ঢুকে প্রত্যেকটা লোককে লাঠিপেটা করে রাস্তায় বার করে আনে। কিন্তু সে কিছুই করল না, বরঞ্চ লখিমীদের নিয়ে তাড়াতাড়ি লোকগুলোর দৃষ্টির আড়ালে যাওয়াটাই বাঞ্ছনীয় মনে করে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল এবং অনবরত ভেতরে ভেতরে একটা যন্ত্রণায় বিদ্ধ হতে থাকল।

কিন্তু দুঃখে দীন বোবা হয়ে গেল। সন্ধ্যের আগটাতে ওকে নিয়ে হরুমাওরা একটা দোকান থেকে চুড়ি আর ক্লিপ কিনছিল, এই সময় দীন দেখতে পেল সাইকেলে তিওয়ারি এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে আসছে। হরুমাওর হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে দীন তিওয়ারির দিকে এগিয়ে গেল। তিওয়ারি প্রথমে খবর নিল, এদিকে কোথাও কোন বাজে ধরণের গণ্ডগোল হয়েছে কি না, তারপর খবর দিল, আরও কয়েকটা গ্রামে এবং টাউনেও কোন কোন জায়গায় মারদাঙ্গা হয়েছে, আগে যে গ্রামটায় মারপিট হয়েছিল, সেখান থেকে একগাদা লোককে আজ বিকেলে ধরে আনা হয়েছে, দুটো গাড়ি এ্যাকসিডেন্ট করেছে; ওই গ্রামে আরও ছজন পুলিশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে; অতএব পাহারার ডিউটি শেষ করে দীনকে থানার সামনে একটা ট্রাকে রেডি পার্টি হয়ে বসে থাকতে হবে। এমার্জেন্সি ডিউটি।

দীন থ হয়ে কিছুক্ষণ তিওয়ারির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার বুকের মধ্যে একটা কান্না জমাট বেঁধে গলার কাছে উঠে আসতে চাইল। দীনের মনে হল সে, হরুমাও, লখিমী তিনজনে মিলে তিওয়ারির পায়ে ধরে কাকুতি মিনতি করবে, কিন্তু সে একটা কথাও বলতে পারল না। ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিওয়ারি দূরের দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা লখিমী এবং হরুমাওর দিকে বারে বারেই তাকাচ্ছিল, কিন্তু ওদের দুজনের কথা তিওয়ারিকে বলতে ইচ্ছে করল না দীনের। লখিমী আর হরুমাওর দিকে তাকাতে তাকাতে তিওয়ারি সাইকেল চালিয়ে বেরিয়ে গেল। দীন বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দোকানের বারান্দায় ফিরে এসে দীন অভিমানাহত কণ্ঠে হরুমাওকে বলল, 'তোদের বাসে তুলে দিচ্ছি, চলে যেতে পারবি?'

হরুমাওর চোখ বিস্ফারিত হল। বিস্মিত হয়ে সে জিগ্যেস করল, 'কেন, তুই যাবি না?'

অন্যদিকে তাকিয়ে দীন বলল, 'আমার ডিউটি বোধহয় শেষ হবে না।'

হরুমাও অস্থির হয়ে উঠল। অন্ধকার নেমে আসছে, প্রত্যেকটা লোক ওদের দিকে ড্যাব ড্যাব করে দেখছে, চায়ের দোকানের ওই বদমাশগুলো এখনও সম্ভবত

আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওদের গ্রামে যাওয়ার রাস্তার দুপাশে চা-বাগানের লোকদের নবমীর রাতে উন্মত্ত ঘটনার কাহিনী প্রতি বছর শুনতে পায় এবং সিঁটিয়ে ঘরে বসে থাকে। এখন ওরা দুজনে একা একা কখনই বাড়িতে যাবে না।

'তাহলে কি করবি? আমার ডিউটি তো শেষ না-ও হতে পারে।' দীন অসহায় কণ্ঠে বলল।

হরুমাও অবুঝ মেয়ের মত বলে উঠল, 'আমরা তোর সাথে থাকব। তোর যখন ডিউটি শেষ হবে তখন আমাদের রেখে আসবি গে।'

'সমস্ত রাতই যদি'—

দীন কথা শেষ করতে পারল না হরুমাও প্রশ্ন করল, 'তুই-ই বা রাতে কোথায় থাকবি?'

'থানায়।'

'আমাদেরও থানায় বসিয়ে রাখবি। গোটা রাতটা থানাতেই বসে থাকব। তুই শুধু কাছে থাকিস।' একটা অজানা ভয়ে হরুমাও সিঁটিয়ে গেছে। লখিমীর চোখ দুটো ছলছল করছে।

দুটো জোয়ান মর্দ হরুমাওর পাশ ঘেঁসে বেরিয়ে গেল। ও তাড়াতাড়ি লখিমীর কাছে সরে এল। দীনেরও ভয় হচ্ছিল। নবমীর সন্ধ্যা বাধাহীন আনন্দ আর উত্তেজনার মাতাল রূপ পরিগ্রহ করছে। মদের ভাটির কাছে উন্মত্ত মানুষের ঠেলাঠেলি লেগেছে। মাংসের দোকানে খাসীর ছাল ছাড়া আর কিছু পড়ে নেই। মদের ভাটির কাছে নতুন রান্না করা মাংসের দোকান বসেছে। মায়ের সামনে দুপুরে বলি দেওয়া পাঁঠার মাংস এইখানেই এসেছে কি না ঠিক নেই। মানুষজনের মধ্যে দিয়ে লখিমী আর হরুমাওকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দীনের রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল। লোকেরা যেন খোলামেলা সোজা রাস্তায় হাঁটতেই ভুলে গেছে। দুদিকে হাত দুটো নৌকোর বৈঠার মত না মেরে ওরা এগোতেই পারছে না। লখিমী বারে বারে চমকে উঠছিল, হরুমাও দীনের কাছে ঘেষে থাকল আর এর মধ্যে একটা তীব্র বিক্ষোভের অনুভূতি আর যন্ত্রণা দীনকে কুরে কুরে খেতে লাগল।

ছ'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দীন ওই রাস্তাটা থেকে সরে এলো। বাসস্ট্যান্ডে এদিক ওদিক দেখে ওদের গাঁয়ের একজন বিশ্বাসী মানুষের খোঁজ করল কিন্তু পেল না। বাসে চড়ে ফিরে যাওয়ার পথে প্রত্যেকটা মানুষই যেন শহরের শেষ কর্তব্য হিসাবে একবার মদের ভাটিতে ঢুঁ মেরে এসেছে। শেষে একটা বাসের ড্রাইভারের কাছে বলে দিল, ও যেন বাড়িতে খবর দিয়ে দেয় যে হরুমাওরা আজ বাড়ি ফিরবে কি ফিরবে না ঠিক নেই, যদি না ফেরে তবে ওরা বড় দারোগার স্ত্রীর সঙ্গে থাকবে।

মিথ্যে কথা। বড় দারোগার স্ত্রীকে দীন দেখেই নি। একটা কম অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ওরা এগোতে লাগল। আত্মগ্লানির যন্ত্রণায় কাতর মুখটা অন্ধকারে লুকোতে

পেরে দীন একটু আরাম পেল। মাঝে শুধু হরুমাও একবার বলল, 'তুই যে ঘরে থাকিস, চল সেখানে যাই। আমরা রাতটা ওই ঘরে কাটাতে পারব না?'

পারবে। যদি বুড়ো বংশীরামের রাতে ডিউটি না থাকে, ও ছাড়া বাকি সবার যদি রাতে ডিউটি থাকে, তাহলে এরা দুজন রাতে ওই ঘরটাতে পড়ে থাকতে পারবে। বংশীরাম বয়স্ক লোক, বড় ভাল মানুষ। সবাই ওকে বুড়ো বলে ডাকে আর ও প্রায় প্রত্যেক অল্পবয়সী সেপাইকে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে এবং বিড়ি চায়।

দীন ওর ঘরের দিকেই ওদের দুজনকে নিয়ে চলল। কিন্তু বাড়িটার কাছে এসেই ও থমকে গেল, ভেতর থেকে অনেকগুলো গলার আওয়াজ আসছে। হরুমাওদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে দীন ভেতরে গেল। ওদের দলের সবচাইতে বদমাশ পুলিশ চারটে দুটো খাট জোড়া দিয়ে তার ওপর বসে আছে। চারজনের মাঝখানে পাতা একটা খবরের কাগজে কিছু ছোলাভাজা। ঘরটার বাতাসে উৎকট গন্ধ।

দীন একটু রূঢ় স্বরে জিগ্যেস করল, 'তোদের ডিউটি পড়েনি?'

'ধুর্ ধুর্ আজ পুজোর শেষ বাজারে আবার ডিউটি!'

যার যত বেশি শয়তানি বুদ্ধি সে তত ডিউটি থেকে রেহাই পায়, এ কথাটা দীন আগের থেকে জানে; কিন্তু আজ এদের চারটেকে ওর অসহ্য মনে হল। রুক্ষ স্বরে বলে উঠল, 'আর সেজন্যই বোধ হয় তোরা এখানে বসে এ সব কচ্ছিস?'

প্যারেলাল যার নাম সে বলল, 'আরে আমরা তো কিছুই করছি না; যা বড় দারোগার ঘরে দ্যাখগে যা; আমি নিজে দোকান থেকে এই বড় দুটো বিলাতি এনে দিয়ে এসেছি।' ও কনুইয়ের কাছে অন্য হাতটা ঠেকিয়ে দৈর্ঘের পরিমাপ দেখাল।

দীন বেরিয়ে এল। হরুমাও আর লখিমীকে ওর দু'হাতে জাপটে ধরে রাখার কথা মনে হল। তার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। সে লাঠিটাকে জোরে খামচে ধরে চলতে লাগল। সে লখিমীদের একটা হোটেলে ভাত খাওয়াল তারপর থানার বারান্দায় নিয়ে এল।

থানার ভেতর বারান্দায় মদ খেয়ে গণ্ডগোল করার জন্য গ্রাম থেকে ধরে আনা পাঁচজন বেটাছেলে এবং তিনজন মেয়েছেলে বসে। সব কজনই চা-বাগানের মজুর। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওরা সবাই একবার কাতর দৃষ্টিতে দীনের দিকে তাকাল।

দীন সোজা থানার একেবারে ওপরওয়ালার কাছে গিয়ে হাজির হল। নির্ভীক কণ্ঠে বলল, 'স্যার, আমার দুই বোন গ্রাম থেকে পূজো দেখতে এসেছিল, আমার আবার রাতে নাকি ডিউটি দিতে হবে, এই জন্য আমি ওদের আজ এখানেই রাখব।'

ওপরওয়ালা কিছু বলার আগেই দীন একটা সেলাম ঠুকে বেরিয়ে এল। পিছনের বারান্দায় একটা বেঞ্চে ও লখিমী আর হরুমাওকে বসতে বলল। নিজে কাছাকাছি ঘোরাফেরা করতে লাগল।

থানার বিজলি আলোয় লখিমী আর হরুমাওর চেহারা ঝলকে উঠল।

থানার প্রত্যেকটা লোক, একবার, দুবার, তিনবার— কেউ বহুবার লখিমী আর হরুমাওকে দেখে গেল। দীনের মাথা খারাপ হওয়ার দাখিল। প্রতিটি লোকের দৃষ্টি কি বীভৎস রকমের নোংরা। প্রতিটি মানুষ বদমাশ, প্রতিটি মানুষ গুণ্ডা। কাউকে বিশ্বাস নেই। সারা পৃথিবীটা মাতাল।

আর সে পুলিশ!

কিন্তু, কিন্তু! দীন বাঁ হাতে কপালটা টিপে ধরল। সে যে কত অসহায়! সে যে কত অসহায় পুলিশ!

এক সময় ও-ও কিছুক্ষণ লখিমীর কাছে বসল। ওর কাছে দীনের ক্ষমা চাইতে ইচ্ছা করল। কিন্তু ও একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না। অল্প দূরে বসে থাকা বাগানের মজুরদের মধ্যে কেউ কেউ ঘুমোচ্ছিল। ওদের মদের নেশা অনেক আগেই ছুটে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে উবে গেছে পূজোর রঙ। ওদের মধ্যে মেয়ে কজন সাগ্রহে লখিমী আর হরুমাওর দিকে বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। ওদের মধ্যে একজন একবার দীনকে কাতর কণ্ঠে জিগ্যেস করল, 'পুলিশবাবু আমাদের কি যেতে দেবে না?'

'দেবে না।' দীন নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিল।

'আমাদের রাতে কোথায় রাখবে?'

'লক-আপে'। দীন বারান্দার এক মাথায় বিশেষ ধরনের ঘর দুটো দেখিয়ে দিল।

অনুতপ্ত নিস্তেজ মানুষটা আবার ম্রিয়মান হয়ে গেল।

একটু পরে বারান্দার ও মাথায় থানার সবচাইতে বড় কর্তা একদৃষ্টিতে লখিমী আর হরুমাওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। হাতের ছড়িটার ওপর দীনের মুঠোটা আরও শক্ত হল। প্রত্যেকটি মানুষ বদমাশ, প্রত্যেকটি মানুষ গুণ্ডা। কাউকে বিশ্বাস নেই।

ওপরওয়ালাটি এগিয়ে এলেন। দীনের কাছে এসে জিগ্যেস করলেন, 'মেয়ে মানুষ, কত সুবিধা অসুবিধার ব্যাপার আছে, তুমি ওদের এভাবে বারান্দায় বসিয়ে রেখো না। কোথায় রাখবে কিছু ভেবেছ?'

'ভেবেছি স্যার।' দীন নিচু গলায় বলল।

'কি ভেবেছ? কোথায় রাখবে?' ওপরওয়ালা সাগ্রহে জিগ্যেস করলেন।

'লক-আপে স্যার।'

কথাটা বলে দীন অন্ধকারে মুখ ফেরালো।

প্রতীক্ষা

দূরের বাঁধটার ওপর দিয়ে চঞ্চল গতিতে এগিয়ে যাওয়া মেয়ে দুটিকে বসন্ত, যৌবন, বৈশাখী বাতাসে উড়িয়ে এনে ফেলা দুটি বাধা-বন্ধহীন অলৌকিক কুমারীর মত মনে হল। বাঁধের ওপারে নদী, নদীর ওপারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, প্রান্তর এবং দি[illegible]য়ের মাঝখানে সূচীভেদ্য গাছ-গাছালির বেড়া আর সেই বেষ্টনীর ওপর দিয়ে সূর্যটা বাঁধের দিকে তাকিয়েছিল। দোর্দণ্ডপ্রতাপ যুবরাজের দৃষ্টি পড়লে এক সাধারণ প্রজার মেয়ে যেমন রহস্যময়ী হয়ে ওঠে, সূর্যের বিপরীত দিক থেকে মেয়ে দুটিকে ঠিক তেমনি অপার রহস্যের প্রতিমূর্তি বলে মনে হচ্ছিল। এদিক থেকে ওদের কালো মনে হচ্ছিল। ওদের যাওয়ার পথের বিপরীতে বাতাস বইছিল। ফলে ওদের গায়ের পাতলা শাড়ি ওদের সাথে সাথে না গিয়ে বেশ পিছনেই পড়ে থাকতে চাইছে, আর এতে ওদের শরীরের সন্মুখভাগের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, বাঁধের ওপর এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা গরুগুলোর দেহের গঠনরেখা যেমন ঝিলিক দিচ্ছিল, তেমনি।

এরা দুজন হল চারু এবং তরু। দিদি-বোন। চারু একটা সিল্কের শাড়ি পরেছে। শাড়িটা মাঝখানে মাঝখানে ফাটা, অনেক জায়গায় ফেঁসে গেছে। প্রয়োজনীয় সময়ের চাইতে অনেক বেশি সময় খরচ করে পরে ফাটা জায়গাগুলো লুকিয়েছে। কিন্তু ফাঁসা জায়গাগুলো যেন শাড়ির ডিজাইনের ক্ষীণাঙ্গী পাখি, বেশি ঝামেলা করলেই উড়ে পালাবে, আর ফুলের বদলে পড়ে থাকবে মাত্র বোঁটাগুলো। ওগুলো লুকোনোর উপায় নেই। কাছ থেকে দেখলে বাতাসে ওড়া আঁচলের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে সূর্যটার সঙ্গে পূবের উজ্জ্বল আকাশের খানিকটা ঝিলিক দিতে দেখা যাবে। মনে হবে যেন যুবরাজ বুঝি রাজকন্যার আঁচলে মুখ লুকিয়ে তামাশা করছে।

অবশ্য এই শাড়ি যার ছিল, তার গায়ে এর ফাটা আর ফাঁসা জায়গাগুলো ডিজাইনের ফুলের চাইতেও বেশি লোভনীয় হত। এই শাড়ি ছিল মাধবী নামে একটি সুন্দরী মেয়ের। তার গায়ের রং এতই ভাল যে যেটুকু শাড়িতে ঢাকা থাকত সেটুকুই

মনে হত দেখতে খারাপ লাগছে। অবশ্য ফাঁসা জায়গাটার মত দেখতে অনেক শাড়ি তার ছিল।

চারু মাধবীদের বাড়ির কাজের মেয়ে ছিল। মাধবীর বয়স যখন দশ-বছর সেই সময় তার বাবা নন্দন দাস অনেক দিনের চেনা ডাকঘরের এক পিয়নকে একটা কাজের মেয়ের কথা বলেছিলেন। পিয়নটি বলেছিল গাঁয়ের এক চেনা লোককে। লোকটি চারু-তরুর মা পুতলীর কাছে গেল। পুতলীর স্বামী মুকুন্দ দিন-হাজিরায় খেটে সংসার চালাত। কাজ খুঁজতে তাকে কখনও কখনও সাত আট মাইল দূর পর্যন্ত যেতে হত। একবার সেরকম এক দূরের জায়গায় গিয়ে এক ঠিকেদারের হয়ে জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে কুড়ি হাত ওপরের ডাল থেকে পড়ে গিয়ে মরে গেল। তখন চারুর বয়স চার আর তরুর বয়স দুই। তারপর পুতলী কি ভাবে মেয়ে দুটোকে নিয়ে দিন কাটিয়েছিল, তার কোন সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হয় না। লোকের ধান কেটে দেওয়া, নিজের চালে বেড়ে ওঠা কুমড়ো নিয়ে হাটে বেচা, শ্মশানে যাওয়ার রাস্তার ধারে ধারে বুনো করলা খুঁজে ফেরা, ছোট ছোট মেয়েদের কান ফুটো করা, লোকের সুতোয় রাত দু'প্রহর অবধি তাঁত বোনা; তিনটে মুখের আহার যোগাতে বিচিত্র কাজ পুতলীর। তবু, তবু মুঠোভর ভাতের যোগাড় হয় না।

পাঁচ বছরের ভেতরে মেয়েলোকটির বয়স পনের বছর পার হয়ে গেল। গায়ের মাংস শুকিয়ে খটখটে হাড়গুলো বাইরে বেরিয়ে পড়ল। কালো কালো ছোপ ছোপ দাগে গালের চামড়া ছেয়ে গেল। এমন সময় সেই লোকটি গিয়ে হাজির হল পুতলীর বাড়িতে। শহরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একটি কাজের মেয়ে চেয়েছেন। কাজ মানে কি আর — এই ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া, ছোটখাটো কাপড় চোপড় ধোয়া, মেলা — এই সব।

পুতুলী রাতটা ভাবল, আর পরদিন লোকটিকে জিগ্যেস করল, 'ও আর কিছু না হলেও দু'বেলা দু'মুঠো খেতে তো পাবে। বল, পাবে না?'

ন বছর বয়সে চারু নন্দন দাসের ঘরে এল। নন্দন দাসের বিশাল বাড়ি, পাকা মেঝে, ইলেকট্রিক লাইট জ্বলে, বাড়ির লোকেরা তিন চার পদ তরকারি-ভাজা দিয়ে ভাত খায়, মাধবীকে গাড়িতে করে স্কুলে দিয়ে আসে, নিয়ে আসে। কিছুদিন চারুর বড় অসুবিধা হয়। এই সব মেঝে কি ভাবেই বা পরিষ্কার করে! এসব বাসন কেমন করেই বা ধোয়! চীনেমাটির পিরিচ-পেয়ালা ধোয়ার সময় যেদিন মাধবীর মা 'দেখিস ভাঙে না যেন' বলেন, সেদিন চারুর হাত বেশি কাঁপে, মনে হয় পিরিচ-পেয়ালাগুলো যেন লাফ দিয়ে ওর কচি হাত থেকে বেরিয়ে যেতে চায়।

এক মাস পর ঐ পিয়নটির হাতে চারুর মা'র জন্য দশটা টাকা পাঠানোর সময় নন্দন দাস স্ত্রীকে জিগ্যেস করলেন, 'মেয়েটা খারাপ হবে না মনে হয়। শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে পারবে, কি বল?'

পেরেছিল। পরের দিকে চারু ঘরের প্রায় সব কাজই করতে পারত। আদা রসুনের খোসা ছাড়ানোর জন্য একদিন রান্নাঘরে ঢুকেছিল, পরে এক সময় সে বিশিষ্ট অতিথির জন্য, মাধবীর মা'র সমান সমান কাজ করতে রাঁধতে শিখল; বাসনের কিনারে একটুও ঝোল না লাগিয়ে ডাইনিং টেবিলে খাওয়ার জিনিস দিতে শিখল। নন্দন দাস সঙ্গীত রসিক লোক; তার ঘরে মাঝে মধ্যে গানের মজলিস বসে; বাড়ির অন্য সবাই শুয়ে পড়লে, চারু একলাই বার বার বৈঠকের লোকজনকে চা-কফির জোগান দিতে পারত। মাধবীর ভাই দুটিকে 'তোমরা কেন বার বার পেতে রাখা বিছানাটাতে ওঠ বল দেখি। যাও, ঐ সামনের চেয়ারে বসে ছবি দ্যাখোগে। দশবার করে বিছানাই পাতব — আমার আর অন্য কোন কাজ নেই নাকি?' বলে তার ধমকে দেওয়ার ক্ষমতা হল। পড়ার সময় রেডিও চালালে রেডিও বন্ধ করার ক্ষমতা হল।

নন্দন দাসের বাড়ির কারো চারুর প্রতি সামান্য অভিযোগও নেই। রান্নাঘর, স্টোর রুম, রেফ্রিজারেটারের চাবি চারুর হাতে, কোনদিন এক চামচ চিনি এদিক ওদিক হয়নি। কোনদিনই বাড়ির সবাই না খাওয়া পর্যন্ত সে খেতে বসেনি। বহুদিন সে মাছের নামে কানকোর চন্দ্রাকৃতি কাঁটাটা চিবোয়; কখনো মাধবীর মা যদি বলেন, 'কি রে, তোর জন্য মাছই তো থাকল না দেখি?'

'ঠিক আছে — এতেই হবে। ঝোল আছে তো!' বলে চারু হাসার চেষ্টা করে।

কোন অভিযোগ নেই, তবু একটা সমস্যা বড় হয়ে উঠছিল। এ বাড়িতে চারুর ন'বছর পার হয়ে গেছে। চারুর বয়স আঠার হল। সুন্দর পরিচ্ছন্নভাবে বাড়ির সব চলছে দেখেই বোধ করি নন্দন দাসদের কারোই মনে করার সুযোগ হয়নি চারু কত বড় হয়ে গেছে। আর চোখে পড়বেই বা কি করে, ও তো বড় হল মাধবীর পুরনো কাপড়ের আড়ালে।

কিন্তু ধীরে ধীরে আড়ালে আবডালে লুকিয়ে থাকা ছোটখাট কিছু কথা একেকটা সমস্যার রূপ নিয়ে বেরিয়ে এলো। একদিন এক বন্ধু মাধবীকে জিগ্যেস করল, 'আজকাল তুমি খুব বাড়ির কাজ কর, না?'

'ইস খুব করি! কাজ না করার জন্য মা এত গালি দেয়!' মাধবী হাল্কা কণ্ঠে জবাব দিল।

'হুঁ আমি নিজের চোখে সেদিন দেখলাম, তুমি সামনের বারান্দায় মাকড়সার জাল পরিষ্কার করছ।'

মাধবী কোন রকমে কথাটা ঘুরিয়ে দিল। ওর এক সময়কার খুব প্রিয় একটা চালু শাড়ি এখন চারু পরে। বন্ধুটি চারুকে পিছন থেকে দেখেছিল।

কোনদিন হয়তো বাড়ির সবাই বিয়েবাড়িতে যাবে। চারুকে কি করা হবে? নিয়ে গেলে ওকে কি পরিয়ে নিয়ে যাবে? মাধবীর সঙ্গে সঙ্গে ও থাকবে। সে ক্ষেত্রে মুখে

কিছু না মেখেই যাবে নাকি? খাওয়ার সময় ও কোথায় বসে খাবে? এসব কথায় মাধবীরই অস্বস্তি হয় সবচাইতে বেশি। আবার চারুকে একলা রেখেও যাওয়া চলে না।

ওকে কেন একা রেখে যাওয়া যায় না; এটা ভাবতেই চারুর কান মাথা গরম হয়ে যায়। কেন তাকে একলা রেখে যাওয়া যায় না? এ অঞ্চলে তো কোন চোর ডাকাত নেই। একমাত্র ড্রাইভারটি সম্পর্কে মাধবী অনেক কথা চারুকে বলে। ওসব শোনার পর চারু ড্রাইভারের সঙ্গে ভাল করে কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছে। ড্রাইভার যদি পুবে থাকে তাহলে উত্তরে চায়ের কাপ রেখে পশ্চিম দিকে যেতে যেতে চারু বলে, 'এই যে মতি চা রেখেছি ওখানে, খেয়ে নিয়ো।' কিন্তু সেই মতি ড্রাইভার তো সবার সঙ্গে গাড়ি চালিয়ে বিয়েবাড়িতেই যাবে। তাহলে এই লোকগুলো কাকে ভয় করে? চারুকেই? চারুর কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে।

আর লোকগুলো এসব আলোচনা করে গুনগুন করে, চারু যাতে না শোনে, অথচ সবই তার বোধগম্য করে। নন্দন দাস স্ত্রীকে বলেন, 'এটা তো একটা সমস্যা হল তাই না?'

'হুঁ'— স্ত্রী মাথা নাড়েন।

'ওকে তো এখানে সারাজীবনের জন্য রাখা যাবে না। পরে বিয়ে-থার ব্যাপার আছে — তখন সে ঝামেলা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বে। আর ওর জন্য আমরা ছেলেই বা পাব কোথায়? কি বল?'

'হুঁ।'

'আরেকটা কথা, এখন মাধবীর বিয়ে-থার কথা চলছে। দু-এক জায়গা থেকে লোকজন আসছে, পরেও আসবে। এই সব দেখে শুনে তো ওর মন খারাপ হতে পারে। ও-ওতো মাধবীর প্রায় সমবয়সী।'

কথাটা সত্যি। এর মধ্যে দু-এক জায়গা থেকে নয়, বেশ কয়েক জায়গা থেকেই লোকজন সোজাসুজি কিংবা কারও মারফত মাধবীকে দেখতে আসছে। চারু সোৎসাহে সবার চা জলখাবারের যোগান দিচ্ছে এবং সময়-সুবিধা প্রশ্রয় পেলেই মাধবীর সঙ্গে দু-একটা রসিকতা করছে, মস্করা করছে, মাধবী রাগ করে উত্তর দেয়, 'দ্যাখ চারু আমি বলছি, ভাল হবে না কিন্তু।'

চারুর বড় আশা, এতদিন একসঙ্গে থাকা এই মেয়েটির কার সঙ্গে বিয়ে হয় দেখার। কিন্তু সেও মনে মনে তৈরি হচ্ছিল যে কোনদিন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য।

একদিন সন্ধেবেলা মাধবীর পড়ার টেবিলে একগ্লাস দুধ দিতে গেলে মাধবী চারুকে দাঁড় করিয়ে অন্য কথা পাড়ল। অবশ্য মাধবীর এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। রান্নাঘরে কাজ পড়ে থাকে। তবু চারুকে ওর সঙ্গে কথা বলতেই হবে।

কথায় কথায় চারু জানাল, 'আমি তো চলে যাব।'

মাধবী বলল, 'গেলে যাবি। তাই বলে আমার বিয়ের আগে যেতে পারবি না।'

মাধবীর বিয়ে পর্যন্ত চারুকে কেন থাকতে হবে, সেকথা মাধবীও জানে না, চারুও বুঝতে পারে না। এই যে মাধবী স্নানের ঘরের মেঝেতে একগাদা কাপড়-চোপড় ফেলে, পা দিয়ে এককোণে ঠেলে রেখে আসতে পারে, চারু থাকতে যে তার গত ন বছরে চুলের সামান্য জটের কথাও চিন্তা করতে হয়নি, এই সব তুচ্ছ কারণে নিশ্চয় মাধবী তাকে এ বাড়িতে তার শেষ দিন পর্যন্ত রাখতে চায় না। তাহলে কিসের জন্য? কথাগুলো বলার পর মাধবীও অন্যমনস্ক হয়ে গেল, চারুও চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

একদিন সুন্দর এক যুবকের সঙ্গে মাধবীর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়েতে চারুর মা-ও এসেছিল। মা'র বয়স কত চারু জানে না; কিন্তু সে মনে করল তার মা একজন বৃদ্ধা মহিলা। বিয়ের গোলমালের মাঝে চারুর মা অবাক হয়ে এক কোণে বসে ছিল। কাজের মাঝে মাঝে চারু এক আধবার মা'র দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছিল। কারও সঙ্গে মেয়েমানুষটা একটা কথাও বলতে পারেনি। অনেক দিন পর মাকে দেখে চারুর প্রথমে ভালই লেগেছিল, কিন্তু পরে আস্তে আস্তে ওর বিরক্তি জন্মাল। মা যে কেন আসতে গেল? খবর পেলেই এত দূর থেকে এত কষ্ট করে আসতে হবে নাকি?

হঠাৎই এক সময় চারুর মনে হল, এ বেলা মা কিছু খেলো কি না? কুড়ি কুড়ি লোক খাচ্ছে, চারুও অনেক জিনিস নাড়া-চাড়া করছে। কিন্তু এর মধ্যে কেউ তার মাকে ডেকে নিয়ে কিছু খেতে-টেতে দিল কি? তার চোখে তো পড়েনি! আর সে নিজে মাকে ডেকে নিয়ে খাওয়ার জায়গায় বসিয়ে দেবে? ছিঃ ছিঃ, কেউ যদি দেখে ফেলে, কি ভাববে?

কাজের মধ্যে মধ্যে এই চিন্তাই চারুকে বড় খোঁচাতে থাকল। আস্তে আস্তে ওর মা'র মুখটা শুকিয়ে আসছে। খাওয়ার জিনিসের গন্ধটা তীব্রতর হয়ে উঠছে। ছেলে মেয়েগুলো যেন ভরপেট খেয়ে ওঠার আনন্দেই হট্টগোল পাকাচ্ছে। শেষে একবার কি একটা কাজে মতি ড্রাইভারকে ভেতরে আসতে দেখে চারু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এই একটা মানুষ যে চারুর প্রতিটি বাক্য শিরোধার্য করার জন্য পথ চেয়ে থাকে। চারুর মুখ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র, 'ও বুড়িমা আসুন, আপনি চুপচাপ বসে কি করছেন' বলে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। চারু না শোনার ভান করল।

বিয়ের পর চারুর মনটা উদাস উদাস, বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ল। আর সেই উদাসী মনটা নিয়ে সে একদিন তার গ্রামের বাড়িতে ফিরে এল। মাধবী বিয়ের রাতে কাঁদতে কাঁদতে একবার ওর হাত জড়িয়ে ধরেছিল, গাঁয়ে ফেরার দিন মাধবীর মা চোখের জল ফেলেছিলেন। নন্দন দাস অন্য দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলেছিলেন, 'ভাবিস না, আমরা তোর খবরাখবর নেব।'

খবরাখবর মানে, ওরা ঠিক করে রেখেছিলেন কখনও কোথাও যদি ওর বিয়ের ঠিকঠাক হয় তবে যা পারেন টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করবেন।

ন বছর বয়সে গাঁ ছাড়া চারু কুড়ি বছর বয়সে গাঁয়ে ফিরে এল।

কিন্তু খুব নিরুপদ্রবে ফিরে আসতে পারেনি তরু। মাধবীর মায়ের মুখে চারুর অকুণ্ঠ প্রশংসা শুনে পরীক্ষিত বর্মন নামে এক ভদ্রলোকের স্ত্রী বলেছিলেন, 'এ রকম একটা মেয়ে যদি আমি পেতাম।'

মাধবীর মা জানালেন, 'এরই এক বোন আছে, ওর চেয়ে দু'বছরের ছোট।'

'এর বোন এর মতই হবে মনে হয়' বলে শ্রীমতী বর্মন মন্তব্য করলেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই পুতলীকে খবর পাঠালেন। পুতলী বুক খালি করে তরুকে পাঠাতে বড় কষ্ট পেয়েছিল। কিন্তু একদিন তরুর শীর্ণ গালে হাত বুলিয়ে ওকেও শহরে পাঠিয়ে দিল। বর্মনের বাড়িতে তরুর শীর্ণ গাল এক সময় ভরে উঠল, আর একসময় সেই গালে এক বর্মন পুত্রের আদরের টোনা পড়ল।

মাধবীদের বাড়ি থেকে চারু চলে আসার পর শ্রীমতী বর্মন মাধবীর মাকে বললেন, 'আমরাও এ কথাটা ভাবছি বুঝলেন। ন বছর থাকল, তাছাড়া এখন একটা সোমত্ত মেয়ের দায়িত্ব আমরাই বা কি করে নিই?'

তরুও একদিন ঘরে ফিরে এল।

দুটি চাকরানী সোমত্ত হয়ে এবং চাকরানীর অযোগ্য হয়ে গাঁয়ে ফিরে এলো। আর সোমত্ত মেয়ের দৌলতে পুতলীর ঘর ভরে গেল। আর এমন দিনে ভরে গেল, যখন বৃদ্ধা পুতলী তাঁত বুনতে পারে না, কুমড়ো বেচতে হাটে গেলে কোমরের ব্যথায় বসে পড়ে, লোকের ধান বাছতে নিয়ে এক দোন (কুসকে)* ধানে একটা ঝাড়া দিয়েই কপালে হাত দিয়ে আঝাড়া বাকি ধানগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

চারু আর তরু হাতে যে পয়সা নিয়ে এসেছিল, সে টাকায় সংসার চালাতে আরম্ভ করল। কিছুদিনের জন্য ওরা মা'র কাজকর্ম বন্ধ করালো। বুড়ি কিন্তু শান্তিতে বসে থাকতে পারে না। কিছু না হলেও মেয়েদের জন্য দুটো পুঁটি মাছ ধরে আনতে জাকেটা † (পলো) নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। দুপুরের আগে আগে আধভেজা কাপড়ে ফিরে আসে। খালুই থেকে ঢেলে দেওয়ার সময় দু-একটা রঙিন মাছ চালনিতে পড়েই ছোট ছোট লাফ দিয়ে কানকো নাড়াতে থাকে। তরু চেঁচায়, 'ও মা, এই মাছটা দেখ, বেঁচে আছে। জিইয়ে রাখব নাকি? কিন্তু কিসে যে রাখি?'

চারু বলে, 'হরলিকস্-এর বোতল একটা যদি থাকত।'

ইস, হরলিক্সের বোতলগুলো এত খরখরে বাইরে থেকে দেখাই যায় না।

---

* বেতের বা বাঁশের বোনা পরিমাপের পাত্র, সাধারণত এক দোনে ৫ কিলোগ্রাম মত ধান আঁটে।

† বাঁশের কাঠি দিয়ে বোনা মাছধরার এক ধরণের ত্রিকোণ খাঁচা। পলোর থেকে সামান্য ভিন্ন।

জেলির বোতল একটা থাকলে ভাল হত। জেলির বোতলের ওপরটা একেবারে প্লেন তো, ওটাই বেশি ভাল হবে।'

মাছগুলো চারু বাছে। ছোট মাছ বাছার অভ্যাস ওর আছে। কিন্তু রান্নার সময় চারুর বড় অসুবিধা হয়। হ্যাণ্ডেল ভাঙা একটা পুরনো কড়াই, তার আবার একদিক ফাটা বলে উনুনের ওপর বাঁকা করে বসাতে হয়। এ বাড়িতে তেল থাকে গলায় দড়ি বাঁধা একটা চ্যাপ্টা শিশির তলানিতে, সেই তেলে এবেলার রান্না করে আবার সকালের রান্নার জন্য রাখতে হয়। এভাবে ও কখনও রাঁধেনি। তবুও অনেক চেষ্টায় ও রান্না শেষ করে। কিন্তু ভাত বাড়তে গিয়ে ও থমকে যায় — ও রেঁধেছে, কিন্তু বাড়েনি। ও তরুকে দেয়, সেও পারে না, ও-ও কোনদিন ভাত বাড়েনি। এরপর চারু নিজেকে জোর করেই বোঝাতে চেষ্টা করে, এটা ওর নিজেরই তো বাড়ি।

বৃদ্ধা পুতলীর অনেক দিনের অভ্যাস, খাবার থাকলে সন্ধেবেলাতেই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। মিছিমিছি কেরোসিনের খরচ বাড়ায় না। এখন চারুরাও তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া শেষ করে, কিন্তু ওদের এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসে না। ফলে ওরা দুজন সামনের দাওয়ায় বসে পুরনো দিনের কথা বলে। মন ভাল থাকলে তরু কখনও বর্মনের সেই ছেলেটার কথা কোন রাখ-ঢাক না করেই দিদিকে বলে যায়। তরুর একটুও দোষ ছিল না। কিন্তু ছেলেটাকে যেন ভূতে পেয়েছিল। পড়তে বসে তার ঘন ঘন পিপাসা পায় — তরু এক গ্লাস জল —। বাড়িতে ঘুম থেকে সবার আগে ওঠার কথা তরুর, কিন্তু ওঠে ও। ফলে তরু জেগে গেলেও অন্য কেউ না ওঠা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে থাকতে হত।

চারু বলে তার ওসব কিছুই ছিল না। কেবল সেই মতি ড্রাইভার যে কোন সুযোগে ওর সঙ্গে কথা বলার ছল খুঁজে বেড়াত। মাধবী আগে ভাগে সাবধান না করলে চারু হয়তো বিপদেই পড়ত। ড্রাইভারটা আগে একটা বিয়ে করেছিল। কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত ছেলেমেয়ে কিছু না হওয়াতে বৌ ওকে ছেড়ে গেল। গিয়ে অন্য একজনকে বিয়ে করেছিল। সেই বিয়ের এক বছরের মাথায় মেয়েলোকটির একটা ছেলে হয়েছিল। মেয়েটার আর কি দোষ। দোষ তো আসলে মতি ড্রাইভারের।

অনেক দূরের দুটো বাড়ির কথা বলতে বলতে একদিন এ বাড়ির ভাঁড়ার শূন্য হয়ে গেল। চারু ওর বাক্সটার তলা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখল একটি পয়সাও নেই। ওরা দুজন মায়ের মুখের দিকে চাইল। মা গর্তে ঢোকা চোখ নিয়ে পিটপিট করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। শহরে গতর বাড়িয়ে আসা দুটি ডবকা যুবতী।

বড় জ্বালা। এ জ্বালার তুলনা নেই। চারু আর তরু এ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ল। পেটের ক্ষিধেয় মানুষ এত কষ্ট পায়? মাঝে মাঝে পুতলী বুড়ি একেবারে খালি হাতে বাড়ি ফেরে। লোকেরা নাকি বলে দুটি সোমত্ত মেয়ে ঘরে বসে থাকে আর বুড়ি মানুষটা —

একদিন চারু আর তরু রাস্তায় বেরোল। দুটি সোমত্ত মেয়ের ঘরে বসে থাকার অপবাদ সহ্য করা বড় কঠিন। চারু আর তরুর বসে থাকার অপবাদ কখনও সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু সন্ধেবেলায় দুজন ক্লান্ত হতাশ হয়ে ঘরে ফিরল। এ জায়গা অন্য ধরনের, এখানে কেউ চাকরানী রাখে না। চাকরানীকে লোকে ঘেন্না করে। এখানে ধান কাটতে হয়, ধান রুইতে হয়, ঢেঁকিতে পাড় দিতে হয়।

অকর্মণ্য! অকর্মণ্য! গোটা জীবন শুধু কাজই করলাম— তবুও আমরা এতই অকর্মণ্য হলাম? একদিন চারু কেঁদে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।

কোন একটা উপায়ে এ যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধার পেতে চারুরা হাহাকার করছিল। এই সময় এল এই আজকের দিনটি। আজ নন্দন দাস এই গাঁয়ে আসবেন। এ গাঁয়ের লোকেরা একটা মাঠে মেলা বসিয়েছে। সেখানে গান-বাজনা হবে। আগে পরে এখানে এরকম মেলা কখনও হয়নি। কয়েকজন তরুণ এই মেলার আয়োজন করেছে। পুতলী বুড়ি গত কয়েক বছর প্রতি ঘরে ঘরে নন্দন দাসের গুণ কীর্তন করে বেড়াত, সেই জন্যই কি শহর থেকে যখন একজন সভাপতি আনার কথা উঠল, তখন সবার নন্দন দাসের নামই মনে পড়ল? হতেও পারে।

কদিন আগে কিছু তরুণ চারুকে জিগ্যেস করেছিল, 'লোকটা কেমন রে? আমরা ডাকলে আসবে তো?'

চারু উৎফুল্ল হয়ে বলেছিল, 'বড় ভাল লোক। কেন আসবেন না? ওনার তো মাসের আদ্ধেকটা দিন মিটিং করতেই যায়?'

কদিন পর তরুণের দল আবার চারুর কাছে এল। তারা জানাল, নন্দন দাস আসবেন। সঙ্গে তার স্ত্রীও আসবেন। দুপুরের পর ওরা এসে পৌঁছবেন। আসার পর ওদের সবাইকে একটু চা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে, তারপর মিটিংটা হবে। সন্ধ্যায় একটা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওরাও সবাই ভাত খাবেন। কিন্তু ওদের আচার ব্যবহার, প্রথা প্রকরণের আন্দাজ এখানকার লোকের নেই, সেইজন্য রান্না-বাড়া, দেওয়া-থোওয়ার দায়িত্ব নিয়ে চারুরা যদি সাহায্য করে তবে বড় ভাল হয়। কারণ চারু তো সে সব ভাল করেই জানে।

চারুর বড় আনন্দ হল। এই প্রথম গাঁয়ের মানুষ তাদের মূল্য বুঝল। অনেক দিন পর আবার দিদির সঙ্গে দেখা হবে। এবার সে নন্দন দাসকে বলবে কিছু একটা করে তাদের এই যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করতে। তাকে বুঝিয়ে বলবে তাদের বাড়িতে এগার বছর থাকার জন্যই ও আজ অকর্মণ্য, চাকরানী হয়েছে। তার বাকি জীবনটার কোন গতি হল না।

সকালবেলাতেই ওরা দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দিল। তরু নকল পাটের ফেঁসে যাওয়া একটা কাপড় বার করল। চারুর সবচেয়ে ভাল বলতে মাধবীর দেওয়া একটা সিল্কের শাড়ি। একবার এদিক থেকে পরে আবার ওমাথা থেকে পরে, বিভিন্ন

ভাবে পরে দেখে ও ফাটা ছেঁড়াগুলো যেমন তেমন করে লুকোল। শেষমেষ বইয়ের মাপের একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শুধু হাতটাকে মুখের ওপর বার দুয়েক ঘষে নিয়ে হাল্কা উৎফুল্ল স্বরে চেঁচাল, 'তোর হল, না না? চল তাড়াতাড়ি কর।'

তারপর দেখা গেল চারু আর তরু কিছু হেঁটে, কিছু লাফিয়ে বাঁধটার ওপর দিয়ে মেলার মাঠের দিকে এগোচ্ছে। সূর্যটা ওদের দিকে ড্যাবড্যাব করে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছে; বাতাস ওদের বিব্রত করছে, গায়ের জীর্ণ কাপড়খানা ওদের পিছনে পড়ে থাকতে চাইছে।

সারাটা দিন চারু আর তরু মেলার মাঠের একপাশে রান্নার জন্য তোলা একটা চালার নিচে খুব ব্যস্ত থাকল। জিরে-লঙ্কা, এলাচ, দারচিনি ইত্যাদি একটা ফর্দ চারু মুখে বলে গেল, একটা বাচ্ছা মেয়ে লিখে নিল। একজন দৌড়ল অন্য গাঁয়ের বড় দোকানটাতে। দুটো ছেলেকে পাঠানো হল কাপ প্লেট আনতে। ছেলেদের জোগাড় করা কাপ প্লেট দেখে চারু আর তরুর হাসিই পেল। কোয়ার্টার ডিশ কয়েকটা যদি থাকত, ঠিক আছে, নেই যখন এতেই চালাতে হবে। কিন্তু তেলে ভাজা আটার লুচি? এটা চারু কখনই হতে দেবে না বলে ঠিক করল।

সমস্ত সময়টা চারু আর তরু গুন গুন করে নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করে সমানে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে গেল। আর ওদের সঙ্গে কাজ করা অন্য মেয়েরা মাঝে মাঝে আলাদা হয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করল।

এক সময় মঞ্চের কাছে ঘেরা জায়গাটায় টেবিলে নন্দন দাস আর তার স্ত্রী চা খেতে বসল। টেবিলে স্থানীয় সম্পাদক, সভাপতি এসব নিয়ে মোট ছজনের জন্য চা জলখাবার সাজিয়ে দিয়ে চারু একটা কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। মাধবীর মা'র কাছে যাবার জন্য ওর মনটা উসখুস করছিল, কিন্তু ও সাহস পাচ্ছিল না। একবার হঠাৎই মাধবীর মা ওকে দেখতে পেলেন। তিনি ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসি হাসি মুখ করলেন। চারু এগিয়ে গেল। নন্দন দাসও এবার তাকে দেখতে পেলেন। তিনি গম্ভীর সভাপতি সুলভ গলায় বললেন, 'ও তুই এখানেই আছিস? আমরা তোর খবর নেব বলে বলাবলি করছিলাম। ভাল আছিস?'

'হ্যাঁ' — গলার বিভিন্ন স্তরে ঠেকতে ঠেকতে যেন শব্দটা চারুর মুখ দিয়ে বেরোল।

'তুই তো রোগা হয়ে গেছিস।' মাধবীর মা চারুর দিকে তাকিয়ে বললেন। মাধবীর সেই শাড়িটা এখনও ও পরে চলেছে? বেশিক্ষণ তিনি চারুর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলেন না।

চারু অস্থির মনে অপ্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকল। আর কি জিগ্যেস করবে দিদি? স্যার আরও কি জিগ্যেস করবে? ও নিজে আর কি বলবে? নন্দন দাস এবং তার স্ত্রীও বড় বিব্রত হলেন ভেবে, আর কি-ই বা ওকে জিগ্যেস করি? জিগ্যেস

করার মত আর তো তেমন কিছু নেই।

নেই। জিগ্যেস করার মত আর কিছুই নেই। অতএব পরক্ষণে চা খাওয়া শুরু হল। গ্রামের ছেলেমেয়ের দল টেবিল ঘিরে রইল। নন্দন দাস সঙ্গীত চর্চার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তরুণ তরুণীদের প্রশ্ন করলেন। এক সময় চারু চুপিসাড়ে রান্নার চালাটার নিচে চলে গেল।

সন্ধ্যার একটু পরে যখন নন্দন দাস এবং তার স্ত্রীকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে-দাইয়ে বিদায়ের আয়োজন চলছিল তখন চারুর শরীর হলুদের দাগ আর ছাইয়ের দাগে বিবর্ণ। ওঠ-বস করতে করতে শাড়িটার ফ্যাসটানো জায়গাগুলো যেন যন্ত্রণায় মুখ ব্যাদান করতে চাইছে, কিন্তু পাশাপাশি আলো কমে আসার জন্য ওদের লুকিয়ে থাকার সুযোগ ঘটেছে। ভাত খাওয়ার সময় নন্দন দাস একবার বললেন, 'শুনছিস চারু, তুই আছিস বলেই বোধ হয় — একেবারে বাড়িতে রাজভোগ খাওয়ার মত লাগছে।' কথাটা বলে তিনি নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন। সঙ্গে স্থানীয় সভাপতি সম্পাদকের দলও হো হো করে হেসে উঠল।

খেয়েদেয়ে নন্দন দাস এবং তার স্ত্রী এখান থেকে দু'মাইল দূরের এক ফরেস্ট বাংলোতে শুতে যাবেন। তারপর কাল সকালে অন্য কোন দিকে বেড়াতে যাবেন। বাড়িতে দিন দুয়েক বাদে ফিরবেন।

চারুর আর কথা বলার ইচ্ছে ছিল না, তবু শেষে একটা ফাঁক গলে ও মাধবীর মা'র কাছে এল। ক্ষীণ স্বরে জিগ্যেস করল, 'মাধবী ভাল আছে দিদি?'

'হ্যাঁ ভাল আছে। ওর একটা ছেলে হয়েছে তো।'

মুখ্য লোকজন চলে যাওয়ার পর গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা ভোজ খেতে বসল। ঝাঁকে ঝাঁকে ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়ের সংখ্যাও শেষ হয় না, আর একদল খেতে বসলে তাদের খাওয়াও শেষ হয় না। চারু আর তরু বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ওদের ক্ষিদেও পেয়েছিল। একসময় পুতলী বুড়ি এসে মণ্ডপের এক কোণে বসে ছিল। চারু একবার ভেবেছিল মাকে ডেকে এনে খেতে বসিয়ে দেবে নাকি? কিন্তু ওর লজ্জা হল। কেউ যদি দেখে ফেলে তো কি ভাববে?

মা না এলেই ভাল হত। কিন্তু না এলেও অসুবিধে হত। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার কোন ব্যবস্থাই আজ নেই। কিছুই নেই।

কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার শেষদিকে রান্নার চালার নিচে একটা সমস্যাই হল। মাছ শেষ, তরকারি অল্পই আছে, ভাতও অল্প, কিন্তু খেতে এখনও কত বাকি কে জানে? আগের লোকদের ঝপাঝপ দেওয়ার জন্যই পরে এ রকম ঘটল, এই বলে সহকারী সম্পাদক এক তরুণ অভিযোগ করল, এর জন্য চারুদেরও দোষ আছে।

চারু ভাবল হতে পারে, ওর রান্নার অভ্যাস আছে, পরিবেশনের অভ্যাস

নেই। সবাই খেয়ে ওঠার পর যা থাকে তাই খেতে হয় — এই ব্যবস্থাতেই সে অভ্যস্ত।

রান্নার চালা প্রায় নির্জন হওয়ার পর চারু, তরু আর পুতলী বুড়ি বাসনগুলোর সামনে বসল। কলাপাতায় বানানো ভাতের পাত্রটা চেঁছেমুছে দু আঁজলা মত ভাত পাওয়া গিয়েছিল। মাছের কানকোর চন্দ্রাকৃতি একটা কাঁটা পুতলী বুড়ি চুষে যাচ্ছিল।

সহকারী সম্পাদক তরুণটি মুখ বাড়িয়ে একবার জিগ্যেস করল, 'তোমাদের জন্য কিছু আছে না নেই। চট করে একটু চাল ফুটিয়ে নেবে নাকি?'

হাত পায়ের ব্যথা চারুর বুকটাকেও অবশ করে ফেলেছিল, অবসাদ আর ক্লান্তি এক তীব্র যাতনার রূপ নিয়ে মনটাকে ঘিরে রেখেছিল। নতুন করে ভাত রাঁধতে তার কোন উৎসাহ ছিল না।

তারপর দেখা গেল বাঁধটার ওপর দিয়ে তিনটে প্রাণী নীরবে ঘরে ফিরছে। কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া বা চতুর্থীর চাঁদটা দিগ্বলয়ের গাছের বেষ্টনী পার করে বাঁধটার দিকে তাকিয়ে আছে। বিপরীত দিক থেকে প্রাণী তিনটিকে প্রেতাত্মার মত দেখাচ্ছিল।

ঘরে ঢুকে চারুরা কেউ কারও সঙ্গে কথা বলল না। চারু ভাবল, মা এবং তরু শোওয়ার পর সে দাওয়ায় বসে আশ মিটিয়ে কাঁদবে। কিন্তু তার পেট ব্যথা করছিল ক্ষিদেয়। দাওয়ায় বসে কাঁদতে গেলে যেটুকু শক্তির দরকার তার সে শক্তিটুকুও ছিল না।

ঘণ্টাখানেক পর হঠাৎ চারুর কানে এল 'ঘরে কেউ আছে নাকি?' বাইরে থেকে কেউ ডাকছে। লোকটা বার তিনেক ডাকল। ডাকটা শোনা শোনা যেন — চেনা চেনা মনে হয় — হ্যাঁ হ্যাঁ, চারু গলাটা চিনতে পেরেছে— মতি ড্রাইভার।

প্রদীপটা জ্বেলে দরজাটা খুলে দিল চারু।

'ভাল আছিস চারু? বুঝলি কি না চারু, মানে কথা হল কি—আমি এসেছিলাম সাহেবকে নিয়ে। এখন সাহেবকে ফরেস্ট বাংলোতে রেখে এলাম। ওখানে এক চৌকিদার ছাড়া আর কেউ নেই। শেষে আমার খাওয়া-দাওয়া কিছুই হল না রে। সেই সকালে ঘরের ভাত খেয়ে বেরিয়েছি! লোকগুলো আমার কোন খোঁজই নিল না। মিটিঙে গেলে আমার প্রায়ই এই দশা হয়। সেই জন্য ভাবলাম তোকেও দেখে যাই আর একটু খেয়েও যাই। দে কিছু একটা খেতে টেতে দে।

মতির কথার কোন লাগাম নেই। বলতে গেলে ও বলেই যায়।

চারু একটু সময় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর কুপিটা মেঝেতে রেখে সে সামনে এল। মতিকে কিছু না বলে দাওয়ায় বসল। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল। এখন যেন সে কান্নার শক্তি পেয়েছে।

অল্প দূরে চাতালের ওপর মতি অবাক হয়ে বসে রইল। কেঁদে কেঁদে অনেক কথা বলার পর চারু এবার চুপ করল। তারপর গলায় এক অদ্ভুত সুর এনে জিগ্যেস করল, 'তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারো না?'

মতি একটু পরে উত্তর দিল 'তোদের নিয়ে এটাই হল মুশকিল, বুঝলি? ঠিক সময়ে তোরা ঠিক কথাটা ভাবিস না। একদিন যদি তুই আমাকে বলার সুযোগ দিতিস—তাহলে তো তোকে আমি কবেই বলে দিতাম— তুই আমার সঙ্গে চল। তাছাড়া তুই তো জানিস আমাকে একজন ছেড়ে চলে গেছে। আর কেন ছেড়ে গেছে তাও তুই জানিস।'

চারু গলার সবটুকু শক্তি জড়ো করে বলল, 'আমার ওসব কিচ্ছু চাই না। তুমি আমাকে নিয়ে চল। এখানে আমি মরে যাব।'

মাঝরাতের দিকে মতি বাঁধটার ওপর দিয়ে দ্রুত পায়ে ফরেস্ট ডাক বাংলোর দিকে পা বাড়াল, রাতটা গাড়ির ভেতর শুয়ে থাকতে। সে যেন অকস্মাৎ ঠিক করে ফেলল, এই গাড়ির ভেতর তার আর বেশিদিন শোওয়া ঠিক হবে না।

খালি পেটের বায়ুটুকু পলকে পলকে মতির দুই ঠোঁটের ফাঁকে ঢেকুর তুলে বেরিয়ে আসতে লাগল।

তরু বেড়ার ওপার থেকে সব শুনছিল। মতি যাওয়ার পর চারু যখন বিছানায় এল তখন তরু বলল, 'তোকে যদি মতি বিয়ে করে, তোরা যদি একটা বাসায় থাকিস তাহলে আমাকেও নিয়ে যাবি? তুই তো জানিসই আমি ঘরের কাজকর্ম সবই করতে পারি।'

অর্থাৎ সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তরু একজন ভাল চাকরানী হতে পারবে।

পুতলী বুড়ির প্রথম রাতে ভাল ঘুম হয়, কিন্তু মাঝ রাতে যে ঘুম ভাঙে সেই ভাঙা মানে একেবারে সকালের নামে।

মাঝরাতের পর একবার তরু জেগে আছে বলে মনে হওয়াতে জিগ্যেস করল, তোরা কার সঙ্গে কথা বলছিলি রে? তরু মাকে গুনগুন করে অনেক কথাই বলল। মতির সঙ্গে চারুর বিয়ে হবে। শেষ রাতে বুড়ি চারু জেগে আছে টের পেয়ে ডাক দিল, 'জেগে আছিস নাকি? আয় আমার কাছে আয়।'

চারু মা'র বিছানায় উঠে গেল।

জীবনে প্রথমবারের জন্য বুড়ি জীবনের দু'কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে চারুকে বলতে শুরু করলেন — বিয়ে-টিয়ের পর মেয়েমানুষের অনেক ল্যাঠা। বাচ্ছার মা হওয়াটা যে সে কথা নয়। শরীরে ঝামেলা লেগে যাওয়ার পরদিন থেকেই এটা সেটা কত কি যে সামাল দিতে হয়।

'আমি থাকলে অবশ্য সে সব আমিই দেখতে পারব। অনেক কিছু ভুলে গেছি যদিও, তবু অনেক কিছুই মনে আছে। অবশ্য তোরা আমাকে আবার নিয়ে যাবি তো?' কথাটা জিগ্যেস করে বুড়ি বড় আশায় কান দুটো সজাগ রেখে প্রতীক্ষায় রইল।

বর্ণনা

সাধারণত ফাল্গুন চৈত্র মাসে মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা কুয়োটার কাদা তোলে। মাঘের শেষ নাগাদই কুয়োটার জল তলা ছোঁয় ছোঁয় অবস্থায় আসে, আর হোলির পরদিন জলের সঙ্গে কাদা উঠে আসে। দোলের দিন বিকেলে বুড়ো থেকে গুঁড়ো পর্যন্ত আবীর, নীল, কালি, ভুষো, তার্পিন তেলের প্রতাপে মুখ চিনতে না পারা বুড়ো থেকে ছোট ত্রিশ চল্লিশটা প্রাণী চান করার জন্য কুয়োর পাড়ে কাড়াকাড়ি, চিৎকার চেঁচামেচি করে, ওপরে বালতি নিয়ে দশ বারোটা দড়ি একসাথে কুয়োতে নামে; নামার সময় মাঝপথে এবং জলের ওপরে বালতিতে বালতিতে ঠোক্কর খায়, ওপরে মানুষে মানুষে তর্কাতর্কি বাধে। কারো বারো তাপ্পি দেওয়া ছালবাকলা ওঠা, পচা দড়ি বালতির জটে ছেঁড়ে, বালতি জলে পড়ে। বালতির মালিক পাশের জনকে গাল দেয়, সে বলে, 'টুঁটি ধরে নামিয়ে দিচ্ছি— বালতি তুলে নিয়ে আয়। মেলা ভ্যাগ ভ্যাগ করিস কেন?' গোলাপদের তিলক কাটা বুড়ি অল্প দূরে দাঁড়িয়ে চেঁচায়, 'এই যে তোরা সব ধেড়ে আঁটকুড়ের দল কুয়োটাকে গিলতে এলি, কেন পা দুটো চালিয়ে নদী থেকে গা ধুয়ে আসতে পারিস না? তোরা এভাবে কুয়োর জল নিয়ে আদিখ্যেতা করলে রাতে খাবার জলটা আসবে কোত্থেকে শুনি!'

যোগেশ্বর — 'ও পিসি, তোর মুখে তো দেখি রংই লাগেনি! তুই দোল খেলিসনি? আয় দেখি একবার এদিকে —' বলে ভুষো কালি মাখা হাতটা দু'বার রগড়ে বুড়ির দিকে এগোয়। সে যে রঙ্গ তামাশা করার জন্য আর কাউকে না পেয়ে বুড়ির পেছনেই পড়েছে এর জন্য তাকে ভাল করে ঝাড়ুপেটা করার কথা ঘোষণা করে বুড়ি পেতলের খালি কলসীটা কাঁখে নিয়ে বাড়ি ফিরল।

এরপর পাড়াতে সত্যিই খাবার জলের অসুবিধা হয়। জলটা ঘোলা হয়, কাদা কাদা আঁশটে গন্ধ হয়। ঘণ্টা দুয়েক থিতিয়ে টুকরো কাপড় কিংবা গামছায় ছাঁকার পরেই মুখের সামনে নেওয়ার মত হয়। লোকেরা বলাবলি শুরু করে; মিউনিসিপ্যালিটির লোকজন কবে যে কাদা তুলবে। এই অঞ্চলের মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বার গোবিন্দ মিষ্টান্ন

ভাণ্ডারের মালিক কালী চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে কথাটা বলতে হয় বলে সবাই বলাবলি করে, কিন্তু চক্রবর্তী বাবুকে সহজে পাওয়া যায় না। মোড়ের মাথায় ল্যাম্পটা জ্বালানোর জন্য সন্ধ্যার পর কাঁধে মই, চিমনি মোছা ন্যাকড়া, হাতে কেরোসিন তেলের টিন আর পকেটে দেশলাই নিয়ে একটা বিহারী লোক আসে; পদ্ম বুড়ো তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়, সিধে গলায় জিগ্যেস করে, সে দোলে দেশে গেল না কেন, এবার সে হোলিতে ঢোলক বাজাল কি না। তারপর বুড়ো কুপিতে আধাকুপি তেল চায়। তেলটা পাওয়ার পর, কুপিটার মুখ ভাল করে বন্ধ করে নিয়ে বুড়োর গলাটা বেশ গম্ভীর নামঘরের কীর্তনে দোহারি ধরার মত হয়ে যায়, 'তোদের এটা কোন ধরনের মিনসিপালটি অ্যাঁ? কুয়োটা মাটিতে ভরে গেল, আজ তিন-চারদিন হল লোকেরা একটু খাবার জল পাচ্ছে না, আর ওদের কাদা-টাদা তোলার কোন গরজই নেই। এটা কোন্ ধরণের বিচার? তুই অফিসে বলে দিবি, পরশুদিনের মধ্যে যেন কাদা তুলতে লোক পাঠায়। বলবি, না বলবি না?'

বিহারীটা বলে, 'বলব।'

'কালকেই বলবি।'

'ঠিক আছে, বলব।'

'দেখিস ভাইয়া, পরশুর ভেতর যদি কাদা তুলতে লোক না আসে, তাহলে তোর মই-টই সব কেড়ে রেখে দোব।'

কদিন পর মই, দড়ি, বালতি নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির কয়েকজন লোক কাদা তুলতে আসে। ওদের মুহুরীটা এসেই পাড়ায় জানান দেয়, কুয়োয় মানুষ নামার আগে যার যার জলের দরকার তাড়াতাড়ি নিয়ে যাক। দড়ি, বালতি, কলসী নিয়ে মেয়েরা, বিশেষ করে অল্পবয়সী মেয়েরা কুয়োর পাড়ে দৌড়ে আসে। যতটা পারে তাড়া করে জল তুলে ওরা বাড়ির ঘটি, গামলা যা আছে সব ভরার চেষ্টা করে। কাদা তোলার পর কুয়োর জলে পটাশ দেবে, দুদিন ধরে জলটা লাল হয়ে থাকবে, সে রং কমলে তবেই ওই জল খাওয়া যাবে। অতএব দুদিনের জল দরকার। চাতালের ওপর উবু হয়ে বসে রম্ভা বুড়ি ককিয়ে ককিয়ে বলে, 'ও মানিকী, আমাকেও দু' কলসী জল দিস দিদি। কোমরটা আজ—।'

তারপর কুয়োর পাড়ে কাদাতোলা দেখার জন্য বয়স্ক এবং ছোট ছেলেমেয়ে সবার ভিড় উপচে পড়ে। মিউনিসিপ্যালিটির দুটো লোক মই বেয়ে নিচে নেমে যায়। দুটো বড় বড় বালতিতে ওরা কাদা ভরে আর দুজন জোয়ান মরদ বালতিগুলো ওপরে তোলে এবং গোল পাকা জায়গাটার ওপর ফেলে দেয়। নেহাৎই বলতে হয় তাই মুহুরীটি মাঝে মাঝে 'জলদি' করতে বলে।

কাদার সঙ্গে কি কি উঠছে দেখার জন্য বাচ্ছা ছেলেগুলো খোঁচায়। এর আগের বার কাদা তোলার পরে বিষ্ণু, হলীরাম এবং নেপালদের বালতি দড়ি ছিঁড়ে কুয়োতে পড়েছিল। কাঁটা দিয়ে অনেক চেষ্টা করেও বালতিগুলো তোলা যায়নি; এবার কাদার

সঙ্গে বালতিগুলো উঠেছে। মধু সাইকেলের একটা রিম লাঠি দিয়ে চালাত আর পি পি করে শব্দ করে বেড়াত। একদিন কুয়োর পাড়ে কেরামতি করতে গিয়ে ওটা জলে পড়ে গিয়েছিল। এখন সেটা উঠল। বড় আমগাছটাতে ছোড়া ছোট ছোট পাবড়াগুলো* মাঝে মাঝে কুয়োয় পড়ে সেগুলো উঠে আসে। রজনীদের পেতলের ঘটিটা ওঠে, বাবার বানিয়ে দেওয়া ইঞ্চির দাগ কাটা গোবিন্দর স্কেলটা ওঠে। পিসেমশায়ের দুষ্টু ছেলেটা নিয়ে গেছে বলে মনে করা বিনোদদের কাঠের ছোট হরিণটা ওঠে। ছুটকির † হাত থেকে দিদির পিতলের চুড়িটা পড়েছিল, উঠতে পারে বলে ও হাঁ করে বসে ছিল, উঠল না। বহু বছর, বহু বছর পর আজ আবার এই কুয়োটার কাদা তোলা হচ্ছে।

বর্ণনার যখন জন্ম হয়েছিল তখনও এই পাড়ার জীবনের গতি স্বচ্ছন্দ ছিল। হীরা মারোয়াড়ির বারান্দায় ভাড়ায় নেওয়া মেশিনে এক আনায় ময়মনসিংঘীদের লুঙ্গি সেলাই করত। বলরাম সোম মঙ্গলবার হাটে বেচার জন্য সাদা পাতা আর লালিগুড়ে তামাক বানাত। নিবারণ সাইকেলের কেরিয়ারে র‍্যাঁদা-হাতুড়ি-বাটালি নিয়ে গাঁয়ের পুলিশদের কাঠের বাড়ি বানাতে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ত। গজেন ড্রাইভার মহাজনের ঘরে বাস রাখতে যাওয়ার সময় রাস্তায় কেনা মাছ-সব্জির পোঁটলাটা বৌকে দেওয়ার জন্য আম-গাছের নিচে গাড়ি দাঁড় করাতো, পাড়ার একগাদা বাচ্ছা উঠিয়ে নিয়ে সে মোড়ের মাথায় নামিয়ে দিত। যে কটা নামতে চাইত না তাদের ধমকাত। মানিকীরা গোল হয়ে বসে উকুন বাছত। নেপালরা গুলি খেলত। এখানে সেখানে কলেরা লাগলে লোকেরা চালকুমড়ো আর কয়েৎবেল জোগাড় করে, দেশ থেকে ব্যামোটাকে তাড়ানোর জন্য রাস্তায় রাস্তায় সংকীর্তন করে বেড়াত, হরিপদ বিশ্বাস গলায় গামছা দিয়ে বেঁধে, হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে সংকীর্তন দলের আগে আগে চলত। লাবণ্য আর যোগেশ্বরকে নিয়ে বদনাম রটে। দুদিন বরষা না হওয়ার ছুতো পেলেই কিরণরা ব্যাঙের বিয়ে দেয়। রজনীরা হরিপদর হারমোনিয়ামটা ধার নিয়ে প্রসেসনের গান তৈরি করে — ঐ যে উড়ছে স্বরাজ নিশান —।

শহরের কেন্দ্রস্থলে গানের মাস্টার গোপালবাবু নিজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ভ্যারাইটি শো করেন। তিনি পাতলা রঙিন কাগজে হ্যান্ডবিল ছাপান— প্রথমে বৃন্দবাদন হবে, তারপর হরকান্ত সেরেস্তাদারের মেয়ে মিনতি সেতার বাজাবে। নিরঞ্জন ডি. এস. পি-র মেয়ে বর্ণনা ভজন গাইবে, রবি উকিলের বড় ছেলেটি বাঁশী বাজাবে এবং ছোটটি তবলা।

নেপালরা ভ্যারাইটি শো দেখে দু-তিনটে রঙিন হ্যান্ডবিল পকেটে নিয়ে বাড়ি ফেরে। সে-সময় নেপালের বাবা মা এক মাসের মেয়েটার একটা নামের কথা

---

* মূলে "ফর্মুটি" শব্দটি আছে যার অর্থ লক্ষ্যে আঘাত করার জন্যে দূর থেকে ছোড়া ছোট লাঠি। যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় পাবড়া।

† অসমীয়ায় 'সরুমা' শব্দটি 'ছুটকি'র প্রায় সমগোত্রীয়।

ভাবছিল। নেপাল হ্যান্ডবিলে থাকা নামগুলো দেখে বলে, ওর নাম থাক বর্ণনা। বাবা ঠোঁট বাঁকায়, তারপর জিগ্যেস করে, ওটা আবার কি ধরনের নাম? ভোলা বলে, ঠিক আছে, তুই কি বুঝিস? এগুলোই ভাল।

বর্ণনার জ্ঞানত শেষ যেবার কুয়োটার কাদা তোলা হয়েছিল, তখন তার বয়স সাত। কে কখন এই কাদা তোলার আর দরকার নেই বলে ঠিক করল; কেউই সঠিক বলতে পারে না। কিন্তু কাজটা বন্ধ হয়ে গেল। কুয়োর জল খাওয়ার লোক ধীরে ধীরে কমে আসছিল আর যখন বর্ণনার বয়স পঁচিশ বছর হল, তখন ওদের বাড়ির লোক কজনের বাইরে নিয়মিত কুয়োর জল খাওয়ার লোক বলতে আর কেউ ছিল না। পরে ওদের বাড়ির লোকসংখ্যাও কমে গিয়ে দুইয়ে দাঁড়াল।

পদ্ম বুড়োর কাছ থেকে বহুদিন আগেই নুরুদ্দিন পেশকার দু'শ টাকা দিয়ে এক বিঘা জমি কিনে রেখেছিল; এখন পেশকার জগমোহন নামের একটি লোককে জমিটা বেচবে এবং জগমোহন ঐ জায়গায় একটা তিনতলা বাড়ি তুলবে। সুতরাং পদ্মবুড়ো এবং ওর জমিতে থাকা চার ঘর লোক দুরে নদীর ওপারে খোলা জমিতে উঠে গেল। জগমোহন আগে ভাগে ঠিক ধরতে পেরেছিল— এদিকে অল্প দূরে প্রকাণ্ড লোহা-লক্কড়ের কারখানা হবে। এবং এর কোন এক পাশ দিয়ে বড় পাকা রাস্তা হবে। কিছুদিনের মধ্যে জগমোহন ছাড়াও সোহান সিং, রাধাকিষেণ, কালী চক্রবর্তীরা পাড়াটায় ঘোরাঘুরি করতে শুরু করল। হলীরাম, গজেনরা এ জায়গার জমি বেচে, সে টাকার অর্ধেকটা দিয়ে কদমগুড়ির দিকে অল্পটুকু জমি কিনল। কিছুদিন পর ওরা ওখানে উঠে গেল। যোগেশ্বরদের নিজেদের জমি ছিল না; রৌমারী বিলের ওদিকে সরকার রিজার্ভের জমি খুলে দিয়েছে জেনে ওরা সেখানে উঠে গেল, সঙ্গে রজনীরাও গেল। রম্ভাবুড়ি এখানেই মরে থাকল। বিড়ি ক্যনভাসার হরিপদর এ পাড়ায় আর থাকতে ভাল লাগল না, একদিন সে হারমোনিয়াম-তবলা-ডেকচি-বালতি রামবিরিজের ঘোড়ার গাড়িতে তুলে বিড়ি কোম্পানির গুদামের পিছনের একটা চালায় আশ্রয় নিল। যাওয়ার আগে ছুটকিদের বারান্দায় বসে সে 'তুমি যে বলিয়াছিলে, এ পথে ফিরিবে, গোধূলি লগনে, সে কি আজ ভুলে গেলে' গানটা প্রাণ ঢেলে তিনবার রিপিট করল।

তারপর এ পাড়ায় গাদা গাদা ইঁট, বজরি, বালি এল; হাতে কোদাল-ঝুড়ি-খন্তা নিয়ে দু'কুড়ি, তিন কুড়ি অবোধ্য ভাষাভাষী লোক এল, কর্কশ শব্দে বজরি বালি মেশানোর মেশিন এল; এটা কর, ওটা কর, ওটা করিস না ইত্যাদি বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হুকুম করার জন্য কয়েকজন সর্দার গোছের লোক এল। গোপন বিস্ময়ে বর্ণনা চেয়ে চেয়ে দেখল, বাইরে ভেতরে চারদিকে সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা চলছে। লজ্জায়-ভয়ে-উৎকণ্ঠায় সে কেমন গুটিয়ে গেল।

বর্ণনার বয়স যখন বিশ, তখন পাড়াটা দোতালা, তিনতলা পাকাবাড়িতে ছেয়ে

গেল। জগমোহনের পূর্ব ধারণা অনুযায়ীই বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে চওড়া পাকা রাস্তা হল; সেই রাস্তা দিয়ে আধমাইল দূরের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে দিনে রাতে ডিজেলের ট্রাক চলল, হীরা সেলাই মেশিন ছেড়ে একটা তিনতলা বাড়ির কোণায় বিড়ি সিগারেটের দোকান দিল; বর্ণনার বাবা মারা গেল; এবং তার পর পরই তার দুই দাদার মধ্যে শুরু হল বিবাদ।

বিশাল বিশাল পাকা বাড়িগুলোর চাপে বর্ণনাদের খড়ের ঘরটার যেন নাভিশ্বাস উঠল। ঘরটা, জোয়ান লোকের মাথায়, দেখলেই তুলে ফেলতে ইচ্ছে করে, এমন একটা পাকা চুলের মত ট্যাঙ ট্যাঙ করছিল। ভোলাদের ঢোকা এবং বেরোনোর রাস্তাটা বাঁকাচোরা হয়ে, সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমদিকের বাড়িটার ওপরতলা থেকে ফেলা আনারস-আলুর চোকলা ওদের বাড়ির ছাদে পড়ত। মা বর্ণনাদের বকাবকি করলে পুবের বাড়িটার ব্যালকনিতে কম বয়সে চশমা নেওয়া ড্যাপস টাইপের ছেলেমেয়েগুলো দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। নেপাল বলে, জমি বেচে দেব, খোলা জমিতে চলে যাব। ভোলা বলে, পৈতৃক ভিটা, কেন বেচব? এখানেই একদিন না একদিন দালান বানাব।

ভোলার চোখ দুটো দপদপ করে, ওর গলায় খাঁচার বাঘের গরগর শব্দ ওঠে। 'কি বললি? আরেকবার বল দেখি' নেপালের কথায় সার্কাসের রিং মাস্টারের চাবুকের শব্দের হিংস্রতা ফুটে ওঠে। ওদের মা দুজনের মাঝখানে পড়ে হা হা করে ওঠেন। বর্ণনা আড়চোখে পশ্চিমের বাড়ির ব্যালকনিটার দিকে তাকায়। ওর ছোট বোন রানী বান্ধবীর বাড়িতে যাবার জন্য দুই বেণী করে। নেপালের বৌ, রাতে যে ভাত রাঁধে রাঁধুক— এ রকম একটা ভাব দেখায়।

একদিন নেপাল ঠিক করে, জগমোহনকে তার ভাগের এক কাঠা পাঁচ লেচা মাটি বেচে দেবে। বৌকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। বাকিরা যেমন থাকতে চায় থাকবে। কেবল ঠিক করাই নয়, কদিনের মধ্যে কাজটা সে সেরেও ফেলল। জগমোহন আরেকটা তিনতলা বাড়ির প্ল্যান করে নীল রঙের অ্যামোনিয়া প্রিন্টের কাগজটা ভোলার সামনে মেলে ধরে তার ওপর সিগারেটের প্যাকেট রেখে প্ল্যানটা নিয়ে সমালোচনা করে। প্ল্যান করা ইঞ্জিনিয়ারটা বোকা। তাকে আমি বার বার বোঝালাম; আমার জমি এক কাঠা পাঁচ লেচা, ভোলাবাবু বাকি এক কাঠা পাঁচ লেচা জমি কখনই বেচবে না। তবু ও ব্যাটা আড়াই কাঠা জমির ওপর প্ল্যান বানাল। বলে এত কম জমিতে তিনতলা বাড়ি আন-ইকনমিক হবে, বাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখাই মুশকিল হবে। হুঁঃ! বড় ইঞ্জিনিয়ার এসেছেন।

তারপর হঠাৎই সুর পাল্টে জগমোহন খুব মোলায়েম সুরে বলে, 'কি করি বল দেখি ভোলাবাবু। বড়ই বিপদে পড়েছি।'

সিগারেটের প্যাকেটে কটা সিগারেট আছে যেন সেটাই দেখছে এমন ভাবে

নির্বিকার কণ্ঠে ভোলা বলে, 'আপনি কি করবেন আমি তার কি জানি; আমি কিন্তু জমি বেচবনা, এক কথা।'

জগমোহন যা ভাল মনে করল তাই করল, আর আনন্দের কথা; সেটা ভোলারও ভাল মনে হল। ভোলার সঙ্গে লিখিত চুক্তি হল, তিনি আড়াই কাঠা জমির ওপর তিনতলা বাড়িটা তুলবেন; নেপাল যত টাকায় জমি বেচেছিল ঠিক তত টাকা নগদে এবং ওই বাড়ির সামনের দিকে একতলায় তিনটে কামরা ভোলাকে দেবে।

বাড়ি যতদিন তৈরি না হচ্ছে ততদিন তিনি ভোলাদের থাকার জন্য একটা দু'কামরার বাড়ি ঠিক করে দিলেন। সেই দুটো কামরায় থাকতে গিয়ে বর্ণনাদের সবচাইতে আনন্দ হত ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে। শান-এর ওপর ঝাঁটাটা পিছলে পিছলে যায়। আর সবচেয়ে অসুবিধা ছিল রাতে মশারি টানানোর সময়। দেওয়ালে দড়ি বাঁধার বাতা-টাতা কিছুই নেই।

এক সময় জগমোহনের বাড়ি তৈরি সম্পূর্ণ হল। একদিন তার মেদবহুল স্ত্রী বাড়ির সদর দরজায় সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিকা আঁকলেন, তার একই রকম চেহারার তিন বৌ গাল ফুলিয়ে শঙ্খ বাজল। ভোলারা মিষ্টি খেল।

এ বাড়ির কামরা একটা বেশি হল, কিন্তু লোক একজন কমল। বর্ণনার বোন রানীর দু'কামরার সংসারে দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। জগমোহনের কন্ট্রাকটর রবিকুমার এক আকাশ মুক্ত বাতাসের সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসের লেনদেন করে এ কথা জানতে পেরে রানী অভিভূত হয়েছিল। সে বাতাসে রবিকুমারের নিঃশ্বাসের উত্তাপ অনুভব করতে শুরু করেছিল। রাতে ঘুমের মধ্যে দিদি ওর গায়ে একটা পা তুলে দেবে, আর সেই পায়ের ভার শরীরে নিয়ে সে রাতের পর রাত জেগে থাকবে, এ ব্যবস্থা তার অসহ্য বোধ হল। জগমোহনের ঘর তৈরির কাজ যখন প্রায় শেষ, এমন সময় একদিন সে এক কাপড়ে রবিকুমারের সঙ্গে চলে গেল। সঙ্গে নেওয়ার মত কিছুই তার ছিল না, নেওয়ার প্রয়োজনও ছিল না। ওসব রবিকুমারের ঢের আছে। তাছাড়া রবিকুমার ওকে প্রায়ই বলত, 'তুমি যা পরো তাতেই তোমাকে খুব সুন্দর লাগে।'

কথাটা সত্যি। বর্ণনাও তাকে এ কথা অনেক দিন বলেছে, কিন্তু কথাটা এমন ভাবে সত্যি হবে, সে ভাবতে পারেনি। দিন দুয়েক সে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে সবার আড়ালে গুম মেরে নানা কথা ভাবল, তারপর গায়ের জল ঝরাতে পাখি যেমন গা ঝাড়া দেয় তেমনি মনকে ঝাড়া দিল, সে আর কিছু ভাববে না। তারপর থেকে, তখন তার বয়স বাইশ, নিশ্চিন্ত হওয়ার চেষ্টা করে করে এই পাকা ঘরের সংসারে এসে ঢুকল।

গোটা জায়গাটা বাড়িতে বাড়িতে ঠাসাঠাসি আর বাড়িগুলো মানুষে মানুষে ঠাস জমাট। সেন্ট্রাল স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রীনিবাসনের জ্যোতির্বিদার প্রতি বড়ই আগ্রহ। তিনি রাতে তিনতলার ছাদে উঠে হাতে একটা টেলিস্কোপ নিয়ে শনিগ্রহ খুঁজে ফেরেন, আর একেকবার হঠাৎই পেয়েছি পেয়েছি বলে চিৎকার করে শালীকে কাছে ডেকে নেন,

শালীর অস্বস্তি হয়, জবরদস্তি ওর হাতে তুলে দেওয়া টেলিস্কোপটা নিয়ে ও না দেখেই শনিগ্রহটা দেখেছি বলে। বয়লার ইঞ্জিনিয়ার পরিতোষ নিজেই দুধ নিতে বুথে আসে এবং না পাওয়া পর্যন্ত ডাগর ডোগর কয়েকটা ফ্রক পরা মেয়েকে দুধ কি করে প্যাশ্চুরাইজ করা হয় তাই বোঝায়। ট্যাক্স ইন্সপেক্টার মুকুন্দলাল তার গাড়িটা স্টার্ট করার জন্য হাতের কাছে দু-একটা ছেলেকে ধরে আগে-পিছে ঠেলাঠেলি করায়। জব্বলপুরে রিটায়ার করে ছেলের সঙ্গে বাস করতে আসা শিবচরণজি ছ' ফুট— বারো ফুট জমিতে গাজর, বিট, ফ্রেঞ্চবিনের চাষ করেন।

টেলিফোন অপারেটার মনোরমাকে তার স্বামী সকালে স্কুটারের পিছনে চড়িয়ে অফিসে দিয়ে আসে এবং জ্যোৎস্না রাতে কুয়োর পাশের খোলা জায়গাটায় স্কুটার চালানো শেখায়। পার্থপ্রতিম নামে ছেলেটা ইয়ং বয়েজ নামে একটা ক্লাব খোলার জন্য মিটিং করে এবং চাঁদা তোলে। তার সঙ্গী সাথী অনেকেই সাদা প্যান্ট, সাদা শার্ট আর কপাল ঢাকা দেওয়া সাদা টুপি কিনে ক্রিকেট প্লেয়ার-সদৃশ চেহারা বানাতে চায়। এরা ক্রিকেট খেলে না, কিন্তু হাতে একটা পাথর পেলে সেটা বোলারের ভঙ্গীতে দূরে ছোড়ে। সুযোগ পেলে দুনিয়ার সব স্টাম্প উড়িয়ে দেবে, এমন একটা ভাব ওদের। এই কলোনির সবচাইতে সুন্দরী মেয়ে ইভাকে সদাসর্বদা রাস্তায় জ্বালাতন করত বলে রাস্তার ওপারের কলোনির কিশোর নামে এক মাস্তানকে ওরা একদিন ধরে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিয়েছে।

মাঝে মধ্যে তিন মাইল দূরের নদীর ওপারের গ্রামটা থেকে মধু আর কনতিল এদিকে বেড়াতে আসে। এখন ওরা বড় হয়ে গেছে। জগমোহনের কাছ থেকে পাওয়া নগদ পয়সায় ভোলাও হীরার দোকানের পাশে একটা চালা তুলে তেল নুনের দোকান দিয়েছে। তার দোকানেই মধুরা খবরাখবর নেয়; কেমন চলছে ভোলাদা।

ভাল না, কোন মতে টুকটাক। ওর দোকানে যে সব জিনিস আছে, সে-সব জিনিস লোকেরা বড় দোকান থেকে মাসকাবারি একবারে কেনে। অতএব ভাল চলছে না। জুটমিলের অফিসার একজন, এরই একটা ফ্ল্যাটে থাকে, ভোলাকে বলেছেন, কারখানায় একটা চাকরি দিয়ে দেবেন। কিন্তু চাকরিটা করতে হলে ওকে এই জায়গা ছাড়তে হবে।

মধুরা বর্ণনার কাছে গিয়ে বসে। পাকা ঘর, পাকা মেঝে, কিন্তু ঘরগুলোর চেহারা বড় কুৎসিত। জগমোহন এই তিনটে ঘরে কোন ইলেকট্রিকের বন্দোবস্ত রাখেনি। ধোঁয়ায় দেয়ালগুলো কালো হয়ে গেছে। কোণায় একটা দড়িতে একটা জামা, একটা লাল্‌চে পায়জামা এবং একটা গামছা ইলেকট্রিকের তারে ঝোলা বাদুড়ের মত ঝুলছে। বর্ণনার মা যেখানে বসেন, সেখানে তার মাথার তেলের একটা কালো ছোপ পড়েছে। বুড়ির দাঁত পড়েছে, গালে কালো কালো ছোপ ধরেছে। এখন আর চোখেও ভাল দেখতে পান না। 'কে? রজনী না কি?'

'না পিসি, আমরা মধু আর কনতিল।'

বুড়ি নদীর ওপারের সবার খবরাখবর নেয়। বলরাম ভাল আছে? ছেলেরা বিষ্ণুর চিকিৎসা ঠিকঠাক করাচ্ছে তো? মানিকীর ছেলেমেয়েগুলো না কি দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে?

কনতিল বর্ণনাকে জিগ্যেস করে, 'ভাল আছেন বাইটি*?'

বর্ণনা উত্তর দেয়, 'চা বানাচ্ছি। খেয়ে যাবি। চট করে চলে যাস না যেন।'

ওরাই এখনও বর্ণনাকে 'বাইটি' বলে ডাকে। এ পাড়ায় ছেলেমেয়েরা ওকে দিদি বলে ডাকে। কুয়োর পাড়ে বসে আড্ডা মারা ছেলে-ছোকরারা ওকে হেসে জিগ্যেস করে, 'দিদি, তোমার কচ্ছপটা ডিম পাড়ছে তো?'

জগমোহন বর্ণনাদের ঘরে জলের ব্যবস্থা রাখেনি। কাছাকাছি কোথাও ট্যাপও ছিল না। বর্ণনারা কুয়োর জলই খেতো। পরিতোষবাবুর বিধবা বৃদ্ধা মা বর্ধমান শহর থেকে সাত মাইল দূরের এক গ্রামের কুয়োর জল ব্যবহারে অভ্যস্ত; তিনি ঠাকুরঘর মোছার জন্য এবং ঘটে জল দেবার জন্য প্রতি বৃহস্পতিবার কুয়োর জল আনান। এর বাইরে কুয়োর জলের সঙ্গে এ পাড়ার কারো কোন সম্পর্ক নেই! ভোলা একদিন নদীর পারের গ্রাম থেকে একটা কচ্ছপের বাচ্ছা ধরে এনেছিল। বর্ণনা বাচ্ছাটাকে কুয়োয় ছেড়ে দিয়েছিল। জল আনতে গিয়ে ও সব সময় বাচ্ছাটাকে খেয়াল করে, কখনও অনেক চেষ্টা চরিত্র করে বালতিতে করে ওটাকে তুলে আনে। দেখে কতটা বড় হল, তারপর আবার বালতিতে করে নামিয়ে দেয়। যে ছেলেগুলো আড্ডা মারে তারা কখনও ভেসে থাকা কাছিমটাকে ছোট ছোট নুড়ি দিয়ে নিশানা বানায়। কিন্তু আশেপাশে নুড়ি পড়লেই কাছিমটা ডুব মারে।

কুয়োর পাড়ে বসে মধু, কনতিল আর ভোলা এক সময় কার কোথায় বাড়ি ছিল বার করার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। এ রকম কুয়োর পাড়ে বসলে ভোলা প্রায়ই নীরব থাকে। মাঝে মধ্যে স্বগতোক্তির মত বলে ওঠে, 'আমিও ভাবছি চলেই যাব। ভাল্লাগছে না বুঝলি?'

কনতিলরা ওর কথার পিছনের ব্যাপারটা বোঝে। ওরা প্রশ্ন করে, 'নেপালদা খোঁজ খবর নেয় না?'

ভোলা কোন কথা বলে না।

'রানীরা আসে তো মাঝে মাঝে?'

আসে। রানী আর রবিকুমার শহরের মাঝামাঝি জায়গায় থাকে। ওরা মাঝে মধ্যে আসে। ঘণ্টাদুয়েক থাকে। রানী তার ছেলের জন্য একটা ফ্লাস্কে দুধ, একটা ফ্লাস্কে গরম

* অসমীয়াতে দিদিকে "বাইদেও" বলা হয়। আদর করে "বাইটি"। ইদানীং এদের মধ্যে দিদি ডাকও চলে।

জল, বদলানোর জন্য কাপড়, মোছার জন্য তোয়ালে, চামচ, বিস্কুট সব নিয়ে আসে। তার থেকে দুটো বিস্কুট মাকে দেয়, মা জলে ভিজিয়ে নরম করে খায়। বিস্কুটের ছোট একটু টুকরো বৃদ্ধা নাতির মুখে দিতে গেলেই রানী হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'ওকে দিবি না, দিবি না, এখন ও কিচ্ছু খাবে না।' কথাটা বলে ও হাতের ঘড়িটা দেখে, তারপর ব্যান্ডটাকে টেনে ঠিক জায়গায় আনে।

কখনও এদিকের হলে সিনেমা দেখতে এসে রানী বড় বাস্কেটটার সঙ্গে ছেলেটাকে বর্ণনার কাছে গছিয়ে যায়। বাস্কেটটার ভেতরের জিনিসগুলো সম্পর্কে ও বর্ণনাকে বক্তৃতা দেয় — চামচটা গরম জলে ধোয়া আছে। যেখানে সেখানে রাখবি না, চিনি দু চামচ, দুধ খাওয়ানোর আগে গলায় বিব্‌টা বেঁধে দিবি, জাঙিয়া পালটানোর সময় এটার থেকে একটু পাউডার দিয়ে নিবি। কাঁদলে এভাবে পিঠে আস্তে আস্তে চাপড়ে একটু মেন রোডে ঘুরিয়ে আনলেই ও ঘুমিয়ে পড়বে। যাওয়ার সময় সে রবিকুমারের ঘড়িটা বর্ণনাকে দিয়ে যায়, দুধ খাওয়ানোর সময় দেখার জন্য। কখনও সিনেমা দেখে ফিরে ছেলেটাকে কাঁদতে দেখলে, 'ও আমার সোনা, তোমায় আমি ফেলে রেখে গিয়েছিলাম? কাঁদে না, কাঁদে না, এই তো আমি এসে গেছি' বলে তাকে আদর করে আর বর্ণনা যে এই সামান্য কাজটাও করতে পারে না তার জন্য মুখ গোমড়া করে থাকে।

বর্ণনার বয়স যখন ত্রিশ বছর তখন ভোলা জুটমিলের চাকরিটা পেল। চাকরিতে জয়েন করতে যাওয়ার সময় সে বর্ণনার দিকে ভাল করে তাকায়ওনি। মাকে বলে গিয়েছিল বেশি দূর তো নয়, সপ্তাহে সপ্তাহে আসবে। হীরাদা থাকল, কনতিল মধুদেরও সে বলে রেখেছে। ওরা খবর-টবর নেবে।

নিচ্ছে। এ অঞ্চলের লোকজন খবর-টবর নিচ্ছে। বস্তুত বর্ণনার খবর নেওয়ার লোক প্রয়োজনের চাইতে বেশিই হয়ে গেছে। কনতিল মধুরাও মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করে।

কিন্তু আস্তে আস্তে লোকজন আর ঠিকমত খবর পাচ্ছিল না। খবরগুলো যেন ফুটো বন্ধ হয়ে যাওয়া হ্যারিকেনের ভেতর ধোঁয়ার মত হয়ে যাচ্ছে, উঠছে নামছে ফলে চিমনিটা ক্রমশ কালো হয়ে যাচ্ছে।

তারপর একদিন, ভোলা যাওয়ার প্রায় একবছর পর মাঝরাতে, কুয়োটার জল থেকে পাকা চাকগুলোতে ধাক্কা খেতে খেতে একটা বিকট শব্দ গুম গুম আওয়াজ তুলে উপরে উঠে এল। ঝুপঝাপ বাড়িগুলোর কয়েকটার লাইট জ্বলল, খুটখাট শব্দে দরজা খুলে গেল, কয়েকটা জানালা খুলল, ব্যালকনিগুলোতে লোকজন এসে দাঁড়াল। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল, কি? ঘটনাটা কি? কোথায় ঘটল?

বর্ণনার বৃদ্ধা মা বিছানা থেকেই জিগ্যেস করল, 'কোথায় কি হল রে? কি রে? শুনছিস? কোথায় গেলি তুই?'

বর্ণনা কোথায় অছে সেটা হদিশ করতেই সবার এক ঘণ্টার চাইতে বেশি সময়

লেগেছিল। মুকুন্দলাল শিকার করার পাঁচ ব্যাটারির টর্চ কুয়োর জলে ফেলে একটা গলা ফাটানো চিৎকার করেছিল। পোষা ডিম না পাড়া কাছিমটার মাথায় যারা ঢিল মারত সেই ছেলেগুলো ভয়ে স্তব্ধ হয়ে দূরে দূরে দাঁড়িয়েছিল। হীরাদা দৌড়েছিল নদীর ওপারের গ্রামে। মনোরমার স্বামী স্কুটার নিয়ে কোঁ কোঁ করে ছুটেছিল রবিকুমারের বাড়ি খুঁজতে। মনোরমা জুটমিলে ট্রাঙ্ককল করবে বলে উত্তেজিত কণ্ঠে জিগ্যেস করেছিল, 'কে ? বিজনবাবু নাকি? আচ্ছা শুনুন বিজনবাবু, আমি মিসেস গুহ বলছি।' তারপর তিনি অকস্মাৎ ধমক দিয়ে বলেছিলেন 'আহ্ রাখুন তো আপনার ঠাট্টা। শুনুন—'

তারপর মিসেস গুহর মনে পড়ল, পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড।

পুলিশ এল। ফায়ার ব্রিগেড চট করে এল না। নদীর ওপারের গ্রাম থেকে মধু, কনতিল, নিবারণ, বলরাম বুড়ো— একঝাঁক লোক দৌড়ে এল। অসুস্থ শরীরে বিষ্ণু কর্তাও এলেন। ওরা পালপাড়ার মই নিয়ে এল, বাঁশ আনল, মোটা শনের দড়ি জোগাড় করল। এক সময় মধু মই বেয়ে নিচে নেমে গেল।

পাড়ে জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো ছোটখাটো কথা বলার ফাঁকে চিন্তা করছিল, মেয়েটা আবার কিছু লিখে-টিকে রেখে গেছে নাকি? যদি লিখেই থাকে, কি লিখেছে? আমার কথা আবার কিছু লেখেনি তো? মেয়েটিকে দিদি বলে যারা ডাকত তাদের থেকে শুরু করে আকাশের তারার পিছনে আদিঅন্ত খুঁজে ফেরা শ্রীনিবাসন পর্যন্ত সবাই কথাটা ভেবে উদ্বিগ্ন বোধ করেছিল। পরিতোষবাবু কিছুদিন আগে মিসেসের অসুখের সময় মেয়েটিকে থালা বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, আগের বাচ্চাটাকে রাখার কাজে লাগিয়েছিলেন, তিনি সবচাইতে বেশি ভয় পেয়েছিলেন।

শনের দড়িটার মাথায় একটা বাঁশের টুকরো বেঁধে মধু তার ওপর পা দুটো রেখে নিল, তারপর ও বর্ণনার দেহটাকে দড়ি দিয়ে জড়িয়ে নিল। কুয়োর মুখে একটা বাঁশ পেতে তার ওপর দিয়ে কনতিলরা ওপর থেকে দড়িটা টানতে আরম্ভ করল। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে জাপটে ধরায় বর্ণনার চামড়ার নিচে হাড়ে ব্যথা লাগছে বলে মধুর চিন্তা হচ্ছিল। তার ঝুলে পড়া মাথাটার কাছে বার বার মুখ নিয়ে মধু ডাকছিল, 'বাইটি, বাইটি।'

পাড়ের অনেকেই উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্ট করছিল বর্ণনা কোন উত্তর দেয় কি না?

না, ও একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি।

অনেক বছর আগে বৃদ্ধ বলরাম যখন শিশু সে সময় কুয়োতে একটা বেড়াল পড়েছিল। তখন কুয়োটার কাদা তুলে জলে পটাশ দেওয়া হয়েছিল। সাত দিন যাবৎ লোকেরা কুয়োর জল খায়নি।

এখন? বলরাম কাকে যেন বললেন, 'অন্ততঃ বুড়ি মানুষটার খাওয়ার জলের তো একটা ব্যবস্থা করতে হয়।'

'পিসি কি আর এখন এই কুয়োর জল খাবে না কি?' কনতিল প্রশ্ন করল।

বড় একটা আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর নাম শোনার মত ভাব করে বৃদ্ধা বললেন, 'খাব রে বাপু খাব।'

লোকজনরা ঠিক করল যে তারা অন্তত কুয়োটার কাদাটা তুলে দিয়ে যাবে। পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেডের লোকেদের সঙ্গে ব্যবস্থা করল, কুয়োটার কাদা তোলা দরকার। যদি কোন প্রমাণ পাওয়া যায়।

অতএব বহু বছর বাদে আজ আবার কুয়োটার কাদা তোলা হচ্ছে। কাদা তোলা দেখতে আসা মানুষের ভিড়ে কুয়োর পাড় উপচে পড়ছে। কাদার সঙ্গে কি কি উঠে আসে দেখার জন্য পুলিশ কাদা খুঁচিয়ে দেখছে।

কাদার সাথে মোটরগাড়ির পুরনো বুশ উঠেছে, কেরোসিনের স্টোভের নিচের তেল রাখার জয়গাটা উঠেছে; হেরিং মাছের খালি কৌটো উঠেছে; কনডেন্সড মিল্কের খালি কৌটো উঠেছে; ফাটা ক্রিকেট বল উঠেছে; ফিতে ছেঁড়া হাওয়াই চপ্পল উঠেছে; ধরা না পড়ার চেষ্টা করে করে অবশেষে ধরা পড়ে যাওয়া কচ্ছপটা উঠেছে; অসংখ্য বিয়ারের বোতল উঠেছে; বিভিন্ন আকৃতির মদের বোতল উঠেছে। —

সন্ধ্যাতারা

বিমলা এবং রমলা দু'জোড়া বাক্সে কাপড় খুঁজে পেতে তাড়াহুড়ো শুরু করে দিল। ওরা দোল খেলবে। আর দোল খেলা মানেই এক জোড়া কাপড় কমে যাওয়া। কার হাতের কত রং এসে ওদের কাপড়ে আশ্রয় নেবে তার ঠিক নেই, তারপর সে কাপড়টা আর কাপড় থাকবে নাকি? থাকবে না। একবার ধুয়ে নিলে হাত-পা ধোওয়ার কাজে অবশ্য লাগানো যাবে, কিন্তু শুধু হাত-পা ধোওয়ার জন্য একটা পুরো কাপড় নষ্ট করে ফেলার মত অবস্থা ওদের নয়। এমনিই ওদের কাপড়-জামা অনেক কম। খারাপ হয়ে গেছে বলে যে কাপড়টা পরে বিমলা দেওয়াল লেপা, রোয়াক মোছার কাজ করে, অনেক সময় না পেয়ে রমলাকে ওটা পরেই অতিথিকে একগ্লাস জল দিতে চলে আসত হয়।

দূর থেকে মাঝে মাঝে অল্পবয়সের ছেলেপিলেদের চিৎকার এবং হৈ-হল্লার শব্দ ঘরের মধ্যে এসে পৌঁছাচ্ছিল। একবার তেমন একটা চেঁচামেচি খুব কাছেই মনে হল। 'ওই এল' বলে রমলা তাড়াতাড়ি আলনা থেকে একটা চাদর তুলে নিল। দু'হাতে চাদরটা মেলে এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে 'এটা গেছে, এটাই আমি নিই তাহলে'।

দিদি ঘরের কোণায় দড়ির ওপর মেলে রাখা কাপড়গুলোর ভাঁজ উল্টেপাল্টে দেখছিল। রমলার হাতের কাপড়টা দেখার জন্য 'দেখি কোন্‌টা' বলে ও এগিয়ে এল এবং চাদরটা চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ও আমার সোনার চাঁদ রে, আর কাপড় খুঁজে পেলে না। দে শিগগির আমার এত ভাল চাদরখানা, ইস, একটু ফেঁসেছে বলে আমি না পরে রেখে দিইছি, পাছে ফেটে যায়; উনি দোল খেলার জন্য বার করছেন! ওখান থেকে সর, ওখানে আমি ভাল কাপড়গুলো বেছে রেখে দিইছি।'

রমলাদের আলনাটা দু'খোপের, যে দুটো পায়ার ওপর আলনাটা দাঁড়িয়ে থাকে তার একদিক উইয়ে খেয়ে শেষ করেছে। বেড়ার বাঁশের একটার খুঁটির সঙ্গে নারকেলের দড়ি দিয়ে বেঁধে আলনাটাকে সোজা করে রাখা হয়েছে। ওদের দুজনের

মধ্যে কাপড় অগোছালো হয়ে থাকার জন্য তর্ক লাগলে প্রায়ই ঠিক হয় ওপরের রডটা বিমলার এবং নিচেরটা রমলার, কয়েকদিন এ রকম থাকেও, কিন্তু কদিন পরে বিবদমান দুই প্রতিবেশীর কচি মনের ছেলেমেয়েদের মত দুজনেরই কাপড় মিশে যায় এবং রমলা একদিন বিকেলের দিকে দিদির একটা ভাল মেখলা চাদর পরে বাইরে আসে।

কৃত্রিম রাগে নিচের ঠোঁটটা বেঁকিয়ে রমলা চাদরটা আলনায় রেখে দিল। কোণার দড়িটা থেকে বিমলাই দু'জোড়া কাপড় বেছে বার করল, ফুল তোলা সুতির মেখলা; ফুলগুলো চটে গেছে, কোন্‌কালে ঝরে পড়া ফুলের মত ফুলগুলো কুঁচকে মুচকে গেছে। ব্লাউজে শরীরটা ঠিক প্রয়োজন মত লুকিয়ে নেবে, আর একটু বুদ্ধি করে পরতে পারলে কুঁচির মধ্যে মধ্যে কাপড়ের ফাটা জায়গাগুলো ঢাকা পড়বে।

বিমলা ভেবেছিল একবার সুঁচ-সুতো দিয়ে এখানে ওখানে দু-একটা ফোঁড় দিয়ে নেবে। কিন্তু দূরের বাচ্ছাদের কিচির মিচির শুনে ওর মনে হল যে কোন সময়ে ওরা এসে পড়তে পারে। ওদের দুজনের শরীর এবং কাপড় যে শেষ হবেই এ জানা কথা। কেবল ভেতরের কাপড়-জামা, বিছানা-পাটিগুলো বাঁচলেই হল। অতএব ওরা দুজন চট করে বাইরে বেরোতে পারলেই হল।

রমলা রান্নাঘর থেকে গতকাল সন্ধ্যায় জামাইবাবুর আনা আবির এবং নীলের প্যাকেটটা বার করে নিয়ে, 'আয়, আজ কে কে আসবি সবকটাকে ভূত বানাব।' বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে এল। বাঁশের গেটটা যে তাম্বুল গাছটার সঙ্গে বাঁধা, সেটায় হাতের ভর দিয়ে একবার চারদিক দেখে নিল। নরম রোদ উঠেছে, মাঝে মাঝে একটা বাতাসের ঢেউ আসছে। মাথায় গুঁড়ো গুঁড়ো কিছু পড়াতে, রমলা মাথা তুলে ওপরে দেখল, তাম্বুল গাছের পাতা বাতাসে নড়ছে। আজ দোল বলেই কি না কে জানে, রমলার মনটা কোন এক অজ্ঞাত কারণে আনন্দে ফুরফুরে লাগছিল।

একটু পরে বিমলাও বেরিয়ে এল। আসা যাওয়া করা রাস্তাটার পাশে বাঁশের গেটটা ধরে দাঁড়াল, এবং তারপর দুজনে মিলে সামনের রাস্তাটার যদ্দূর অবধি দেখা যায় দেখতে থাকল।

দূরে কয়েক দল ছেলেমেয়ে দৌড়াদৌড়ি হুড়োহুড়ি করছে, কোন্ সময় ওরা এখানে এসে হাজির হয় ঠিক নেই। দূরের ছেলেমেয়েদের অবশ্য আসারই দরকার হয় না; এ পাড়ার ছেলেমেয়ের দল বেরিয়ে পড়লেই বিরাট হুলুস্থুল লেগে যাবে।

এ পাড়ায় প্রত্যেকটি বাড়ি অবস্থাপন্ন। তিনটে বাড়িতে দুটো করে গেট, তার একটায় আবার গাড়ি আছে। প্রায় সব বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এক রকম পোশাক পরে স্কুলে যায়। এক বাড়ির একটি সুন্দরী মেয়ে খুব ভাল গান করে এবং কি সব বাজায়। এক বাড়িতে একটি প্রকাণ্ড কুকুর আছে; তার ডাকে গোটা পাড়া অস্থির করে তোলে। রমলাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে যে বাড়িটা, সেই বাড়ির

কর্তা, কেউ বাগানের কোন ফুলে হাত দিলেই তেড়ে আসে। পাড়ার ভেতর আরেক ঘরের লোক মরে হেজে হাওয়া, ঘর দরজা ধসে শেষ; এদের মধ্যে যে লোকটা একমাত্র বেঁচে সে মুম্বাই না কোথায় যেন থাকে এবং ওখানেই থাকবে। লোকবসতির চিহ্ন হিসাবে বিশাল চতুঃসীমার মধ্যে অনেক পুরুষ আগে খোঁড়া একটা পুকুর আছে। আর পুকুরের জল একেবারে নিচে নেমে গেছে। পুকুরটাকে পিছনে রেখে পোড়ো মাঠটায় রমলার জামাইবাবু পদ্ম মাস আষ্টেক আগে বাঁশ-বিচুলি দিয়ে একটা ঘর বানিয়ে নিয়েছে। বিমলাকে পদ্ম বিয়ে করার পর রমলার আপন বলতে আর কেউ রইল না। সেহেতু সেও দিদির সঙ্গেই থাকে।

এ পাড়ার বাসিন্দাদের সঙ্গে রমলাদের আসা-যাওয়া ডাক-খোঁজের সম্পর্ক খুবই কম। কখনও কোন ছেলের ওড়ানো ঘুড়ি কেটে গেলে পোড়ো জমিটায় এসে পড়লে একঝাঁক বাচ্ছা ছেলে রমলাদের বাড়ির চারদিকে পিল পিল করে চলে এসে ঘুর ঘুর করতে থাকে; বিমলা আর রমলা তখন সনাক্ত করার চেষ্টা করে কোন্‌টা কোন্‌ বাড়ির ছেলে। রাস্তায় খেলতে খেলতে বাচ্ছা মেয়েরা কখনও কখনও রমলাদের গেটের কাছে এসে হাঁফাতে থাকে, রমলা এবং বিমলা আদর করে ওদের নাম জিগ্যেস করে। ওরা চলে যাওয়ার পর দুজনে মিলে ওদের চেহারা, চুল, গালের প্রশংসা করে, ওরা যা দু-এক কথা বলে যায় তাই নিয়ে গরীব ছেলের হাতে লেগে থাকা মিষ্টির রসের মত জিভের ডগায় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে।

এই ছেলেমেয়েরা আজ দোলের দিনে শুধু শুধু ছেড়ে দেবে? রমলা গলা উঁচু করে যে কটা গেট দেখা যায় দেখল; এখানে ওখানে দু-একটি ছেলেমেয়ে দৌড়াদৌড়ি ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে বটে, কিন্তু তেমন করে দল বেঁধে বেরোয়নি। হয়তো সকালবেলা অন্য পাড়ায় গেছে; গেলেও নিশ্চয় আসবে।

হঠাৎ একবার কাছের মোড়টায় একদল লোক দেখা গেল। মানুষগুলোর চুল সব সাদা আর মুখ কালো, গায়ের কাপড়-জামার রং অবর্ণনীয়।

বিমলা লোকগুলোর ভেতর থেকে অন্তত একজনকে চিনে বের করার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ও জিগ্যেস করল, 'কারা রে ওরা, তোর জামাইবাবুদের দল নয়তো?'

রমলা যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে দেখল, তারপর বলল, 'না, জামাইবাবু তো ফুলপ্যান্ট পরে গেছে। জামাইবাবু এখন এখানে কোত্থেকে আসবে।'

পদ্মর সঙ্গীরা সব, ওরা যে কারখানায় কাজ করে তারই আশেপাশে থাকে। ওখানে, ওদের সঙ্গে পদ্মর ঘুরে-বেড়ানো, হাসি-তামাশা সব কিছু। দোলের দিন বলে ও সকালেই ওদের কাছে চলে গেছে।

এমনিতেও পদ্ম ঘরে প্রায় থাকেই না। সকালে বেরিয়ে যায় আর সন্ধ্যা আটটা নাগাদ একটা বাজারের থলি হাতে ঘরে ঢোকে। তখন থেকে শোওয়ার সময় পর্যন্ত

এই সামান্য সময়টুকুও তার ঘরে মন টেঁকে না, সেই কারণেই কি না, এলেও সে দু-একটা সঙ্গী জুটিয়ে আনে। বিমলা এবং রমলাকে ওদের চা করে দিতে হয়, কখনও এনামেলের বাটিতে নুন, তেল, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে জুত করে মুড়ি মেখে দিতে হয়। এই দলের মধ্যে একজন প্রায়ই আসে। তার নাম কংস। পদ্ম আর বিমলা ঠিক করেছে, রমলাকে কংসের সঙ্গে বিয়ে দেবে। বিমলা কিন্তু সর্বদাই সন্দেহ প্রকাশ করে, ও সত্যিই রমলাকে বিয়ে করবে তো? নাকি শেষমেশ টুপ করে ডুব মারবে? পদ্ম জোর দিয়ে বলে, 'করবে, করবে, না করবে কেন?'

আর এই সন্দেহ, জোর প্রতিশ্রুতির ভেতর দিয়ে দিয়ে, রমলা, তিনটি বাঁশের তৈরি দীর্ঘ সেতু দিয়ে ছাগল যেমন ওপারের শ্যামল বনানীতে চলে যায়, তেমনি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন বনানী থেকে ফিরে আসতে গেলেও অতটাই পথ।

মোড়ের লোকগুলো হঠাৎ এদিকে ঘুরল। ওদের চেহারা দেখেই বোঝা যায় ওরা বড় নোংরা রং খেলছে; আলকাতরা, সুটকেসের রং এই জাতীয়। বিমলা এবং রমলা একবার চোখাচোখি করল। লোকগুলো এগিয়ে আসছে। রমলা দিদিকে জিগ্যেস করল, 'আমাদেরও দেবে না কি রে?'

'নাহ্ ছেড়ে দেবে!' বিমলা জবাব দেয়।

'ওরে ব্বাবা এসব রং লাগাতে পারব না। পালাই ভাই!' বলে রমলা বাঁশের গেটটার আড়ালে গেল। দলটা আরও আরও একটু এগিয়ে আসার পর বিমলাও পিছিয়ে এল। লোকগুলো যে ওদের দুজনকে দেখেছে সেটা নিশ্চিত, ওরা যদি হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে! বিমলা আর রমলা না হয় দৌড়ে এসে ভেতরে দোর দিল, কিন্তু ওরা যদি দরজা বেড়া ধাক্কাতে থাকে, পিছনের দুর্বল দরজাটা ভেঙে ঢুকে পড়ে ওদের ল্যাটাপ্যাটা করে? অবস্থাটা ভেবে রমলার হাসিই পেল।

দলটা এগিয়ে আসছে, ওদের কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কোন এক বুড়োর চীনেবাদাম বলে ব্যঙ্গ করা নামটা কিভাবে এল, তাই নিয়ে ওরা কথা বলছিল। দলটা ওদের গেটের সামনে এসে পৌঁছল। এবং বৃত্তান্তটাও ওখানেই শেষ হল। ওরা এর ওর গায়ে ঢলে পড়ে হাসতে লাগল। হাসতেই লাগল; এবং হাসতে হাসতেই ওদের সদর পেরিয়ে চলে গেল।

বিমলা এবং রমলা আবার বেরিয়ে এল। রমলাই ধীরে বলল, 'বড় বাঁচা বাঁচলাম।' একটু থেমে ও আবার বলল, 'আর আমাদের দেবেই বা কেন, বাচ্ছা ছেলেমেয়ে হলেও না হয় একটা কথা ছিল।'

দুপুর গড়িয়ে গেল; পাড়ার ছেলেমেয়েরা ফিরেই আসেনি এখনও। রমলা একবার ভাবল হয়তো ওরা অনেক দূরে গিয়ে থাকবে। ও একটু বিরক্তও হল। নিজের পাড়া থাকতে অন্য পাড়ায় রং খেলতে যাওয়ার কি দরকার। অন্য পাড়ার ছেলেমেয়েরা এখানে কজন এসেছে।

ছেলেমেয়েরা আসলে একটা ট্রাকে চড়ে রং খেলতে গিয়েছিল। একটা নাগাদ ট্রাকটা মোড়ের মাথায় ওদের নামিয়ে দিল। নোংরা-টোংরা হলে গা-হাত-পা ধুয়ে ভাত রেঁধে খেতে খেতে বিকেল গড়াবে বলে, বিমলা আর রমলা এরই মধ্যে চট করে ভাত-টাত খেয়ে ঝাড়া হাত-পা হয়ে বাড়িতে ঢোকার রাস্তার মুখে দুপাশে দুজন এসে দাঁড়াল। মোড়ের মাথায় ছেলেমেয়েগুলো নামার পর পাড়ার এদিক থেকে কয়েকটা ছেলেমেয়ে দৌড়ে এগিয়ে এল। রমলাদের গেটের সামনে দু'দলের মুখোমুখি হল। যারা ট্রাকে উঠে যেতে পারেনি সেই সব ছেলেমেয়ে এদের গায়ে বোতল দিয়ে রং মারতে লাগল, ঠিক বিমলা আর রমলার সামনে। ওরা দুজনে ছেলেমেয়েগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে হাসতে থাকল। একবার রমলা জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ইঃ রং-টং কিছুই তো নেই, খালি জলই দিয়ে যাচ্ছে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ছেলে অন্য আরেকটা ছেলেকে রমলাদের দিকে তাড়া করে এল। তাড়া খাওয়া ছেলেটা ওদের দুজনের মধ্যে দিয়ে ওদের ঘরের দিকে ঢুকে গেল। পুকুরের পাড় ঘেঁসে একটা বেরোনোর রাস্তা আছে, বোধহয় সেদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। তাড়া করা ছেলেটা ঠিক রমলার সামনে এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রমলা চেঁচিয়ে 'আমাদের দিয়ো না ভাই' বলে একটা পলায়নের ভঙ্গীমাত্র করল। পুকুরের পাড় দিয়ে পালিয়ে যাওয়া ছেলেটাকে 'ঠিক আছে তুই যাবি কোথায়, দেখব 'খন' বলে হাঁক দিয়ে ছেলেটা চলে গেল।

প্রায় দুটোর সময় সরকারি কলে জল এল। বিমলা বলল, 'লোক-টোক না থাকতে থাকতে জলটা ধরে রাখি, বুঝলি।'

রমলা সায় দিল। পরে কলে ভিড় লেগে গেলে কিংবা জল চলে গেলে মুশকিল হবে, রং নিয়েই সারারাত শুয়ে থাকতে হবে। এখনও পর্যন্ত অবশ্য গায়ে রং পড়েনি। কিন্তু হঠাৎ কখন কি হয় তার ঠিক নেই। কিছু লোক আবার দিনটা শেষ হওয়ার সময় সন্ধ্যার মুখে রং খেলার হুজুগ তোলে।

কলতলায় কোন লোক নেই; রমলা কলসী কলসী জল নিয়ে সব বাসন ভরে ফেলল। পিছনের উঠোনের বালতি দুটোয় জল ভরে রাখল; ভাল করে ঘষে মেজে গা ধোবে। একবার ঘরে জল রেখে আবার কলে গিয়ে দেখে একটা বাচ্ছা ছেলে কলের মুখে একটা বোতল ধরে আছে। তার মুখে বিভিন্ন রঙের প্রলেপ, তবুও সে যে দেখতে সুন্দর সেটা ঢাকা পড়েনি। রমলা হেসে জিগ্যেস করল, 'রং-টং নেই, শুধু জলই ভরছ নাকি?'

ছেলেটা মুখ তুলে রমলাকে দেখল। তারপর বলল, 'উঁহু, আছে তো।'

'দেখি তো' বলে রমলা কলসীটা মাটিতে রেখে শরীরটা এমন করে ফিরিয়ে নিয়ে দাঁড়াল, যে ছেলেটার মনে হল রমলা তাকে রং দিতে বলছে। যে বাড়ির প্রকাণ্ড কুকুরটার আওয়াজে পাড়াটা গমগম করে, ছেলেটা সেই বাড়ির। ছেলেটা

বোকার মত রমলার মুখের দিকে তাকাল, বয়স্কা মহিলা। কোনদিন কথাবার্তা নেই। ছেলেটা লজ্জা পেয়ে বাড়ির দিকে দৌড় লাগাল।

আস্তে আস্তে রোদের তাপ কমে এল। রমলাদের সদরের কাছ থেকে তাম্বুল গাছের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে কলতলায় পৌঁছল। একবার পুকুরটার চারদিকে একগাদা ছেলেমেয়ে দৌড়ঝাঁপ করে হৈ-হল্লা করল, একসময় মাটিতে পড়া গাছের ছায়ারা সমস্ত শহরটাকে ঘিরে ফেলল, মানুষের শোরগোলও যেন সেই ছায়ায় ঢেকে গেল।

তারপর একদল মাঝবয়েসী লোক খোল-করতাল নিয়ে সংকীর্তন করতে করতে পাড়ায় ঢুকল। বাগানওলা রগচটা কর্তার বাড়িটাতে ঢোকার সময় রমলা দিদিকে বলল, 'এরা যদি এখানে ঢোকে?'

ঢুকল না। রমলাদের দরজা পার হয়ে ওরা অন্য একটা গেটের দিকে এগোল। বিমলা বলল, 'যাক ভালই হল, একটাও খুচরো পয়সা ছিল না। ওদের খালি হাতে ফেরাতে নেই।'

দোল খেলা শেষ হল। রমলা দিদির কাপড়টার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চট করে মুখ ফিরিয়ে নিল। একটু সময় এদিক ওদিক করে সে ভিতরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। ভেতরে অবশ্য কোন কাজ নেই। দু'বালতি জল টুবটাব ভর্তি, কিন্তু গা ধোওয়ার দরকার নেই।

তাম্বুল গাছটার গোড়ায় আবিরের ঠোঙা আর নীলের প্যাকেটটা পড়ে ছিল; ও দুটো রমলা হাতে তুলে নিল। আবিরের ঠোঙাটা সামান্য ফেটে গিয়েছিল, সেই ফাঁক দিয়ে একটুখানি গোলাপি আবির রমলার হাতে পড়ল। একপলক হাতটার দিকে তাকিয়ে থেকে ও ফস করে বিমলার গলায় রংটা ঘষে দিল। 'দেখেছ, দেখেছ, কি করল এই মেয়েটা' বলেই বিমলা তৎক্ষণাৎ ওর হাত থেকে আবিরের ঠোঙাটা কেড়ে নিল।

এরপর প্রায় আধঘন্টা ধরে পুকুরের চারদিকে ছুটোছুটি করে রং খেলে খেলে ওরা দুজন ক্লান্ত হয়ে পড়ল। হাসির চোটে ওদের পেট ফাটার দাখিল। আবির আর নীল অনেক আগেই শেষ হয়েছিল। তারপর ওরা কাদা তুলে নিয়েছিল।

সন্ধ্যার আগে আগে ওরা দুজনে খুব ভাল করে স্নান করল। একটা পরিষ্কার কাপড় পরে রমলার শরীরটা বেশ হাল্কা মনে হল। কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে তার মনটা বড় বিষাদে ভরে রইল। বিমলা ভাত বসাতে ভেতরে যাওয়ার পর ও এসে একা দোরগোড়ায় বসে রইল।

আটটা নাগাদ পদ্ম এল, সঙ্গে কংস। ওরা দিনের চেহারা বদলায়নি; রমলার ওদের দেখে ভূতের মত মনে হল।

খানিক বাদে পদ্ম কাছের দোকানে ছোলার ডাল পায় কি না দেখতে গেল। বিমলা রান্নাঘরে। কংস রমলার কাছে সরে এল, জিগ্যেস করল, 'আবির খেলেছ?'

রমলা কোন উত্তর দিল না। জায়গাটা অন্ধকার। কংস আরও সরে এল। প্যান্টের পকেট থেকে ও একমুঠো আবির বার করল, তারপর রমলার গালে-মুখে-গলায়, স্নান করে ওঠা দেহের যতদূরে হাত গেল ততদূর আবির বুলিয়ে দিতে থাকল; এত ধীরে, এমন নিবিড় করে এই শহরে আজ যেন কেউ আর কারুকে আবির দেয়নি।

রমলা ওর দেহে প্রাণের সামান্য অস্তিত্বও বুঝতে দিল না। কিছুক্ষণ পর ওর দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল। দুই হাঁটুর মাঝে মুখটা গুঁজে দিল। ওর মনে হচ্ছিল চিৎকার করে জিগ্যেস করে, 'তোরা দিনের বেলায় রং খেলতে আসতে পারিসনে?'

ইঁদুর

লাঠিটা পাশে রেখে বিশ্রামরত অন্ধের হাত, হঠাৎ কোন হৈ চৈ হলে যেমন প্রথমেই লাঠিটাকে আঁকড়ে ধরে এবং তারপর কোথায় কি ঘটছে তা অনুমান করার চেষ্টা করে, এই কটা বাড়ির মহিলারা তাই করল। সাধারণত এই মহিলারা সারাদিন মানে এদের ছেলেমেয়েরা কোথায় আছে কি করছে, তার কোন খবর রাখে না। ক্ষিদে পেলে আপনিই ঘরে আসবে — এ রকম একটা ভাব নিয়ে এরা নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু আজ গণ্ডগোল লাগার সঙ্গে সঙ্গে সব কজন মেয়েছেলে ঝুপড়িগুলো থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল। ওরা প্রত্যেকেই যে যার নিজের নিজের ছেলেমেয়ের নাম ধরে চিৎকার করে দৌড়ঝাঁপ শুরু করল। কেউ হয়তো স্পষ্ট দেখতে পেল, ঐ যে তার ছেলে ওখানে দাঁড়িয়ে; কিন্তু সে তাতে সন্তুষ্ট থাকল না, দৌড়ে গিয়ে ছেলেটার হাত ধরে লোকজনের মধ্যে থেকে এককোণে টেনে আনল; নিজের বুকের কাছে ছেলেটাকে টেনে নিয়ে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রাখল, এবং তারপর ঘটনার সবিশেষ জানার চেষ্টা করল।

মাত্র মিনিট দুয়েকের মধ্যে মহিলারা যে যার পুত্রকন্যাকে সামলে নিল; ওদের নাম ধরে চিৎকার চেঁচামেচি বন্ধ হল। কেবল মতির মা'র গলা ধীরে ধীরে চড়তে লাগল এবং ক্রমাগত বেড়ে যেতে লাগল। অনেক মানুষের হৈ-হট্টগোলের ভিতরেও তার তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। প্রথমে সে অন্যদের মতই 'মতি মতি' বলে এদিক ওদিক করছিল, পরের দিকে সে ছুটোছুটি শুরু করে দিল এবং উন্মাদের মত চেঁচাতে থাকল।

সঙ্গের অন্য ছেলেরা জানাল, মতি তাদের সঙ্গে এখানেই ছিল। 'এখানটায় ছিল? কিন্তু কই? তোরা ঠিক জানিস ও এখানে ছিল? কোন্‌খানে কোন্‌খানে ছিল ও?' আকুল হয়ে মতির মা প্রতিটি ছেলেমেয়েকে জিগ্যেস করতে লাগল। তোরা হয়তো খেয়াল করিসনি ও তো অন্য কোথাও-ও যেতে পারে; মতির মা ব্যাকুল হয়ে শোনার অপেক্ষায়, যদি ওরা বলে, হ্যাঁ অন্য কোথাও যেতেও পারে। কিন্তু

প্রতিটি মেয়ে প্রতিটি ছেলে ওকে বার বার জানাল — মতি এই জায়গাতেই ছিল, যেখানে আপাতত একগাদা আড়াইমনি বস্তা পড়ে আছে।

এ জায়গাটা কয়েকটা বিরাট বিরাট গুদামে যাওয়ার সরু রাস্তার পাশে এক টুকরো খোলা জায়গা। এক বিচিত্র, নোংরা ব্যবসাকে পাহারা দিয়ে রাখা সামান্য চওড়া একটা রাস্তা, সেই রাস্তা থেকে দুটো বাড়ির ফাঁক গলে বেরিয়ে এসেছে এই সঙ্কীর্ণ পথটা। গলিটার একদিকে রয়েছে সাবান কোম্পানির সীমানা ঘিরে রাখা লম্বা টিনের বেড়া। অন্যদিকে এই ফাঁকা জায়গাটুকু। একটু দূর গিয়ে রাস্তাটা ভাগে ভাগে গুদামগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এই গুদামগুলোই নগরীর হাজার হাজার মানুষের খাদ্য ভাণ্ডার। এক সুন্দর যুবকের সঙ্গে তার পেটের নাড়ীভুঁড়ির যে সম্পর্ক, এই নগরীর সঙ্গে এই গলিটির সম্পর্কও তাই। অবিচ্ছেদ্য, অপরিহার্য, কদর্য। অসংখ্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ট্রাক বিকট গর্জন করে গলিটাতে ঢোকে। শ'য়ে শ'য়ে মন খাদ্যসামগ্রী গুদামগুলোতে নামে আবার শ'য়ে শ'য়ে মন জিনিস অসংখ্য ট্রাকে করে কোথায় যেন নিয়ে যাওয়া হয়। আনাড়ি রিক্‌শাওয়ালা রিক্‌শা ঘোরাতেই দু তিনবার আগুপিছু করে ফেলবে। সেখানে এই এক একখানা বিশাল ট্রাক যে কি কায়দায় ঘোরানো হয়, সে কেবল ট্রাক ড্রাইভারই জানে। কখনও কোথাও একটা গাড়ি যদি এলোপাথাড়ি হয়ে পড়ে তো গলিটা গাড়িতে গাড়িতে উপচে পড়ে, এবং গলিটার আশপাশের দুর্গন্ধময় বাতাস ড্রাইভার হেল্ডিমেনের উন্মত্ত চিৎকারে বেরোবার পথ পায় না। ড্রাইভারদের চেহারা ট্রাকের চেহারার সঙ্গে খাপে খাপে মেলানো, দেখলে মনে হয় বোধহয় আগে ওদের শরীরের মাপজোখ নিয়ে তবেই কোম্পানি গাড়িগুলো তৈরি করেছে। সারারাত গাড়ি চালানোর জন্যেই কিংবা কোন বিশেষ কিছু খাওয়ার জন্যেই হোক ওদের চোখ সর্বদাই লাল হয়ে থাকে। পারতপক্ষে ওরা চেঁচামেচি না করে সিটেই ঝেঁকে বসে থাকার চেষ্টা করে, কিন্তু হেল্ডিমেনগুলো প্রচণ্ড হল্লা করে। কার দোষে 'জাম' হয়েছে, এই ব্যাপারটা ওরা মালের ওপর বসে বসেই ফয়সালা করার চেষ্টা করে। সময় সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'জাম' লেগে থাকে, সরু গলিটা তো গাড়িতে গাড়িতে ছেয়ে যায়ই, মেন রোডের ওপরও একটার পর একটা গাড়ি অনেক দূর অবধি সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। 'জাম'-টা খোলার জন্য কেউই নিজের গাড়িটাকে একটু পিছিয়ে নিতে সম্মত হয় না। 'যা হয় হোক, আমার কি দরকার?' ভেবে ড্রাইভার কাছেপিঠের চায়ের দোকানে গিয়ে বসে। কখনও মাঝরাতে মাল নিয়ে গাড়িগুলো সরু গলিটাতে ঢুকে পড়ে। যদিও গুদাম খোলে সকালবেলা। তেমন তেমন দিনে জায়গাটা আরও কদর্য, আরও দুর্গন্ধময় হয়ে থাকে; কোন কোন সময় দেখা যায় ড্রাইভার এবং হেল্ডিমেনরা বাচ্ছা ছেলের মত গাড়ির মধ্যেই শুয়ে থাকে।

এই ফাঁকা জায়গাটার অর্ধেকটা একধরনের কাল্‌চে সবুজ রঙের তরলে ভরে

থাকে। আসলে ওটা হয়তো কোনকালে বর্ষার জমা জলই হবে, পরে শেওলা, মবিল ইত্যাকার বিচিত্র বস্তুর মিশ্রণে এই রং ধরেছে। পাশের শুকনো জায়গাটা নোংরা করে শিশুর দল এই জলেই নিজেদের গা পরিষ্কার করে। ফাঁকা জায়গাটার ওপারে বাঁশ, খড়, বস্তা, প্যাকিং বাক্সের কাঠ দিয়ে তৈরি সার সার ঝুপড়ি। এসব ঝুপড়িতে এক সময় গুদামের মাল ওঠানো নামানোর জন্য একদল দিনমজুর থাকত, কিন্তু আজকাল গুদাম কর্তৃপক্ষ কিছু স্থায়ী মজদুর নিয়োগ করেছেন, এই ঝুপড়িগুলোর কেউই সে চাকরি পায়নি; ফলে ওরা এখান থেকে চলে গেছে। এখন ঘরকটায় পুত্রকন্যা নিয়ে কয়েকটি মহিলা থাকে। বাসিন্দা হিসেবে এখানে কোন পুরুষ মানুষ নেই। যে দু-একজনকে দেখা যায়, কেউই এই ছেলেমেয়েদের বাবা নয়। মতির মা'র মত একজন ছাড়া বাকিরা সবাই বৃদ্ধা। এদের মধ্যে দুজন সকালবেলা ভিক্ষে করতে বেরিয়ে যায়, দুজন হোটেলে চাল ঝাড়া, মশলা পেষার কাজ করে, একজন ড্রাইভার হেল্ডিমেনদের নুন-তেল-পেঁয়াজ-কাঁচালঙ্কা সহযোগে মুড়ি জোগায় ইত্যাদি।

কিন্তু প্রতিটি মহিলাকে পেটের ভাত জোগাতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে বাচ্ছা ছেলেমেয়েগুলো। ওরা ঝুড়ি-ঝাঁপি-ডালা, খালি টিন এরকম যা কিছু একটা নিয়ে দিনের গোটা সময়টা রাস্তার ধারেই কাটায়। কাজ না থাকলে ওরা চেঁচামেচি, কান্নাকাটি করে খেলাধুলো করে কাটায়, কিন্তু যখন গুদামে মাল নামিয়ে খালি ট্রাকগুলো ফেরে বা 'জাম' হওয়ার ফলে ট্রাকগুলো দাঁড়িয়ে পড়ে, তখন ওরা টপাটপ ট্রাকে উঠে মুহূর্তের মধ্যে ট্রাকের মেঝেতে পড়ে থাকা ঝড়তি মালগুলো এক নিঃশ্বাসে ঝেঁটিয়ে তুলে নেয়। ঝাঁটানো মাল ঝুড়িতে ডালাতে ভরে ওরা বাড়িতে ছোটে, মায়েরা আবর্জনা ঝেড়ে পরিষ্কার করে তার থেকে চাল, ডাল বার করে। বাচ্ছাদের এই কাজে ড্রাইভার হেল্ডিমেনরা আপত্তি করে না; কারণ সঙ্গে সঙ্গে ওদের গাড়িটাও পরিষ্কার হয়ে যায়। 'জাম' যত বেশি হয় ছেলেমেয়েগুলোর স্ফূর্তিও তত বাড়ে। কেননা তখন ওরা সবকটা ট্রাক ঝাঁটানোর সুবিধে পায় এবং সুবিধাটা ওদের সবার ভাগ্যেই জোটে।

ছেলেমেয়েগুলো একেকটা চোখা মাথার শিকও জোগাড় করে নিয়েছে। মালভর্তি গাড়িগুলো যখন 'জামে' পড়ে তখন ওরা মালের বস্তাগুলোতে ঐ চোখা শিক মেরে ফুটো করে, ফুটোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে অল্প অল্প চাল-ডাল-চিনি-নুন বার করে নেয়। হেল্ডিমেন তাড়া করলে খিলখিল করে দৌড়ে পালায় আবার খানিক বাদেই নির্ভয়ে এগিয়ে আসে। ড্রাইভার-হেল্ডিমেনরা গাড়ি ছেড়ে চায়ের দোকানে ঢুকলে শুরু হয় ওদের অবাধ রাজত্ব। গাড়িগুলোকে ওরা সর্বদা মনে মনে জামে পড়ার আশীর্বাদ দেয়। দুদিক থেকে দুটো গাড়ি মুখোমুখি দেখলেই ওরা হাততালি দিয়ে সমস্বরে চেঁচায়, 'লাগ, লাগ, লেগে যা।' মানে 'জাম' লাগ।

আজ অবশ্য তেমন বড় ধরনের কোন 'জাম' লাগেনি। মোটা মোটা চালের

বস্তা অনেক উঁচু করে বোঝাই একটা ট্রাক গুদামের দিকে আসছিল এবং গুদামের দিক থেকে কোন এক সমবায় ভাণ্ডারের চাল-ডাল-নুন-চিনি-আটা-ময়দা নিয়ে ঠিক তেমনি বোঝাই একটা ট্রাক এদিকে আসছিল। দুজন ড্রাইভারই দূর থেকে ভাবছিল যে অন্যজন গাড়িটা একটু পিছিয়ে নিয়ে দাঁড় করাবে। কিন্তু আসলে কেউই দাঁড়াল না, ফলে এক জায়গায় এসে দুটো গাড়ি মুখোমুখি হয়ে গেল। দুই ড্রাইভারের মধ্যে কিছুক্ষণ ধরে ঝগড়া চেঁচামেচি চলল। বাচ্ছাগুলো চেঁচামেচি শুরু করে দিল, 'লাগ, লাগ, লেগে যা।'

মাত্র দুটো গাড়ি মুখোমুখি হলে ফাঁকা জায়গাটার দরুন খানিক সুবিধা পেয়ে সাধারণত দুটো গাড়ি দু'দিকে পার হয়ে যায়। তর্কশেষে ড্রাইভার দুজন তাই করতে উদ্যত হল। কিন্তু রাগে দুজনের মুখ গোমড়া হয়ে রইল। দুজনের কেউই একটু বেশি কিনারে গিয়ে অন্যকে জায়গা দেওয়ার দরকার মনে করল না। একটু পিছিয়ে গিয়ে দুটো গাড়িই প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে, একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে এগিয়ে এল। ওরা চেঁচিয়ে চলেছে; লাগ-লাগ লেগে যা। আর সত্যিই লেগে গেল। সমবায় ভাণ্ডারের গাড়িটা যতটা কিনারে যেতে পারত ততটা গেল না, চালের বস্তা টানা গাড়িটা কিনারে আসতে গিয়ে বাঁদিকের চাকাজোড়া নরম মাটিতে পড়ে দেবে গেল; এবং মুহূর্তের মধ্যে দুর্ঘটনাটা ঘটল। গাড়িটা ভীষণ রকম কাত হয়ে গেল এবং চোখের পলকে একটা একটা করে বেশ কয়েকটা বস্তা মাটিতে পড়ে গেল। ছেলেমেয়েগুলো কাদাজল মাড়িয়ে ছুটে পালাল। কেবল মতির বিকট চিৎকারটা একটা বস্তার নিচে চাপা পড়ে গেল। সেই বস্তার ওপর আরেকটা বস্তা পড়ল, আবার একটা।

বড় রাস্তা থেকে অনেক লোকজন ছুটে এল। মতির মা'র আকুল চিৎকারে তাদের মতির খোঁজ করার কথা খেয়াল হল। তারা একটা একটা করে বস্তা সরাল। প্রথমে মতির পায়ের একটা পাতা নজরে পড়ল, পাতাটার চেহারায় অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কিন্তু শেষ বস্তাটি সরানোমাত্র সবাই অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। রক্তের রং ছাড়া মতির শিশুদেহের আর কোন অঙ্গ কেউ মনে করার চেষ্টাও করল না।

পুলিশ এল। আজকের মত গুদাম থেকে মাল বার করা স্থগিত হল। এমনিতেই সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। ট্রাকগুলো বড় রাস্তায় সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মতির মাকে অন্যান্য মহিলারা সামলে রাখল, মতির দেহের হাড়মাংসের দলাটা পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে চলে গেল।

অন্ধকার নেমে এল। ট্রাক দুটো থানায় গেল। বস্তাগুলো ওখানেই পড়ে থাকল। অন্য ট্রাকটা থেকেও কয়েকটা বস্তা খসে পড়েছিল রাস্তার ওপারের টিনের বেড়ার গায়ে। বস্তাগুলোতে ছিল ডাল আর নুন।

শিশুদের প্রায় সবাই নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে ঝুপড়িগুলোর মাঝখানের চাতালটায়

বসে ছিল। ওদের মধ্যে যারা একটু বড়, তাদের দু-একজন মাঝে মাঝে এক-আধটা কথা বলছিল। অনেক রাত পর্যন্ত ওদের ঘুম এল না। তবে অনেক দেরিতে শোওয়া সত্ত্বেও ওদের অনেকেরই খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। কারণ ওরা হয়তো শেষরাত থেকেই জেগে ছিল। ওদের মধ্যে বড়গুলো হাতে ধামা আর মাথাচোখা শিক নিয়ে ভোরবেলাতেই বস্তাগুলোর কাছে চলে এল। চাল-ডাল-নুন-চিনি। যে বস্তাটায় মতির রক্ত লেগেছিল, ওরা কেবল সেই বস্তাটা থেকে দূরে থাকল।

আলো ফুটে ওঠার পর পরিপাটি পোশাক পরা কয়েকজন লোকের তত্ত্বাবধানে একদল মজদুর বস্তাগুলো সরাতে শুরু করল। তাদের মধ্যে কার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোঝা গেল না, কিন্তু দেখা গেল দুজন মজুর ধরাধরি করে রক্তলাগা আড়াইমনি চালের বস্তাটা মতির মা'র ঝুপড়িতে নিয়ে গেল। সারারাত খাটিয়ায় বসে জেগে থাকা মতির মা 'চাই না, চাই না' বলে লাফিয়ে বাধা দিতে এল, এবং বস্তাটাকে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করতে থাকল। আড়াইমনি বস্তাটার রক্ত লেগে থাকা দিকটা মজুর দুজন বেড়ার দিকে ফেলেছিল। চালের ভারে বেড়াটা মড়মড় করে উঠেছিল।

বহুদিন পর্যন্ত মতির মা—'বার করে নিয়ে যা, বার করে নিয়ে যা, আমার চাল চাই না, নিয়ে যা' বলে তারস্বরে চেঁচাল। আশপাশের মহিলারা তার জন্য খুবই দুঃখ প্রকাশ করল।

দেশে এই মেয়েলোকটির বাপ মা কেউ ছিল না। কাকার কাছে থেকে ও ছোলা, মসুরের ক্ষেত করত। একটা লোক বিয়ে করবে বলে ওকে এখানে নিয়ে এসেছিল। লোকটি বদমাশ। মতির জন্মের আগেই ও আফিমের চোরাকারবারের চক্করে কোথায় ভেগে গেছে। ও ফিরে আসবে ভেবে অনেক কাল মতির মা পথ চেয়ে বসে ছিল। পাশের ঝুপড়িতে তেল-পেঁয়াজ দেওয়া মুড়ি খেতে এসে ড্রাইভার হেল্পিমেনরা ওকে বলে, 'ধুর ধুর, ও আর কোত্থেকে ফিরবে? আমরা এত লোক থাকতে তোর ঐ একটা লোকের কথা ভেবে মরার কি দরকার?' ওদের কথা শুনে আশেপাশের লোকেরা হাসে। মতির মা'র রাগ হয়।

একা থাকে। ওর ভয় করে, এটা সত্যি। লোককে ভয়, নিজেকেও ভয়। ওর বয়েসটা মাঝে মাঝে ওকে লাঠি, তরোয়াল, লোহা-লক্কড় নিয়ে বেড়ি দিয়ে ধরে, কিন্তু মতির মাথাটা বুকে নিয়ে ও বয়সটাকে ম্লান করে দিতে পারে। আর কয়েকটা বছর পার করে দিতে পারলে ওর বয়সটা ভিখিরির বয়স হয়ে যাবে। অন্তত ফাটা-ছেঁড়া কাপড় জামায় ও নিজেকে ভিখিরি বানিয়ে ফেলতে পারবে। একদিন না একদিন তো মতি বড় হয়ে কিছু একটা করবে। আর না করলেও কিছু নেই, ও থাকলেই হল। একটি স্বামীর চাইতে একটি সন্তান অনেক বড় সম্পদ। ওর কানে কেবল মা মা শব্দটা পৌঁছলেই হল। এর চাইতে বেশি আওয়াজ ওর দরকার নেই।

কিন্তু হঠাৎ করে ঘরটাতে নেমে আসা এই নির্জনতার রূপ দেখে মতির মা

পাগল হয়ে গেল। আড়াইমন চালের বস্তাটার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থেকে তার চোখ দিয়ে শুধু জল ঝরে। আশপাশের কেউ কেউ ঝাঁটানো মাল থেকে পাওয়া, ভিক্ষায় পাওয়া চাল-ডাল এক আধমুঠো ওকে দিয়ে যায়, কখনও ও তার একমুঠো নিয়ে সেদ্ধ করে, কিন্তু না খেয়ে ফেলে রাখে। কখনও সেদ্ধও করে না। যে ট্রাকটা থেকে এই বস্তাটা পড়েছিল, সেই ট্রাকের হেল্ডিমেনটি প্রায়ই ওর খবর নেয়। ও কাছের দোকান থেকে জিলিপি আর গজার একটা ছোট ঠোঙা ওর জন্য নিয়ে আসে। মতির মা ওর সঙ্গে কোন কথা বলে না।

দিন পেরিয়ে যায়। ক্ষিধে মতির মাকে জ্বালায়, কিন্তু প্রতিবেশীরা তাকে চাল-ডাল দেয় না। ক্রমশ মতির মা অনুভব করল, ক্ষিধের জ্বালা বড় জ্বালা। নারকেলের দড়ির খাটিয়াটাতে শুয়ে থেকে ও লক্ষ্য করে বেড়ায় ঠেস দেওয়া বস্তাটার একটা জায়গা ইঁদুরে খুঁটেছে। রোজ সকালে দু-চারটে চাল ছড়িয়ে থাকে। চাল-কটা ঝেড়ে ফেলার সময় মাঝে মাঝে ওর চোখ ভিজে ওঠে। একদিন খালি পেটে অনেকক্ষণ খাটিয়াতে পড়ে থাকার পর ও উঠে বসে। ডালাটা এনে বস্তাটার কাছে ধরে এবং যেখানটায় ইঁদুরে ফুটো করেছিল সেই ফুটোয় আঙুল চালিয়ে অল্প অল্প করে চাল বের করে। ফুটোটা দিয়ে ছোট একবেলার মাপে চাল বের করতে অনেকটা সময় লাগল।

বস্তার ফুটোটা আঙুলের খোঁচাতেই বড় হল, না কি আঙুলের খোঁচার দরুণ সুবিধে পেয়ে ইঁদুরই বড় করে ফেলল ঠিক ধরা গেল না, কিন্তু কদিন পর দেখা গেল, সকালে অনেক চাল মাটিতে পড়ে আছে। ইঁদুরের চাল নষ্ট করাটা মতির মা'র ভাল ঠেকল না। সে একটা ছেঁড়া কাপড় ভাঁজ করে বস্তাটার ওপর বিছিয়ে দিল, আর ঠিক ফুটোর কাছটাতে ঠেলাঠেলি করে পালিটাকে চাপিয়ে রাখল। রাতে কোথাও কিছুতে খরখর করলেই উঠে দেখতে শুরু করল।

মাঝে মধ্যে সেই হেল্ডিমেনটি এসে মতির মাকে বলে, 'শুধু কটা চাল ফুটিয়ে কেউ ভাত খেতে পারে? ডাল-টাল কিছু একটা এনে দিই?'

মতির মা লাগবে না জানিয়ে দেয়।

বস্তাটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসতে থাকল। ফুটোটা বড় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আঙুল ঢুকিয়ে চাল বের করাটা কঠিন হচ্ছিল। পরের দিকে ফুটোটা দিয়ে মতির মা'র হাত গলে যাচ্ছিল। এরপর একদিন কনুই অবধি গলিয়ে দিয়েও বেশি চাল পেল না। চালগুলো বস্তাটার সেলাইয়ের ফাঁকে ফোঁকরে ঢুকে আছে।

সেইদিন সকালে মতির মা বস্তাটার মুখের সেলাই খুলে ফেলল। বস্তাটা উল্টে মেঝেতে ভাল করে ঝাড়ল। রাতের বেলার মত চাল বেরোল। ঝেঁটিয়ে নিয়ে, পালিতে তুলে সে চালটা ভাল করে বাছল।

তারপর সে বস্তাটা রোদে দিল। রোদে দেওয়ার সময় এতদিন বেড়ার দিকে

থাকা পাশটা মাটির দিকে পড়ল। বিকেলের পর ও আরেকবার ভাল করে ঝেড়ে নিয়ে বস্তাটা খাটিয়ার ওপর বিছিয়ে নিল।

রাতের ভাত খেয়ে মতির মা বিছানায় শুল। এর মধ্যে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। গত কদিন যাবৎ মতির মা'র রাতে বেশ শীত করছিল। আগের বছর মতি জড়িয়ে থাকত বলেই বোধহয় ওর অত শীত করত না। আজ বস্তাটা পেড়ে নেওয়ার জন্য, নিচ থেকে ঠাণ্ডা কম উঠছে, সেই জন্যই বোধ করি মতির মা একটু ওম পেল।

আর এরকম ওম পেলেই মতির মার শরীরে একটা অদ্ভুত ইঁদুর যেন সুড়সুড় করে ঘুরে বেড়ায়। আজ সেই ইঁদুরটাকে তাড়াতে বুকের কাছে মতিও নেই। কিছুক্ষণ পর তার এমন মনে হল, এই মুহূর্তে যদি সেই হেল্থিমেনটিও এসে তাকে জিগ্যেস করে, 'ডাল-চাল কিছু এনে দিই, কি বলিস', হয়তো সে বলে ফেলবে 'দে'।

অন্তত একটা মতির জন্য।

গহ্বর

প্রায় ষাটজন প্রেস রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার হাসপাতালের প্রধান যাতায়াতের পথটার সামনের বাগানে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ বাগানের রেলিঙের ওপর বসে ছিল, কেউ বা যীশু খ্রিস্টর প্রকাণ্ড মূর্তির চারপাশে থাকা সিঁড়িগুলোর ওপর বসে ছিল, জনাদুয়েক হাসপাতালের গাড়িবারান্দার মোটা থাম দুটোতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, কেউ কেউ সিগারেটে টান দিতে দিতে অলস ভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এদের সবাই তিন-চারজনের একেকটা দলে ভাগ হয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা থেকে শুরু করে বুনোফুলের অগোছাল সৌন্দর্য পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিশেষজ্ঞের গাম্ভীর্য নিয়ে, তর্কে জেতার উত্তেজনা নিয়ে, আড্ডার প্রধান ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হতে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কথাবার্তার ফাঁকে খানিকক্ষণের জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা ফটোগ্রাফাররা ক্যামেরার লেন্সের সামনে এটা ওটা নাড়িয়ে-টাড়িয়ে দেখছিল। ভিউ-ফাইন্ডারের ভেতর দিয়ে হাসপাতালের প্রধান প্রবেশপথের রাস্তাটার সিঁড়িগুলো এবং বারান্দাটা খুঁটিয়ে দেখছিল। প্রথম সূর্যের কোমল আলোয় সিঁড়িগুলো আর বারান্দায় ফটোগ্রাফির পক্ষে উপযোগী উজ্জ্বলতা ছিল বলে ওরা খুশি, একটা ঐতিহাসিক যুগান্তকারী ঘটনার ছবি ক্যামেরায় সুন্দর ভাবে ধরা যাবে ভেবে ওরা আকাশ এবং সূর্যকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিল।

মাঝে মাঝে হাসপাতালের ওদিক থেকে কথাবার্তা, দরজা খোলার আওয়াজ ভেসে আসছিল; আর প্রতিবারই প্রেসের লোকজন, রেলগাড়ি আসার সম্ভাবনায় চঞ্চল হয়ে ওঠা প্ল্যাটফর্মে প্রতীক্ষারত যাত্রীদের মত ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল। কোন কোন ফটোগ্রাফার একটা ভাল জায়গা বেছে নেওয়ার জন্য সিঁড়িগুলোর দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল। দূরে রাস্তার ফুটপাথে জড়ো হওয়া কয়েক'শ লোকের ভেতরও একটা শোরগোল পড়ে যাচ্ছিল। অভিভাবকরা তাদের দু'পায়ের মাঝখানে ধরে রাখা শিশুদের সাত তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে আঙুল দিয়ে বারান্দার দিকে ওদের দৃষ্টি

ফেরানোর চেষ্টা করছিল, নিজেরাও উদগ্রীব হয়ে সেদিকে তাকিয়ে। রাস্তার গাড়ি-ঘোড়াও ঐ সময়টুকুর জন্য মন্থর হয়ে পড়ছিল, গাড়ির আরোহীরাও হাসপাতালের ভেতরটায় নজর করার জন্য হাঁকপাঁক করছিল। কিন্তু খানিক পরেই সবাই টের পেল উত্তেজনার কারণটা সঠিক নয়, দু-একজনের সরস মন্তব্যে চেনা-অচেনা সবাই হেসে উঠল, এবং শান্তভাবে আসল ঘটনাটার অপেক্ষায় রইল। গুজবের রেশ কাটার পর অনেকেই নতুন করে সিগারেট জ্বালাল।

প্রায় ষাটজন প্রেস রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফারের সতর্কতা উপেক্ষা করে আসল ঘটনার নির্ভুল সঙ্কেত অবশ্য ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরাই জানাল। অকস্মাৎ ওদিক থেকে শোরগোলের শব্দ ভেসে এল, প্রেসের লোকেরা সচকিত হয়ে রাস্তায় দাঁড়ানো লোকজনের জটলার দিকে এবং তারপর ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে হাসপাতালের বারান্দার দিকে তাকাল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির দিকে ধেয়ে গেল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত কিছু কর্মচারী সিঁড়িতে ওঠার মুখে, যাতে সবাই বেশি এগোতে না পারে, একটা বেষ্টনী তৈরি করল, প্রেসের লোকেরা এগিয়ে গিয়ে একটু ভাল জায়গা নেওয়ার চেষ্টায়, নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড ঠেলাঠেলি করে সেই বেড়া প্রায় ভেঙে ফেলার দাখিল করল। একজন মুভি ক্যামেরাম্যান কোন এক ফাঁক গলে লাফ দিয়ে সিঁড়ির চার ধাপ ওপরে উঠে ফটোগ্রাফারদের ঠেলাঠেলির দৃশ্য তুলতে লাগল।

হাসপাতালের ভেতর থেকে একদল লোক ধীরে ধীরে বারান্দা ধরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এল। দলটার পুরোভাগে ছিলেন চারজন মুখ্য ব্যক্তি, একপাশে বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডক্টর ক্যাম্বেল, আরেকপাশে তাঁর সহকারী ডক্টর মিলিন, একটু পিছনে হাসপাতালের প্রধান মেট্রন আর এদের সকলের মাঝখানে ছিলেন মিস্টার পিয়েনার এবং মিসেস পিয়েনার। দলটা ধাপগুলোর কাছে পৌঁছনর আগে থেকেই অবিরাম ক্যামেরার ক্লিক্ ক্লিক্ শব্দ শোনা গেল। মুহূর্তে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকা শ' শ' মানুষের হাত উঠল — 'মিঃ পিয়েনার দীর্ঘজীবী হোন, ডক্টর ক্যাম্বেল দীর্ঘজীবী হোন।' স্লোগানে গোটা জায়গাটা মুখরিত হয়ে উঠল। মিস্টার পিয়েনারের শান্ত, ফ্যাকাশে মুখখানা এরই মধ্যে প্রথম সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, এখন জনতার আন্তরিক অভিনন্দন এবং আশীর্বাদে মুখে একটা উদ্দীপনার ভাব ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর ঠোঁট দুটো প্রসারিত হল, দুই কষে একটু ভাঁজ পড়ল, কিন্তু বোঝা গেল না এটা হাসি কি কান্নার সূচনা। প্রেসের লোক আর রাস্তার জনতার অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে মিঃ পিয়েনার জনতার দিকে ডানহাতটা তুলতে চেয়ে ডক্টর ক্যাম্বেলের দিকে তাকালে ডক্টর ক্যাম্বেল সম্মতিসূচক মাথা নাড়তেই পিয়েনার জনতার উদ্দেশে আস্তে আস্তে হাতটা নাড়াতে লাগলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বিপুল উল্লাসে জনতা প্রীতি সম্ভাষণ জানাল। মিঃ পিয়েনার হাতটা তখনও পুরোপুরি নামাননি, একজন

রিপোর্টার নোট নেওয়ার খাতা এবং একটা পেন্সিল মিঃ পিয়েনারের হাতের কাছে এগিয়ে দিল, এই বিখ্যাত রোগপীড়িত ব্যক্তিটি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যদি ওর খাতায় একটা আঁচড়ও টানেন — তার সংবাদপত্রটির জন্য তাই হবে অনেক। ডাঃ ক্যাম্বেল শান্ত হেসে রিপোর্টার ভদ্রলোকের পেন্সিল আর খাতাটা সরিয়ে দিলেন।

মিনিট কয়েক বাদে একটি সুদৃশ্য সাদা রঙের গাড়ি প্রায় নিঃশব্দে গাড়িবারান্দার নিচে এসে দাঁড়াল। ধাপগুলো নামতে ডাঃ ক্যাম্বেল এবং মিসেস পিয়েনার মিঃ পিয়েনারকে সাহায্য করলেন। গাড়িতে ওঠার সময় একজন রিপোর্টার সুকৌশলে বেষ্টনী ভেদ করে গিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কেমন লাগছে আপনার মিঃ পিয়েনার?'

মিঃ পিয়েনারের ঠোঁট দুটো একটু কেঁপে উঠল, দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জানালেন— 'একটা নতুন জীবন, এক নতুন পৃথিবী, অভিনব।'

শ'য়ে শ'য়ে মানুষের হাততালি, হর্ষধ্বনির ভেতর গাড়িটা হাসপাতালের এলাকা পার হল। একটু পরেই সমস্ত জায়গাটা নিঃঝুম হয়ে গেল। রাস্তার এবং প্রেসের লোকজন সবাই যে যার দিকে চলে যাওয়ার পরও হাসপাতালের কিছু কিছু কর্মচারী অলস নিষ্ক্রিয় ভঙ্গীতে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল। পরিবারের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বিদায় দেওয়ার শোক তাদের অন্তরে কাজ করে যাচ্ছিল। গত একশ আঠারটি দিন এই রোগীটিকে কেন্দ্র করে হাসপাতালটিতে এক অপূর্ব কর্মচাঞ্চল্য তৈরি হয়েছিল। কোন কোন সময়ে সমগ্র পৃথিবীর নজর কেন্দ্রীভূত হত এই হাসপাতালটিতে। গত একশ আঠারটা দিনের প্রতিটি দিন এনে দিয়েছে এই হাসপাতালটির জন্য এক অতুলনীয় সম্মান, গৌরব ও কৃতকার্যতা। সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় মিঃ পিয়েনার এই মাত্র এই হাসপাতাল থেকে চলে গেলেন। এক অদ্ভুত বিষাদ কিছু সময়ের জন্য হাসপাতালের কর্মীবৃন্দকে যেন অলস নিষ্ক্রিয় করে ফেলল।

প্রায় চার মাস আগে হৃদযন্ত্রের রোগে মুমূর্ষু অবস্থায় অন্য আর দশটা রোগীর মতই মিঃ পিয়েনার এই হাসপাতালে এসেছিলেন। তাঁর অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে যচ্ছিল। একসময় চিকিৎসকরা তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তের গণনা শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ডাঃ ক্যাম্বেল পেলেন তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ সাধনা থেকে উদ্ভুত প্রেরণা, অসাধারণ জ্ঞান প্ররোচিত অতিমানবীয় কর্মশক্তি, এবং তার সঙ্গে পেলেন নিহত-প্রায় এক ত্রিশ বছরের যুবকের স্পন্দনরত হৃদপিণ্ডটি। মিঃ পিয়েনারের রোগগ্রস্ত অকর্মণ্য হয়ে যাওয়া হৃদপিণ্ডটি সরিয়ে ফেলে তার বদলে স্থাপন করা হল যুবকের প্রাণশক্তিতে ভরপুর কল্‌জেটি। এটা একশ আঠার দিন আগের ঘটনা। এই একশ আঠার দিনে নতুন কল্‌জেটিকে দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরা আদরে গ্রহণ করে নিল। আজ মিঃ পিয়েনার একটি সাদা সুদৃশ্য গাড়িতে মিসেস পিয়েনারের পাশে বসে শত শত জনতার হর্ষধ্বনি এবং অভিনন্দন কুড়িয়ে বাড়ি ফিরলেন।

মিসেস পিয়েনার এই শুভদিনটি উপলক্ষে তাঁদের বাড়িটি নতুন করে সাজিয়েছিলেন। পর্দাগুলো ধবধবে সাদা কাপড়ে নতুন করে তৈরি করালেন, চেয়ার টেবিল, সব আসবাবের যেখানে যত কাপড়ের দরকার সেখানেই দামি সাদা কাপড় ব্যবহার করা হয়েছে; তাঁদের দুজনের খাটটাতেও সুন্দর করে সাদা চাদর পাতা হয়েছে। এই কাপড়গুলো অবশ্য হাসপাতালের কাপড়ের মত সাদামাটা নয়, সাদা সুতো দিয়ে বিভিন্ন আকৃতির ফুল-পাতা কাপড়গুলোতে একটা পারিবারিক রূপ দিয়েছে। একশ আঠারটা দিন এক বিশেষ পরিবেশে কাটানোর পর হঠাৎই একটা অতি-গার্হস্থ্য পরিবেশে এসে পড়লে মিঃ পিয়েনার বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়তে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ডাঃ ক্যাম্বেলের পরামর্শ মত মিসেস পিয়েনার এই ব্যবস্থা করেছিলেন।

মিঃ পিয়েনার বাড়িতে আসার কিছু পরে পুলিশ ও ডাঃ ক্যাম্বেলের অনুরোধে বাড়ির সামনে জমায়েত শুভেচ্ছার্থীর দল ধীরে ধীরে চলে গেল। পুলিশের সঙ্গে অযথা তর্কাতর্কি করার অপরাধে দুটি কালো চামড়ার লোককে গ্রেপ্তার করা হল।

ডাঃ ক্যাম্বেল চলে যাওয়ার পর ঘরটা নির্জন হয়ে গেল। মিঃ পিয়েনার একটি সোফায় বসে বড় করে একটা শ্বাস নিলেন এবং তাঁর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনে মিসেস পিয়েনার স্বামীর মুখে এ রকম হাসি যেন আর কখনও দেখেননি। এক নতুন জীবনের পরম শান্তির হাসি। কার্পেটের ওপর হাঁটু গেড়ে মিসেস পিয়েনার সোফার পাশে বসে পড়লেন। তিনি সযত্নে মিঃ পিয়েনারের বুকে মাথা রাখলেন এবং ডানহাত দিয়ে তাঁর বাহুতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। অনেক্ষণ মিসেস পিয়েনার এভাবেই থাকলেন। ক্রমশ তাঁর চোখ সজল হল, এবং এক সময় গাল বেয়ে অশ্রু নেমে এল। নিস্তব্ধ ঘরটাতে মিঃ পিয়েনারের বুকের ধুকপুক শব্দটা এক ক্লান্তিকর, আশঙ্কাময় যুদ্ধশেষের বিজয়সূচক ডঙ্কা নিনাদের মত মনে হচ্ছিল।

সন্ধ্যার সময় প্রকাশিত হওয়া সংবাদ পত্রের প্রথম সংস্করণটি সেদিন দুপুরেই প্রকাশিত হল। মিসেস পিয়েনার সবকটা কাগজের সব সংস্করণগুলো সংগ্রহ করে স্বামীকে দিলেন। স্বামী খবরগুলো পড়ে, ছবিতে নিজের চেহারাটা দেখে দেখে হাসলেন। পরের কদিন কাগজে মিঃ পিয়েনারের খবর, ঘরের ভেতরে, বাইরের বাগানে বিভিন্ন ভঙ্গীতে বহু ছবি প্রকাশিত হল। মিসেস পিয়েনার গত একশ আঠার দিন ধরে নানা খবরের কাগজ থেকে মিঃ পিয়েনার সম্পর্কিত অনেক খবর সযত্নে কেটে রেখেছিলেন; সে সবগুলোও তিনি স্বামীকে গুছিয়ে দিলেন। সে সব পড়ে পড়ে, মাঝে মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত শুভাকাঙ্ক্ষীদের এবং প্রেসের লোকজনের সঙ্গে দু-একটা কথাবার্তা বলে মিঃ পিয়েনার নিরুদ্বেগে কটা দিন কাটালেন।

ক্রমশ মিঃ পিয়েনারকে ঘিরে উত্তেজনা কমে এল। একদিন মিসেস পিয়েনার

সাব্যস্ত করলেন তিনি আবার 'কাজে' বেরোবেন। কাজে? মিঃ পিয়েনার স্ত্রীর দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকালেন। কাজে যাওয়ার ব্যাপারে পিয়েনার দম্পতির দুটি জায়গা আছে। প্রথম জায়গাটা হল কাগজের ব্যবসার প্রতিষ্ঠান। অনেক বছর আগে, বিয়ের আগে, মিসেস পিয়েনার একা একটা ছোট্ট কাগজের দোকান দিয়েছিলেন; বিয়ের পর মিঃ পিয়েনার স্ত্রীর ব্যবসায়ে অনেক টাকা খাটালেন। ধীরে ধীরে তাঁদের ব্যবসা অনেক বড় এবং লাভজনক হয়ে উঠল। একটা সময় মিঃ পিয়েনার উঁচু মহলের সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি ব্যবসায় মন দিলেন। তাঁদের দুটি ছেলেকে ছোটবেলাতেই ওঁরা লণ্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওরা ওখানেই পড়াশোনা করে। পরের দিকে পিয়েনার দম্পতির ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটিতে বেশ কজন দক্ষ, বিশ্বস্ত কর্মচারী এল, মিসেস পিয়েনার নিজেও ব্যবসা পরিচালনায় অত্যন্ত পটিয়সী, ফলে মিঃ পিয়েনারের যথেষ্ট অবকাশ তৈরি হল। এই অবকাশের সুযোগে তিনি রাজনীতি এবং সমাজনীতির চর্চায় জড়িয়ে পড়লেন। এক সময় সরকারি শাসনকর্তা হিসাবে অর্জিত অভিজ্ঞতা, কর্মকুশলতা এবং চিন্তাধারাকে কাজে লাগানোর জন্য অন্তর থেকে প্রেরণা পেলেন। সরকারি নীতিকে কাজের মধ্যে দিয়ে জনতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি বেসরকারি সংস্থায় যোগ দিলেন। নিজের প্রতিভা আর দক্ষতার গুণে অল্প দিনেই মিঃ পিয়েনার সংস্থার সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। এক সময় স্ত্রী তাঁর কাগজের ব্যবসায় মিঃ পিয়েনারকে টেনে নিয়েছিলেন, সম্পাদক হওয়ার পর মিঃ পিয়েনারও স্ত্রীকে সংস্থার কাজে টেনে নিলেন। সারাদিন ব্যবসা সংক্রান্ত কাজকর্ম সেরে পিয়েনার দম্পতি সন্ধ্যায় নিয়মিত সংস্থার আলোচনাচক্রে যোগ দিতেন। আলোচনা চলত নানা বিষয়ের ওপর, কিন্তু সমস্ত আলোচনার পিছনে থাকে সংস্থার মূল উদ্দেশ্য এবং নীতি, কোন জায়গায় জন্মগ্রহণ করলেই মানুষ সেই জায়গার অধিকারী হতে পারে না। জঙ্গলে হাজার হাজার বাঁদর জন্মায় বলেই জঙ্গলগুলোর মালিকানা বাঁদরদের হয় না। এই দেশটায় অনেক কালো চামড়ার মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিল, আর জন্মগ্রহণ করেছিল বলেই প্রাকৃতিক নিয়মে একসময় মরেও ছিল। জন্মগ্রহণ এবং মৃত্যুবরণের বাইরে তারা আর কিছুই করেনি। অতএব যে সুসভ্য জাতি, বাইরে থেকে এলেও, অক্লান্ত পরিশ্রম আর ত্যাগের মাধ্যমে দেশটাকে গড়ে তুলেছে, অন্ধকারের অতল গহ্বর থেকে তুলে এনে দেশটিকে সভ্যতা সমৃদ্ধির উজ্জ্বল আলোয় মেলে ধরেছে, সেই জাতির বাইরে এই দেশটার ওপর অন্য কারও অধিকার থাকতে পারে না। ধবধবে সাদা চামড়ার এক শ্রেণীর মানুষ ভগবান ভুল করে সৃষ্টি করেনি। মানুষের চামড়ার এই দুটি রঙের মাঝে লুকিয়ে আছে সৃষ্টিকর্তার বিধান। কালো চামড়ার লোকেরা সেই বক্তব্য উপলব্ধি করতে না পেরে বিদ্রোহের নামে পাপাচরণ করে; কিন্তু সেই বক্তব্যের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করাটাই মিঃ পিয়েনারদের পবিত্র কর্তব্য।

একদল অনুগামীর সাহায্যে পিয়েনার দম্পতি এই পবিত্র কর্তব্য পালন করেন।

কুৎসিত কালোদের সরিয়ে শহরটাকে সাদা করার জন্য এই কালোদের তাড়িয়ে দিয়ে, পারলে আবার গাছের ডালে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁরা একটা সমগ্র দেশজোড়া অভিযান পরিচালনা করেন।

কাজে যাওয়ার কথা বললে পিয়েনার দম্পতি সংস্থার অফিসে যাওয়ার ব্যাপারটাও বোঝেন।

মিঃ পিয়েনারের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর স্ত্রী জানালেন, তিনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটিতেই যাবেন। মিঃ পিয়েনার জিগ্যেস করলেন, 'সঙ্ঘের খবর কি?'

'গত কিছুদিন যাবৎ অবশ্য আমি ফোনেই বেশির ভাগ খবর পেয়েছি। নতুন খবর বিশেষ কিছু নেই। কেবল কুইন্স কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার সময় একদিন ওদের একদল ছেলেমেয়ে এবং বাবা মা একসঙ্গে কলেজের বারান্দায় বসেছিল। ওদেরও কলেজে ভর্তি করতে হবে, না হলে নাকি ওরা বসেই থাকবে। পুলিশ এসেছিল, কিন্তু পুলিশ কিছু করার আগেই আমাদের ছেলেমেয়েরা, কলেজের কর্মচারীরা সবাই কলেজ থেকে বেরিয়ে গেছে। সন্ধে পর্যন্ত বসে থেকে, ওদের বোধহয় বিরক্তি ধরেছিল, হয়তো বা ক্ষিদেও পেয়ে থাকবে, চলে গিয়েছিল।' মিসেস পিয়েনার হেসে হেসে কথাগুলো বললেন।

মিসেস পিয়েনার কাজে যাওয়া শুরু করার বেশ কিছুদিন পর একদিন বিকেলে মিঃ পিয়েনার ডাঃ ক্যাম্বেলকে ফোন করলেন। তিনি একটু একটু করে অল্প সময়ের জন্য অফিসে যেতে চান। ডাঃ ক্যাম্বেল কিছু সতর্কতার কথা বলে তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

প্রথম যেদিন মিঃ পিয়েনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গেলেন সেদিন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে কর্মীরা একটি ভোজসভার আয়োজন করল। সঙ্ঘের অফিসেও তার ফিরে আসা উপলক্ষে আনন্দময় পরিবেশে নৈশভোজ হল। তারপর থেকে তিনি প্রায় নিয়মিত দুটো অফিসেই যাতায়াত শুরু করলেন।

সন্ধ্যায় সঙ্ঘের অফিস থেকে ফিরে মিঃ পিয়েনার সর্বদাই একটা পার্কের কাছে তাঁর সাদা গাড়িটা থেকে নামেন। পার্কটা থেকে তাঁদের বাড়ি দু'ফার্লংটাক হবে। এই পথটুকুতে তিনি কিছু সময় এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ান। এইটুকু হাঁটা তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয়। তাছাড়া সন্ধ্যার পর এই রাস্তাটা একটু নিরিবিলি থাকে, হেঁটে শান্তিতে একটু পথ চলা যায়।

একদিন এমনি হেঁটে বাড়িতে যাওয়ার পথে হঠাৎ মিঃ পিয়েনারের মনে হল কেউ তাঁকে মৃদুকণ্ঠে ডাকছে 'কর্তা'*! অনেকেই তাঁর সঙ্গে সুযোগ পেলেই কথা

---

* মূলে আছে "ডাগুরীয়া" যার সঠিক বাংলা হয় না। তবে গল্পের প্রেক্ষাপট বিচারে "সার" কিংবা "কর্তা" বললে চলতে পারে।

বলতে চায়। কখনও তাঁর মনে হয় যেন পৃথিবীর সবাই প্রেস রিপোর্টারের চাকরি নিয়েছে। ক্রমশ তিনি মানুষকে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া থেকে বিরত হয়েছেন। তিনি এগোলেন, কিন্তু একটু পরে আবার তাঁর কানে এল, 'কর্তা'!

মিঃ পিয়েনার আস্তে ঘুরে চাইলেন। তাঁর থেকে পাঁচ-ছ হাত দূরে একটি কালো চামড়ার মহিলা দাঁড়িয়ে।

এবার মিঃ পিয়েনার নিশ্চিন্ত মনে এগোলেন, মেয়েটি নিশ্চয় তাঁকে ডাকছে না। এই জাতীয় লোকের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি কেবল ভাবলেন, কালো মানুষদের বসতি অঞ্চল এ জায়গাটা থেকে অনেক দূরে, এই মহিলাটি এ অসময়ে এখানে কি করতে এসেছে?

তিনি এগোলেন। তিনি মহিলাটির দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন দুটো স্ট্রিট লাইটের মাঝামাঝি জায়গাটা থেকে; সেখান থেকে এগিয়ে তিনি আরেকটি স্ট্রিট লাইটের ঠিক নিচে এসেছেন, এমন সময় আবার তাঁর কানে এল, 'কর্তা!'

মিঃ পিয়েনার এবার দাঁড়িয়ে পড়ে আধাপাক ঘুরে মহিলার দিকে তাকালেন। হাত পাঁচেক দূরে মহিলাটি দাঁড়িয়ে আছে। স্ট্রিট লাইটের উজ্জ্বল আলোয় তার ক্যাটকেটে কালো মুখটা ঝিলিক দিচ্ছে। ভয় আর আকুতি মাখানো দৃষ্টিতে সে মিঃ পিয়েনারের মুখের দিকে তাকিয়ে।

ঠিক স্ট্রিট লাইটের নিচে দাঁড়ানোতে এবং মাথায় ফেল্ট হ্যাট থাকায় মিঃ পিয়েনারের সমস্ত মুখমণ্ডলে ছায়া পড়েছিল। তাঁর মুখের রংটাও মহিলাটির মুখের রঙের মতই দেখাচ্ছিল। মেয়েলোকটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মিঃ পিয়েনারের মনে হল, মহিলাটিকে আগেও তিনি কোথাও দেখেছেন। হ্যাঁ, এই রাস্তাতেই বেশ কয়েকদিন তাকে বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন বলে মনে হয়। এমনি ঘাড় ফিরিয়ে তিনি যেন কখনও কখনও এই মহিলাটিকে পিছন পিছন আসতে দেখেছেন বলে মনে পড়ছে।

'আমাকে কিছু বলছিলে, তুমি?' মিঃ পিয়েনার গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করেন।

মহিলাটি ফুলতোলা ফ্রকটা দিয়ে হাঁটু দুটো ঢেকে শ্রদ্ধা জানানোর ভঙ্গিতে সামান্য নুয়ে আবার সোজা হল। দুই হাত প্রার্থনার ভঙ্গীতে বুকের মাঝখানে জড়ো করে সে কাঁপা কাঁপা স্বরে জানায়, 'হ্যাঁ, কর্তা ঠিক, আমিই আপনাকে ডেকেছিলাম।'

'আমি তো তোমায় চিনি না। সম্ভবত তোমার সঙ্গে আমার কোন পরিচয়ও হয় নি।'

'না হয়নি, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। আপনিও আমাকে চিনবেন। আমি মেরী, স্মিথের স্ত্রী।' তীব্র উত্তেজনা এবং আগ্রহে একনিঃশ্বাসে মেরী কথাগুলো বলল।

'স্মিথ?' আপনা থেকেই নামটা মিঃ পিয়েনারের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। হয় তিনি হাজার হাজার স্মিথকে চেনেন, নয় তিনি কোন স্মিথকেই চেনেন না, কিংবা

তিনি একজন স্মিথকে খুব ভাল করেই চেনেন; মেয়েটির কথার ধরণে এর কোন্‌টা যে ঠিক, ধরা গেল না।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ স্মিথ' মেরী ব্যাকুল হয়ে বলে, 'স্মিথ আমার স্বামী, তিনি মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন, তাঁর কল্‌জেটা কেটে নিয়ে ডাক্তার আপনার বুকে লাগিয়েছেন।'

'অ!' মিঃ পিয়েনার অস্ফুটে বললেন।

'হ্যাঁ কর্তা, আমাদের মাত্র দু'মাস বিয়ে হয়েছিল। সেই রোববার আমরা ন্যাশনাল পার্কে গিয়েছিলাম। সারাদিন ধরে আমরা খুব আনন্দ করেছি। এই দেখুন, এই যে, সেখানে অটোমেটিক স্ন্যাপে তোলা আমাদের শেষ ফটো —' মেরী বড় এলোমেলো ভাবে কথাগুলো বলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ হাতড়ে একটা ছোট ফটো বার করে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মিঃ পিয়েনারের নিষ্পলক, অর্থহীন, শূন্য দৃষ্টির সামনে মেলে ধরল। নদীর পারে একটা পাথরের ওপর একে অন্যের বাহুতে ধরাধরি করে স্মিথ এবং মেরি বসে আছে। স্মিথের খালি গা। তার চওড়া, সুঠাম, কুচকুচে কালো বুকে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে। তার দুটো ঠোঁটে একটা মৃদু হাসির রেখা ঝুলে আছে।

ফটোটা আবার ব্যাগে ভরে মেরী বলে চলল, 'সেদিন আমাদের ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ঘরে পৌঁছনর জন্য স্মিথ খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল। গোটা পথটা আমরা নির্বিঘ্নেই পার হলাম। কিন্তু শহরে ঢোকার মুখে ঠিক কি ঘটেছিল আমি বলতে পারব না, পরদিন হাসপাতালে আমার জ্ঞান ফিরেছিল। এর মধ্যে অন্য একটি হাসপাতালে স্মিথের হৃদপিণ্ডটি আপনার বুকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে—।' মেরীর গলাটা ধরে এল। বাঁ হাতে চোখ মুছতে মুছতে মেরী সামনে এসে পড়া চুলগুলোকে কানের পাশ দিয়ে পিছনে ঠেলে দিল।

নীরব, নিশ্চল মিঃ পিয়েনারের মুখটা টুপির আড়ালে তখনও অন্ধকার। বলার মত কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কয়েকটা নিস্তব্ধ মুহূর্ত পার হয়ে যাওয়ার পর তিনি জড়তা মেশানো কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি আমার পেছু নিয়েছ কেন?' প্রশ্নটা মিঃ পিয়েনারের নিজের কানেই বেয়াড়া ঠেকল।

'আপনার? আপনাকে আমি দূর থেকে সর্বদাই দেখি। আমার আপনাকে কাছে থেকে দেখার ইচ্ছে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হয়, আপনার সান্নিধ্য পেতে ইচ্ছে করে। আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছি। আমার আর কেউ নেই। কিন্তু স্মিথের কল্‌জেটা আপনার বুকে। কল্‌জের সঙ্গে মানুষের অন্তরটা থাকে বলে আমরা ভেবে থাকি। স্মিথের সুন্দর, প্রেমে পরিপূর্ণ অন্তরের কথা ভেবে আমি তার বুকে যেখানে কল্‌জেটা থাকে সেখানে হাত বুলোতাম। সেই হৃদপিণ্ডটি এখন আপনার বুকের ভেতর ধুকধুক করছে, আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। হৃদয়টাই যদি

বেঁচে থাকল, তাহলে আমার স্মিথ মরল কোথায়?' মেরী ছলছলে চোখে মিঃ পিয়েনারের অন্ধকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মিঃ পিয়েনারের মুখ থেকে বেরোল, 'অনেক দেরি হল। তোমার সঙ্গে পরে দেখা করব।'

'দেখা করবেন?' মেরীর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'অশেষ ধন্যবাদ। অশেষ ধন্যবাদ।'

একটু ইতস্তত করে ও আবার বলল, 'আপনাদের এখানে আসার অনেক অসুবিধা আছে আমাদের, তবুও আপনাকে দেখতে আমি আসব। আপনিও আমাদের বাড়িতে যাবেন তো কর্তা? এই যে— এই যে—' বলে মেরী ব্যাগটা খুলে জিনিসপত্রের ভেতর খলবল করে কি যেন খুঁজতে লাগল; তারপর একটা ছোট কার্ড বের করে বলল, 'এটাতে আমাদের বাড়ির ঠিকানা আছে; স্মিথের নামের কার্ড। এটা আপনি রাখুন।'

মিঃ পিয়েনার হাতটা যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে মেরির হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে কোটের বুক পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর তিনি হঠাৎই ঘুরে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। পিছন থেকে মেরীর অতি আগ্রহে উচ্চারিত, 'গুড নাইট স্যার' কথাটার উত্তরে তিনি আপনমনে কিছু একটা বিড়বিড় করলেন।

মিঃ পিয়েনারের পা দুটো অবশ মনে হচ্ছিল। মাথাটা মনে হচ্ছিল ঘুরছে। কোনমতে দুই ফার্লং রাস্তা অতিক্রম করে তিনি বাড়ি পৌঁছলেন, এবং তারপরেই অবসন্নভাবে সোফায় বসে পড়লেন।

মহিলাটিকে তাঁর ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল কি? তিনি আজ যে এমন করে বেঁচে আছেন, তার জন্য এই মহিলাটির প্রতি তাঁর চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকার কথা বলার প্রয়োজন ছিল কি? তাঁর বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল, মাথাটা কাজ করছিল না। এখনও পর্যন্ত মাথাটা ঠিকঠাক কাজ করছে না। কথাটা এভাবে কোনদিন তিনি ভেবেই দেখেননি। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর হৃদপিণ্ড বদলানোর ঘটনাটা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, কর্মকুশলতার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী কীর্তি। তাঁর এই নতুন-জীবন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক চাঞ্চল্যকর পদক্ষেপের সংকেত। একজনের দেহের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা অঙ্গ তাঁর দেহে স্থাপন করাটা এক পরম বিস্ময়। একটি যুগান্তকারী, চাঞ্চল্যকর ঘটনা। তিনিও ঠিক এভাবেই ভেবেছেন। কিন্তু কার হৃদপিণ্ড তাঁর বুকে স্থাপন করা হল, সে কথাটা চিন্তা করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি। সেই অবকাশ তাঁর ছিল না। ডাক্তার, বন্ধুবান্ধব, প্রেস রিপোর্টার কেউই এ প্রসঙ্গ তাঁর সামনে উত্থাপন করেনি। এমন কি খবর কাগজের এত সংবাদেও তাঁর মনে এই চিন্তার উদ্রেক করেনি। স্মিথ, এই নামটা একটা ভাসা ভাসা আলোচনায় তাঁর কানে এসেছে, কিন্তু সে আলোচনা কখনও গুরুত্ব লাভ করেনি। নামটা গেলাসের মধ্যে ওষুধের বুদবুদের মত অদৃশ্য হয়ে গেছে। নতুন জীবনের কথা ভাবলেই

তিনি কেবল ডাঃ ক্যাম্বেলের ঐশ্বরিক ক্ষমতার কথা স্মরণ করেন।

কিন্তু আজ মহিলাটি জানাল, এই হৃদপিণ্ডটির নিশ্চিত একজন মালিক ছিল। এই হৃদপিণ্ডের সঙ্গে একটি হৃদয় জড়িয়ে ছিল। এই হৃদপিণ্ড—হার্ট—অন্তর। এই হৃদপিণ্ডের উত্তরাধিকারী তাঁর সান্নিধ্য চাইছে! কি রকম সান্নিধ্য? কি চাই তার?

মেরীর মুখখানা মিঃ পিয়েনারের চোখের সামনে ভেসে উঠল। নিচের ঠোঁটটা মোটা এবং বড়, নাকটা বড়, গালের হাড় স্পষ্ট, ভ্রূর ওপরের দিকটা ভেতরের দিকে ঢোকানো। গায়ের রং—

মিঃ পিয়েনার একটা অস্থিরতা অনুভব করলেন। মিসেস পিয়েনারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কেবল 'না না কিছু হয়নি; — দরকার হবে না, ডাক্তারকে খবর দেওয়ার কি আছে?' ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত উত্তর সারলেন।

রাতে তাঁর ঘুম হল না। বার বার তিনি যেন হৃদপিণ্ডের ধুপপুক শব্দের আওয়াজে জেগে উঠলেন। তাঁর মনে হল, হৃদপিণ্ডটা তাঁর শরীরের সব রক্ত যেন শুষে নিচ্ছে; তিনি নিস্তেজ বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছেন। তারপর হৃদপিণ্ডটা আবার বিদ্যুৎবেগে তীব্র শক্তিতে সমস্ত শরীরে রক্তটাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে! রক্তের সেই প্রবাহের বেগ তাঁর শিরা উপশিরা সইতে পারছে না, বিশেষ করে কপালের দু'পাশের শিরা দুটো, মাথার ভেতর শিরাগুলো যেন ফেটে পড়তে চাইছে, যন্ত্রণায় তিনি ক্লিষ্ট। তাঁর মনে হল তার অর্ধজীর্ণ দেহের পক্ষে হৃদপিণ্ডটা বড় বেশি শক্তিশালী। তাঁর চোখের সামনে স্মিথ নামে একটি কালো মানুষের চেহারা ভেসে উঠল। স্ট্রিট লাইটের আলোয় তিনি ফটোর স্মিথের চেহারাটা লক্ষ্য করেননি, কিন্তু এই জাতটার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। সুদৃঢ় মাংসপেশী দিয়ে গড়া ওদের চওড়া বুক, ওদের হাতের মুঠোগুলো — কিসের সমান? কিসের সমান? — মিঃ পিয়েনার অকারণেই একটা কালো মানুষের হাতের মুঠোর একটা তুলনা খুঁজলেন। — একটা সময় ওদের সংঘের অফিসে জোগাড় করে রাখা হাতবোমাগুলোর সমান? — তাঁর প্রকাণ্ড সাদা গাড়িটার ডিস্ট্রিবিউটারের সমান? অসংলগ্ন কিছু চিন্তা মিঃ পিয়েনারকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল।

মিঃ পিয়েনার সামান্য সময়ের জন্য হলেও তাঁর শরীরের রক্ত চলাচল বিশেষ করে মাথার দিকে — বন্ধ থাকাটা কামনা করলেন।

সকালে মিঃ পিয়েনারের মুখখানা ফ্যাকাসে দেখাল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি পলকহীন নিজের প্রতিবিম্বটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর মুখের রং, গায়ের রং ধীরে ধীরে কালো হয়ে যাচ্ছে নাকি, রক্ত চলাচল করানো যন্ত্রটার জন্য তিনিও স্মিথদের মত হয়ে যাবেন নাকি?

মিসেস পিয়েনারের অনুরোধে সেদিন ডাঃ ক্যাম্বেল এবং তাঁর সহকারী অনেকক্ষণ ধরে মিঃ পিয়েনারকে পরীক্ষা করলেন। কিছুই হয়নি। সবই ঠিক আছে। এবার ক্রমশঃ মিঃ পিয়েনারের স্বাভাবিক কাজকর্ম করা উচিত।

সেদিন মিসেস পিয়েনার তাঁকে তাড়াতাড়ি সঙ্ঘের অফিসে নিয়ে গেলেন। কোন একটা অঞ্চলে কালোরা ছোট করে একটা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড গঠন করার চেষ্টা করছে। অত্যন্ত আত্মম্ভরি, হাস্যকর পরিকল্পনা। একটা অপবাধমূলক বিদ্রোহ। সংস্থার সবাই অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে পরিস্থিতির আলোচনা করতে লাগলেন। হঠাৎ মিঃ পিয়েনারের মনে হল তিনি কি আলোচনায় তেমনভাবে অংশ নিচ্ছেন না? তিনি নড়েচড়ে চেয়ারটায় বসলেন। তারপর প্রয়োজনের চাইতেও জোরে কথা বলতে শুরু করলেন। কোন রকমের প্রশ্রয় এই মানুষগুলোকে দেওয়া যাবে না। মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের নামে এক জায়গায় খুঁটি গেড়ে বসতে পারলে, ওরা ক্ষমতা এবং অধিকার বোধের চেতনা জাগিয়ে তুলবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সঙ্ঘের অন্য সবাই একটা সুনিশ্চিত কর্মপন্থার কথা নিয়ে আলোচনা করছিল। মিঃ পিয়েনারের বক্তব্যে তারা অনেক কাল আগের পুরোনো বক্তৃতার সুর শুনতে পেল। তারা আড়চোখে এ-ওর দিকে তাকাল। মিসেস পিয়েনার অপ্রতিভ দৃষ্টিতে স্বামীকে চুপ করে থাকতে ইঙ্গিত করলেন।

বেশ কিছুক্ষণ উত্তেজিত ভাবে অনর্গল কথা বলে মিঃ পিয়েনার ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি সহজভাবে বসে থাকার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর বুকটা ধড়ফড় করতে থাকল। প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি সেই ধড়ফড়ানির প্রতি নির্বিকার থাকার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। বরং তাঁর একবার মনে হল স্মিথের সেই প্রকাণ্ড হৃদপিণ্ডটার শক্তিকে অবরুদ্ধ করে রাখার কোন ক্ষমতা তাঁর নেই।

মিঃ পিয়েনার সন্ধ্যাবেলা রাস্তায় হাঁটা ছেড়ে দিলেন। একটি হৃদয়ের সান্নিধ্য খুঁজে পিছন পিছন একটি কালো মহিলার আসার আতঙ্ক তাঁকে ঘিরে ধরল। মাঝে মাঝে তিনি কল্পনা করেন, শুধু এই মেয়েলোকটাই নয় একটা হৃদপিণ্ডের সুযোগ নিয়ে গোটা জাতটাই তাঁর সান্নিধ্য খুঁজে পিছন পিছন আসছে। ওরা আবার হৃদপিণ্ডের বদলের সঙ্গে অন্তর বদলের ব্যাপারটাও জড়িয়ে ফেলেছে না কি?

কদিন পর একদিন মিঃ পিয়েনার ভয়ে ভয়ে রাস্তায় বেড়াতে বেরোলেন। আর একটু পরেই তাঁর কানে এল — 'স্যার' —

মেরী যেন সুদূর অতীত থেকে প্রতিদিনই এই রাস্তার স্ট্রিট লাইটের আড়ালে লুকিয়ে আছে! ও থমকে যাওয়া মিঃ পিয়েনারের কাছে এল।

মিঃ পিয়েনার বাঘের মুখোমুখি হয়ে যাওয়া উত্তেজনায় গর্জে উঠলেন, 'কি চাই তোমার?'

মেরী প্রথমে থতমত খেয়ে গেল, কিন্তু পরমুহূর্তেই সাহস সঞ্চয় করে সকাতর কণ্ঠে জানাল, 'আমি মাত্র একটিবার আপনার বুকে মাথা রেখে আমার স্মিথের হৃদপিণ্ডের স্পন্দন শুনতে চাই, অনুভব করতে চাই। অনেক দিন আমি সেই স্পন্দন শুনি না। সেই স্পন্দন এই পৃথিবীতে আছে অথচ আমি শুনতে পাই না এ যে বড় কষ্ট স্যার — অসহ্য যন্ত্রণা।'

'কি স্পর্ধা!' বলে দ্বিতীয়বার ঝাঁঝিয়ে উঠে মিঃ পিয়েনার শূন্য রাইফেলে গুলি ভরে আনতে যাওয়ার উত্তেজনা নিয়ে ছিটকে গেলেন।

এবার মিসেস পিয়েনারকে কিছু হয়নি বলার মত শক্তি মিঃ পিয়েনারের রইল না। বাড়ি ফেরার পর ঘণ্টা খানেক তিনি নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, অতঃপর অবসন্ন কণ্ঠে স্ত্রীকে মহিলাটির কথা জানালেন। বললেন, মেয়েলোকটা তার বুকে মাথা রেখে —

ক্রুদ্ধ নাগিণীর মত মিসেস পিয়েনার ফোঁস করে উঠলেন। তিনি এখন কি করবেন? সঙেঘর অফিসে ফোন করবেন কি? না ডাঃ ক্যাম্বেলকে? তিনি সারা ঘরময় অস্থির পদচারণা করতে লাগলেন।

রাতে দুটো খাট জুড়ে তৈরি করা বড় বিছানাটায় দুই পিয়েনার অসাড়ে পড়ে ছিলেন। কার ঘুম এল, কার এল না কেউ কারও খবর রাখলেন না। মিসেস পিয়েনারের মাথায় একটা তীব্র দহন। অর্ধনিমীলিত চোখে তিনি একবার স্বামীর বুকের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ বুজলেন। ক্ষীণ আলোয় তিনি কি স্বামীর বুকের ওঠাপড়া দেখতে পেয়েছিলেন? পেয়েছিলেন। বুকটা স্পষ্টতই, যথেষ্ট ওঠানামা করছিল। হৃদপিণ্ডের বদলে যেন একটা বড় পাম্প বুকের ভিতরে কাজ করে চলেছে। সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবন তিনি স্বামীর বুকের স্পন্দন অনুভব করে আসছেন; কিন্তু কি বিরক্তিকর এই অস্বাভাবিক ওঠা-পড়াটা! কতই না অপিরিচিত এই হৃদপিণ্ড। অতি প্রিয়, অত্যন্ত ভালবাসার, এমন আপন অন্তরের অন্তস্তলে এ কার হৃদপিণ্ড? এই কল্জেটার সঙ্গে তাঁর কিসের সম্পর্ক; তীব্র অভিমানে এবং ঘৃণায় মিসেস পিয়েনারের নাক কুঁচকে গেল।

মাঝরাতে গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে এক ভয়াবহ গুম গুম শব্দ শুনতে পেলেন মিসেস পিয়েনার। স্বামীর বুকের ভেতর থেকে আসছে সেই শব্দ। ক্রমশ শব্দটা জোরালো হতে থাকল — জোরালো, — আরো জোরালো — আরো জোরালো। একটা সময় সেই শব্দ শবদেহের অন্তিম ক্রিয়াকালীন অনেকে মিলে সমলয়ে বাজানো বাদ্যের শব্দে রূপান্তরিত হয়ে মিসেস পিয়েনারের কানের গহ্বর ভরে ফেলল। তিনি বিছানার ওপর উঠে বসলেন।

দিন দুই পরে মিসেস পিয়েনার খাট দুটো আলাদা করে ফেললেন। লম্বা শোওয়ার ঘরের ও মাথায় নিজের খাটটা সরিয়ে নিলেন। স্বামীকে বোঝালেন, তিনি সামান্য অসুস্থ, তার জন্য স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে; এটা অবাঞ্ছিত।

ঘুমের ব্যাঘাত? মিঃ পিয়েনার ভেতরে ভেতরে একটা ক্রুর হাসি হাসলেন। তিনি ঘুমোনটা কখন?

মিসেস পিয়েনারের যুক্তি, ব্যাখ্যা অথৈ জলে গেল। মিঃ পিয়েনারের অন্তরাত্মা যে কোন ভাবেই বুঝতে পেরেছিল, স্ত্রী তাঁকে ঘৃণা করছেন। স্ত্রী তাঁকে ভয় পাচ্ছে,

এর মধ্যে তাঁর চেহারা রাতে ভয় পাওয়ার মত করে পাল্টে গেছে নাকি? তাঁর আরও মনে পড়ে গেল ইদানীং সঙ্ঘের অফিসে, ব্যবসায়ের জায়গায়, রাস্তার লোকেরা তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়ে গুণগুণ করে কিছু বলাবলি করে; তারা তাঁর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায়। সে দৃষ্টি সহ্য করা যায় না।

মিঃ পিয়েনারের মনে হয় এদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকেন। ওদের দৃষ্টিকে তিনি ভয় পেতে শুরু করলেন। মেরীর কথা তাঁর বার বার মনে পড়ল। কাতর, অসহায়, অশ্রুসিক্ত সেই দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতেও তাঁর ভয়, কিন্তু রক্ষা এই যে সে দৃষ্টিতে ঘৃণা নেই, সেই দৃষ্টি ভয়ার্ত নয়। হঠাৎ মিঃ পিয়েনারের মেরীর কাছে যেতে ইচ্ছে করল। কোথায় থাকে ও! কি জানি কত দূরে থাকে! নিজের খাটে শুয়ে থেকে লম্বা ঘরটার ও মাথার খাটটার দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবলেন— অন্তত এত দূরে নয় আশা করি।

কোটগুলোর পকেট হাতড়ে হাতড়ে মিস্টার পিয়েনার স্মিথের কার্ডটা খুঁজে বের করলেন। যে কোটটা গায়ে চড়ানো ছিল কার্ডটা সেই কোটের বুকের ভিতরের পকেটে ঢুকিয়ে নিলেন এবং ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বললেন।

শহর থেকে অনেক দূরে এক কালো বসতি অঞ্চলে মিঃ পিয়েনারের গাড়িটা এক সময় এসে থামল। একটা বাড়ির সামনে গাড়িটা দাঁড়াতেই ছেলে-মেয়ে, তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই মিলে গাড়িটাকে ঘিরে ধরল। অকস্মাৎ জনতার মধ্যে, 'পিয়েনার, পিয়েনার' বলে একটা আওয়াজ উঠল। বাড়িগুলোর দরজা জানালা খুলে গেল, একেকটা করে মুখ জানালায় দেখা দিল এবং পরমুহূর্তেই দৌড়ে রাস্তায় চলে এল। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাস্তাটা শ'য়ে শ'য়ে মানুষে ছেয়ে গেল, ওরা 'পিয়েনার পিয়েনার' শব্দে গোটা অঞ্চলটা মুখরিত করে তুলল। এক অভূতপূর্ব আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওরা গাড়িটার চারপাশে ঘিরে নাচার উপক্রম করল। কিছু অতি উৎসাহী লোক গাড়ির জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে মিঃ পিয়েনারের বুকে খোঁচা দিয়ে এক অবুঝ ভাব প্রকাশ করতে চাইল। প্রত্যেকবার খোঁচার সঙ্গে সঙ্গে স্মিথের ঠিকানা লেখা কার্ডটা মিঃ পিয়েনারের বুকে নিবিড় ভাবে স্পৃষ্ট হচ্ছিল।

শ'য়ে শ'য়ে লোকের এই সাদর-সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে ডান হাতটা ওপরে তুলে ধীরে ধীরে নাড়াতে ইচ্ছা করল মিঃ পিয়েনারের; হাতটা তুলতে চেয়ে তিনি একবার সকরুণ দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকালেন; বোধহয় তিনি কারো অনুমতি চাইছিলেন। কিন্তু অনুমতি দেওবার কেউ নেই। তাঁর ড্রাইভারটি গম্ভীর মুখে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। সে ছাড়া বাইরে চারদিকে কালো, কালো, —কেবল কালো। মিঃ পিয়েনার বড় ক্লান্ত অবসন্ন ভঙ্গীতে, যেন অতি ভারি একটা বোঝার মত হাতটা তুলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত হাতটা শূন্যে উঠল, ধীরে ধীরে আন্দোলিত হতে লাগল। জনতার কণ্ঠস্বর বিপুল উৎসাহে সেই আন্দোলিত হাতকে স্বাগত জানাল।

মিঃ পিয়েনার একটা অদ্ভুত বেদনা অনুভব করলেন। আচমকা এই লোকেদের সম্পর্কেও তাঁর ভয় হল। লোকগুলোর গায়ের রং যেন অন্ধকারের রূপ ধরে তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। তিনি ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে বললেন।

গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল মেরীর বাড়ির সামনে। জনতার ভিড়ে সে যেন তার নিজের বাড়ির সামনেই হারিয়ে গেল। গাড়িটার এককোণায় হাত রেখে সে নীরবে সারাক্ষণ কেঁদে চলেছিল।

মিসেস পিয়েনারের কানে মিঃ পিয়েনারের নিষিদ্ধ এলাকা ভ্রমণের কাহিনী পৌঁছল। তিনি স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'এর মানে কি?'

এক অবোধ অপরাধী শিশুর মতই মিঃ পিয়েনার চুপ করে থাকলেন।

পরদিনই সঙ্ঘের একদঙ্গল লোকে পিয়েনারের ঘর ভরে গেল। মিঃ পিয়েনারকে ধরে তারা নানাভাবে জেরা করল, নানা ভাবে বোঝাল; হৃদপিণ্ড মানুষের দেহের একটা যন্ত্র; কেবলই একটা যন্ত্রমাত্র; ঠিক যেমন মোটর গাড়ির ডিস্ট্রিবিউটার একটা যন্ত্র। এই যন্ত্রটির সঙ্গে মানুষের সভ্যতার, আদর্শের কোন বিনিময় চলে না। মিঃ পিয়েনারের বুকে বসানো যন্ত্রটা ইস্পাতেরও হতে পারত। হৃদযন্ত্র ইস্পাত নির্মিত হলে সে ইস্পাত সোনার সমমূল্যের হয়ে যাবে, এটা বাজে কথা। মিঃ পিয়েনারের মনে রাখা উচিত, একদল ভুল চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবান্বিত মানুষ যাতে একটা সুসভ্য জাতির সাধনাকে কলঙ্কিত করতে না পারে। এককালীন সঙ্ঘ সম্পাদক মিঃ পিয়েনারকে এর বেশি বোঝাতে যাওয়াটা খুবই দুঃখজনক।

সঙ্ঘের সম্পাদক পরদিন মিঃ পিয়েনারকে লিখিত ভাবে জানালেন, তিনি যেন অতঃপর কিছুদিন বাড়িতেই থাকেন। ডাঃ ক্যাম্বেলও লিখিত জানালেন, তিনি যেন কিছুদিনের জন্য পরিপূর্ণ বিশ্রামে থাকেন।

পরিপূর্ণ বিশ্রাম? একদিন মিঃ পিয়েনার একা একা তাঁর নির্জন ঘরে বসে উচ্চারণ করলেন, কাকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম বলে? দীর্ঘদিন এই নির্জন ঘরে বিশ্রাম নিয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন, সমগ্র জাতটাই তাঁর ঘৃণ্য জীবনটাকে একটা কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। মানুষের জ্ঞান, কর্মকুশলতার অন্যতম সাধকেরা তাঁকে বন্ধ করে রেখেছে। এই জীবনটাকে আপন বলে গ্রহণ করা এক ভদ্রমহিলা এই বুকের ধুকপুকুনি কানে যাওয়ার ভয়ে একই বাড়ির মধ্যে পালিয়ে বেড়ান। আর যে যন্ত্রটি ধুকপুকুনি সৃষ্টি করে তাকে নিজের বুকের ভিতরে ধারণ করেও তিনি তার স্বরূপ জানেন না। বড়ই কষ্টকর। নিজের দেহের একটা অঙ্গ যখন পর হয়ে যায়, তখন তাকে সহ্য করা বড় কঠিন।

'বড়ই ছোট, বড়ই ছোট'— মিঃ পিয়েনার আপন মনে বিড় বিড় করলেন, 'একটা অন্তর দিয়ে ঘেরা হৃদপিণ্ডকে বহন করার পক্ষে আমাদের বুকগুলো বড়ই ছোট মাপের। স্থান বড় কম। সেই জন্যই আমি এত যন্ত্রণা ভোগ করছি। সত্যি

সত্যিই যদি হৃদযন্ত্রটা কেবলমাত্র একটা যন্ত্রই হত, তাহলে হয়তো বা অনেক কম জায়গা লাগত। ইস্পাতে তৈরি হলে আরও কম জায়গা লাগবে।'

মিঃ পিয়েনার উঠে দাঁড়ালেন। পৃথিবীর বিখ্যাত যুগান্তকারী রোগী মিঃ পিয়েনার অস্থির ভাবে পায়চারী করতে লাগলেন। 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম পঙ্গু, সর্বাপেক্ষা নিঃস্ব, একেবারে একা, হৃদপিণ্ডহীন জীব' —প্রলাপের মত কথাগুলো উচ্চারণ করে মিঃ পিয়েনার চুলের ভেতর আঙুল চালালেন। একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ভাল পোশাক পরলেন। স্মিথের ঠিকানার কার্ডটা আবার বুকপকেটে ভরে নিলেন। এরপর একটা রিভলবার তিনি পকেটে ভরে নিলেন।

গাড়ি, ড্রাইভার সবই মিসেস পিয়েনার অফিসে নিয়ে গেছেন। একটু দূরে গিয়ে তিনি একটা ট্যাক্সিতে উঠলেন এবং এক সময় মেরীর বাড়ির সামনে গিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামলেন।

মেরী বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কর্তা!'

মিঃ পিয়েনার একটা চেয়ারে বসলেন। বেয়াড়া সুরে বলে উঠলেন, 'স্মিথের কল্‌জেটার স্পন্দন শুনতে তোমার মন চায়, তাই না?'

মেরীর চোখ চকচক করে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কর্তা তাই।'

'এস এস। আমার বুকের ওপর মাথা রাখ। প্রাণ ভরে কল্‌জেটার শব্দ শুনে নাও। এস।' মিঃ পিয়েনার চেয়ারে হেলান দিলেন।

মেরী অবাক বিস্ময়ে মিঃ পিয়েনারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'এস।'

'আপনি এ রকম করছেন কেন? কি হয়েছে আপনার?'

'এত কথার উত্তর দেওয়ার সময় নেই আমার। আমার হাতে সময় বড় কম।' নির্বিকার সুরে মিঃ পিয়েনার জানালেন। খানিকক্ষণ পরে তিনি সকাতর অনুনয়ের সুরে বললেন, 'এস মেরী, এস, যত দেরি করবে ততই আমার কষ্ট বাড়বে। এই যে দ্যাখ আমার হাত ঘেমে গেছে।' কথা বলতে বলতে তিনি পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে এনে হাতের মুঠোয় ধরলেন।

'কি', মেরী আর্তনাদ করে উঠল, 'আপনি আত্মহত্যা করবেন?' এক লাফে সে মিঃ পিয়েনারকে জাপটে ধরল। মাটিতে হাঁটু গেড়ে মিঃ পিয়েনারের বুকে মাথা গুঁজে দিল— 'না না, আপনি এমন কাজ করবেন না। আপনি জানেন, — আপনি আর এখন আত্মহত্যা করতে পারেন না, —করলে বড়জোর আপনি স্মিথকে হত্যা করতে পারেন। ওই কল্‌জেটা আপনি এভাবে ধ্বংস করবেন না। যেখানেই থাকুন— আমার স্মিথকে বাঁচিয়ে রাখুন।' মেরী ব্যাকুল মিনতি করতে থাকল। তারপর নিঃশব্দে মিঃ পিয়েনারের বুকে কান পেতে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে থাকল।

এক সময় মিঃ পিয়েনার মেরীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। রিভলবারটা তিনি ওখানেই ফেলে রেখে এলেন।

অন্ধকার রাস্তায়, দূর থেকে তিনজন লোক মিঃ পিয়েনারকে অনুসরণ করল।

পরদিন সকালে বাড়ির কাছের পার্কটায় মিঃ পিয়েনারের মৃতদেহটা পড়ে থাকতে দেখা গেল।

সঙেঘর অফিসে রাতের বেলায় একটি জরুরি গোপন সভা বসেছিল। বেশ কজন লোকের সঙ্গে ডাঃ ক্যাম্বেল গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন। তাঁর সামনে কাগজ কলম। একজন সদস্য তাঁকে বোঝাচ্ছিল, 'দেখুন ডক্টর ক্যাম্বেল, কাল সকালে প্রেসের লোক আপনাকে ছেঁকে ধরবে। সেজন্য আপনার বিবৃতি আজই প্রস্তুত করে রাখা দরকার। আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছেন। আপনার সিদ্ধান্তের ভুল ধরতে মানুষের বহু বছর কেটে যাবে। কিন্তু কাল আপনি যা বলবেন লোকে সশ্রদ্ধায় তা গ্রহণ করবে। এমন একটা কথা বলতে পারেন না ডক্টর, যে সব জাতের কল্‌জে সব জাতের দেহে খাপ খায় না? এই ধরে নিন জল পাম্প করার জন্য তৈরি একটা পাম্পকে তেল পাম্প করার জন্য ব্যবহার করা যায় না। কেউ যদি করে তাহলে প্রথম কিছুদিন পাম্পটা হয়তো চলবে, তারপর বন্ধ হয়ে যাবে। মিঃ পিয়েনারের যন্ত্রটা যদি সেই কারণেই বন্ধ হয়ে থাকে।'

লোকটি টেবিলের ওপর পড়ে থাকা সাদা কাগজটা ডাঃ ক্যাম্বেলের দিকে এগিয়ে দিল।

Printed at Shivam Offset Press, A-12/1 Naraina Indl. Area, Phase-I, New Delhi-110 028